Swadhinata Andolane Howrah Zela.

By Dukhaharan Thakurchakraborty

প্রথম প্রকাশ ঃ
১০ই অক্টোবর ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
কৃষ্ণা পাশী
পাশী এন্টারপ্রাইজ
১৯৯, সি, এস, মুখার্জী ষ্ট্রীট
কোন্নগর, হুগলী
পিন ঃ ৭১২২৩৫

পরিবেশক ঃ
পৃথা প্রকাশণী
৪৪/৩ ইনষ্টিটিউট লেন
কলকাতা-৩৫

লেজার কম্পোজ ঃ
জি. ডি. গ্রাফিক্স
৫এ, বি, এন, রোড,
উত্তরপাড়া, হুগলী।

মুদ্রণ ঃ
পাশী এন্টারপ্রাইজ
১৯৯, সি, এস, মুখার্জী ষ্ট্রীট
কোন্নগর, হুগলী
পিন ঃ ৭১২২৩৫

প্রচ্ছদ ঃ
অমর পাশী

উৎসর্গ

স্বাধীনতা আন্দোলনের

সৈনিকদের

উদ্দেশ্যে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

একান্ত আমার নিজের গরজে এ গ্রন্থ কোনদিন রচিত বা মুদ্রিত হতো বলে মনে করি না। তবু অনেকের উৎসাহ ও প্রেরণায় একান্তই গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হলো, তখন কিছু কথা আমার পক্ষ থেকে বলার থেকে যায়।

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় কদমতলা, হাওড়া থেকে একদা প্রকাশিত 'বাংলা সান্ধ্য দৈনিক বিবরণ' পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক শশধর রায়ের উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরকালের। ডোমজুড়ের স্থানীয় যুবকদের চেষ্টায় প্রকাশিত একটি সাময়িক পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় 'দফরপুর স্বদেশী ডাকাতি' ও 'মির্জাপুর স্ট্রীট বোমার মামলা'-র বিষয়ে লিখি। সেই নিবন্ধ দু'টি পড়ে শশধরবাবু আমাকে তাঁর পত্রিকায় লেখার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত পাঁচটি পর্যায়ে ধারাবাহিক 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া' শিরোনামে সংগৃহীত তথ্য ও কাহিনীগুলি বের হয়। যাঁরা সেই লেখাগুলি তখন পড়েছিলেন, দেখা হলেই তাঁদের কেউ কেউ তাগাদা দিতে থাকেন, 'কবে বই আকারে বের করছেন?'—লজ্জিত হয়ে বছরের পর বছর শুধু বলেই চলেছি, 'এই এবার বেরোবে, কাজ চলছে।' অথচ, কিভাবে বেরোবে, কি করে বেরোবে তা নিজেই জানিনা, কোনও প্রয়াসও রাখিনি। বছর দেড়েক আগে এলো সত্যকারের চাপ—দু'জন একান্ত শুভানুধ্যায়ীর পক্ষ থেকে। তাঁদের চাপাচাপিতে কাজে হাত দিতে এগোলাম। পাণ্ডুলিপির স্তূপ খুলে দেখি তার অধিকাংশ কীটদষ্ট, দীর্ঘদিন অযত্নে থাকায় জীর্ণতাবশতঃ দুষ্পাঠ্য এবং সবচেয়ে যা উদ্বিগ্ন করে তুললো তা হলো তথ্যসূত্রের ব্যাপক বিনষ্টি। সান্ধ্য দৈনিকে লেখাগুলি প্রকাশের সময় তথ্যসূত্রগুলি ''পরে ছাপানো হবে'—এই স্বভাব-নিস্পৃহতা ছিল, তারই জন্য যেন এখন প্রকৃতির প্রতিশোধের সামনে দাঁড়াতে হলো। এবার যাঁরা বইটি বের করার জন্য এতবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তাগাদা দিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে যিনি শুধু অন্যতমই ছিলেন না, ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের সেই গ্রন্থাগার সহায়ক শ্রী শুভেন্দু মান্নার শরণাপন্ন হলাম। দিনের পর দিন তাঁরই সহায়তায় চালাতে হলো গ্রন্থাগারের গ্রন্থ থেকে তথ্য-সূত্রের অনুসন্ধান। পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু উদ্ধৃত হলো, কিছু পাওয়া গেল গ্রন্থ থেকে, কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ হলো। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল কালের ব্যবধানে তাঁদের অনেকেই প্রয়াত, কার কাছ থেকে কোন্ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তা-ও সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে স্মৃতি থেকে লুপ্ত। তাই, সে-সব থেকে কিছু বাদ দিয়ে এবং নতুন কিছু নিয়ে এই গ্রন্থ-মুদ্রণে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এ ত্রুটি একান্ত আমারই—পাঠকবর্গের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া পথ নেই। মুদ্রণ চলাকালে কিছু তথ্য পেয়েছি, গ্রন্থমধ্যে আন্দোলন নির্ভর অধ্যায় রচনার জন্য পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশনে একই আন্দোলনের উপর একাধিক

অধ্যায় রচনা করা দৃষ্টিনন্দন তো নয়ই, পাঠকেরও বিরক্তি উৎপাদক এবং লেখকেরও কৈফিয়ৎদানের অযোগ্য বিধায় সে-সব পরবর্তী সময়ে সুযোগ এলে নিবেদন করার আশায় এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করা থেকে বিরত থেকেছি।

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থসহায়ক শ্রী শুভেন্দু মান্নাকে অকৃপণভাবে গ্রন্থ-সহায়তা দানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'বাংলা সান্ধ্য দৈনিক বিবরণ' পত্রিকা থেকে বৎসরাধিক কাল আগে নকল করে দেওয়ার শ্রমসাধ্য কাজ করে দিয়েছে শ্রীমতী রুবী মুখার্জী (চক্রবর্তী) এম. এ, সে তখন আমার ছাত্রী ছিল। আমার বন্ধু-পুত্র ও ছাত্র শ্রীমান্ সমীরকুমার বাগ এই গ্রন্থরচনায় দীর্ঘদিন ধ'রে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। এদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক আমার নয়, তাই তা থেকে বিরত রইলাম।

যে দু'জন একান্ত শুভানুধ্যায়ীর কথা আগে উল্লেখ ক'রেছি, তাঁরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁদের নাম উল্লেখ না ক'রেই তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গত বছরখানেক ধ'রে ফোন তুললেই বহু মৌলিক প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা আমার ভাই শ্রীমান্ কমল সমাজদ্বার পি. এইচ. ডি-র অনুযোগ ভেসে আসতো 'এখনো কিছু করলে না'?-বইটি প্রকাশে সে আনন্দিত হ'লে, সেটাই হবে আমার আনন্দ।

পার্শী এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে শ্রী অমরনাথ পার্শী বৎসরাধিক কাল ধ'রে অক্লান্ত সহায়তা দিয়ে এসেছেন, এই বই প্রকাশে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না এবং জি. ডি. গ্রাফিক্স-এর শ্রী গৌতম দত্ত মুহূর্তের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ না করে সুমধুর ব্যবহারের সঙ্গে অকাতরে শ্রম দিয়ে গেছেন—এঁদের দু'জনকে সাধুবাদ দিই।

সাধ্যমত যত্ন নেওয়া সত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অসম্ভব নয়। সেজন্য পাঠকরা ক্ষমা করবেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অসংখ্য মানুষ অংশ নিয়েছেন, ঘটনাও বহু ঘটেছে, নির্যাতনও নেমে এসেছে নানাভাবে—তার সব কিছু জানা যায়নি। এ সম্পর্কে কোন বিবরণ প্রেরিত হলে পরবর্তীকালে প্রকাশের জন্য তা সাদরে গৃহীত হবে।

এই গ্রন্থটি থেকে বর্তমান প্রজন্ম যদি হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের সম্বন্ধে জানবার মত কিছুমাত্রও উপাদান পায়, তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো।

ডোমজুড়, হাওড়া
১০ই অক্টোম্বর, ১৯৯৯।

বিনীত
গ্রন্থকার

লেখক-পরিচিতি

হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে লেখক দীর্ঘদিন আগে থেকেই সুপরিচিতি লাভ করেছেন। বরিশালের গৈলা গ্রাম থেকে লেখকের পিতৃদেব তরুণ বয়সেই কলকাতায় এসে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রকাশনায় চাকুরী নেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে কলকাতায় লেখকের জন্মের পর পিতৃদেবের ডোমজুড়ে আগমন। এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস। মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃ-বিয়োগের পর অসহায়ভাবে জীবনযাপন। স্বীয় চেষ্টায় বিদ্যার্জন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ (বাংলা) ও বি.টি.। ডোমজুড়ের নেহরু বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ও ঝাপড়দহ ডিউক ইন্‌স্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকরূপে মোট ছত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার জীবন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। লেখক কিশোর বয়স থেকেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা-পূর্ব কাল থেকে অর্ধশতাব্দীরও অধিককালব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। নির্যাতীত দেশকর্মী। সুবক্তা, সুলেখক ও বহু মৌলিক প্রবন্ধের রচয়িতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী মানুষদের হারিয়ে যাওয়া অবদানগুলিকে বহু পরিশ্রমে তিনি সংগ্রহ করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। — গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব লাভ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

ইং ১০-১০-৯৯ প্রকাশিকা
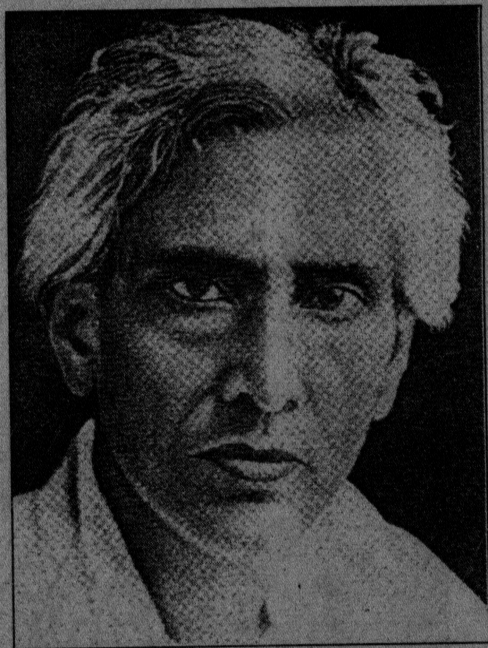
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নেতাজী সুভাষ বসু

ননীবালা দেবী

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
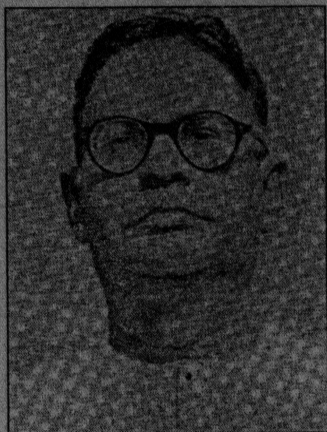
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
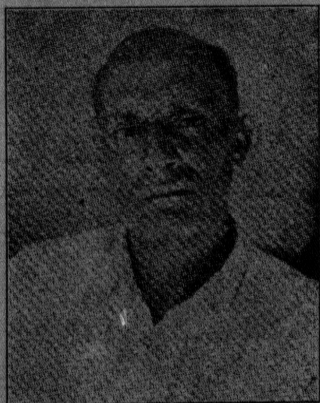
বারেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী
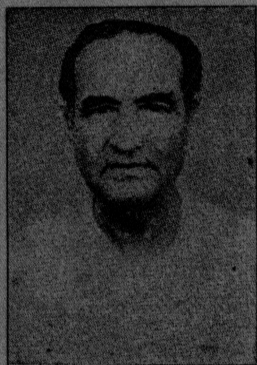
শিবনাথ ব্যানার্জী

গোষ্ঠ বিহারী মুখার্জী
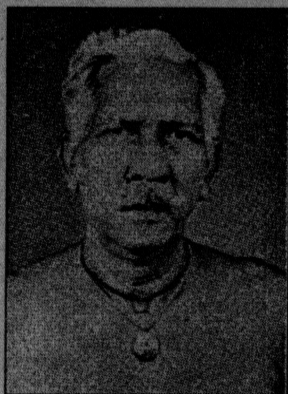
পুলিন বিহারী রায়
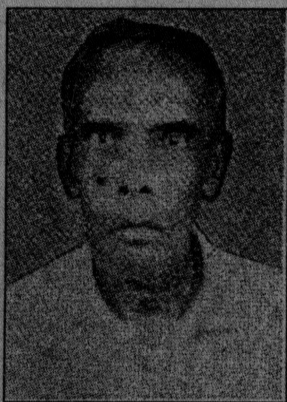
শিবপদ মুখার্জী

আশুতোষ ভট্টাচার্য
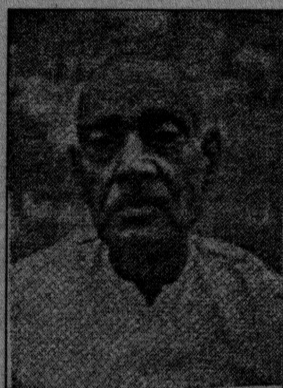
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ
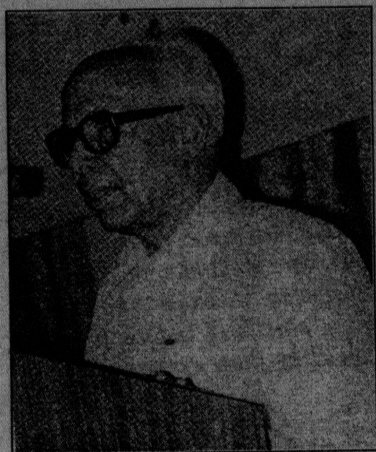
সমর মুখার্জী
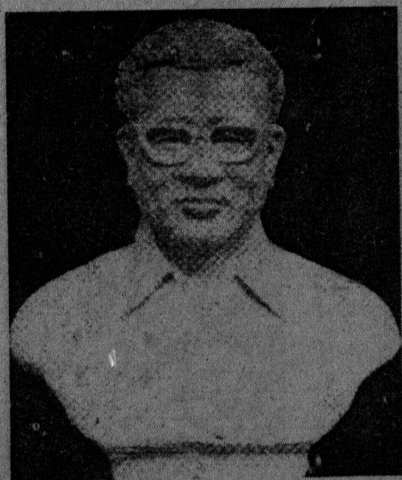
মদন দাস
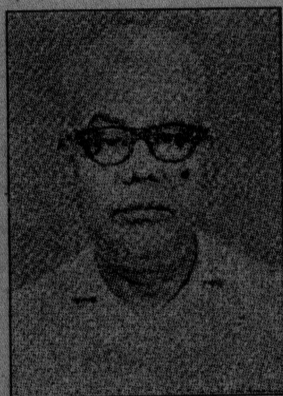
কানাইলাল ব্যানার্জী
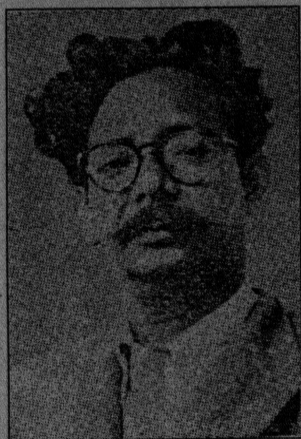
বিভূতি ভূষণ ঘোষ (নানু)
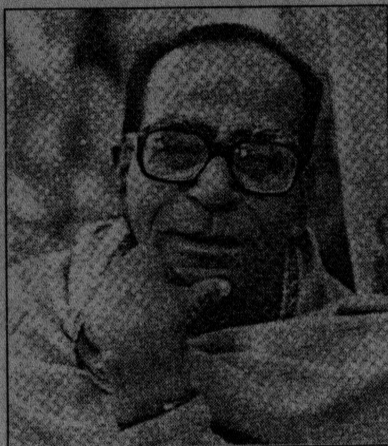
জয়কেশ মুখার্জী
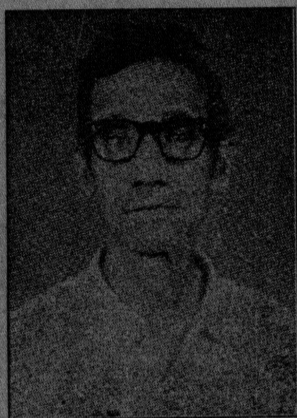
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
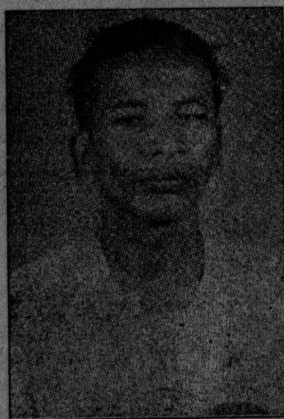
কার্তিক সেনাপতি
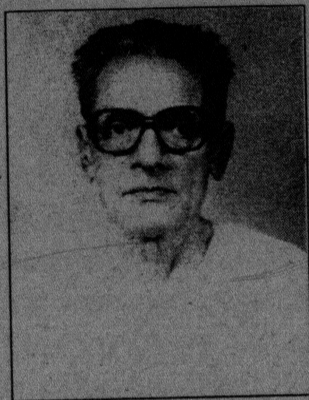
রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
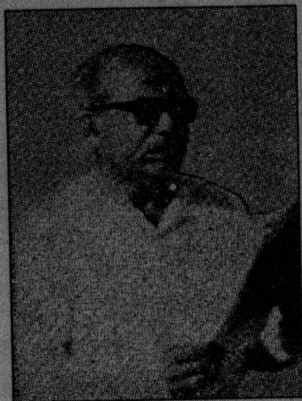
চণ্ডীদাস ঘোষ
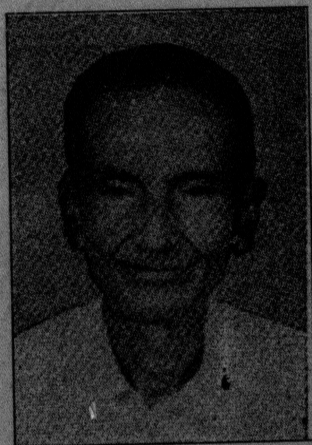
বিভূতি ভূষণ ঘোষ (বাঙ্গালপুর)
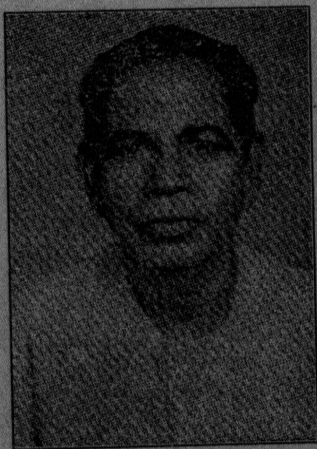
কমলাকান্ত শ্রীমানী

ভূমিকা

কলকাতা মহানগরীর ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের আগ্রহ বহুদিনের। একাধিক গ্রন্থ কলকাতার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখা হয়েছে, এ দেশে ও বিদেশে। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-গ্রন্থ ছাড়াও সাধারণ পাঠকের জন্য সুপাঠ্য ও সচিত্র গ্রন্থের অভাব নেই। তুলনামূলকভাবে হাওড়া শহর এবং হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনা গুরুত্ব পায়নি। অথচ হাওড়ার গুরুত্ব কিছু কম নয়। প্রকৃত পক্ষে হাওড়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কলকাতার ইতিহাসের বিবর্তন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক সমস্যা-সঙ্কট সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সুখের বিষয় হল গত দু'দশকে হাওড়ার ইতিহাসের প্রতি দীর্ঘদিনের উপেক্ষা অনেকটা দূর হয়েছে। কিন্তু কিছুটা বিস্ময়ের কথা হল যে পেশাদার ঐতিহাসিকেরা (Professional Historians) হাওড়া সম্পর্কে যতটা গবেষণা এবং লেখালেখি করেছেন তার থেকে বেশি করেছেন এমন কিছু মানুষ যাঁরা চলিত কথায় 'পেশাদার ঐতিহাসিক' নন। অর্থাৎ ইতিহাস রচনার বিশেষ পদ্ধতি, উপকরণ সংগ্রহ, সংগৃহীত উপকরণের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। অভিজ্ঞতাও তেমন নেই। ইতিহাস-চর্চা তাঁদের জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু এই রকম কিছু মানুষ, যাঁরা ইতিহাস ভালবাসেন, হাওড়া শহর ও জেলার প্রতি গভীর মমতা আছে, যাঁরা কোনো কিছু লাভের প্রত্যাশা না করেই গভীর নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম করে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। লুপ্তপ্রায় মূল্যবান তথ্য অনুসন্ধান করে সেগুলিকে তাঁদের রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরাই হাওড়ার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এঁদেরই একজন হলেন শ্রী দুঃখহরণ ঠাকুরচক্রবর্তী। আজীবন শিক্ষক ও সুযোগ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দুঃখহরণ বাবু 'স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা' গ্রন্থটি লিখেছেন।

'স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা' গ্রন্থটিতে এই জেলার স্বাধীনতা ইতিহাসের সার্বিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। লেখক জাতীয়স্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা, বিভিন্ন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে হাওড়া জেলাতে যে আন্দোলন চলেছিল তার যোগসূত্র ও সম্পর্কটি

তুলে ধরেছেন। ফলে সমগ্র বর্ণনাটি মূল ঘটনা স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। অথচ হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশদ ইতিহাসও গ্রন্থটিতে রয়েছে।

শ্রী দুঃখহরণ ঠাকুরচক্রবর্তী নানান উপাদান ব্যবহার করেছেন। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে কথা বলেছেন। দুষ্প্রাপ্য বই পড়েছেন। এর প্রতিফলন রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। হাওড়া জেলার বিভিন্ন সময়ের সংবাদপত্র-পত্রিকা, সরকারি কাগজপত্র, পুলিশ ও আদালতের রিপোর্ট এবং দলিলপত্র খোঁজ করলে পাওয়া সম্ভব। আশা করি আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে উৎসাহী তরুণ গবেষকরা ওই সব তথ্য সংগ্রহ করে, যুক্তিবাদী মন এবং দৃষ্টি নিয়ে সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর আরো আলোকপাত করবেন। তখন বর্তমান লেখকের সাধনা ও শ্রম আরো সার্থক হবে।

আমি আশা করি শ্রী দুঃখহরণ ঠাকুরচক্রবর্তীর গ্রন্থটি যোগ্য সমাদর ও স্বীকৃতি পাবে। নিষ্ঠাবান প্রবীণ লেখককে তাঁর উদ্যম ও প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাই।

৯ই অক্টোবর, ১৯৯৯। নিমাই সাধন বসু

বঙ্গভঙ্গের আগে

সিপাহী বিদ্রোহে ঃ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে হাওড়াব যোগ সুদীর্ঘকাল আগের। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার অন্যতম নেতা নানাসাহেব আন্দুলেব গোলাপবাগে এক বুড়ীর চালাঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১] মহাবাষ্ট্রেব সর্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীবাওয়েব দত্তকপুত্র নানাসাহেব ছিলেন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের রহস্যময় মহানায়ক।[২] ৩০শে জুন নানাসাহেব নিজেকে স্বাধীন পেশোয়া বলে ঘোষণা করেছিলেন। নানাসাহেবের সৈন্যবা পাণ্ডু নদীর তীরে ঘাঁটি করেন। কিন্তু সেতুটি উড়িয়ে না দেওয়ায় হ্যাভেলক ১৬ই জুলাই নানার পাঁচ হাজার সৈন্যকে পরাজিত কবেন। অতঃপর নানা পলায়ন করেন।[২/১] তাব পরে একসময়ে এই আশ্রয় গ্রহণ। হাওড়াতেই খুরুট রোডের সন্নিকটে বাস কবতেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচায। সম্ভবতঃ সিপাহী বিদ্রোহেব সমসাময়িককালে তিনি হাওড়াতেই বসবাস করতেন। জানা যায়, ১৮৬১ থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য হাওড়ায় প্রায় ২২ বছর ছিলেন।[২/২] 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতায় তাঁব মনের কথা বোঝা যায়। ব্রিটিশ রাজের নিন্দা ও সিপাহীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ঐ কবিতার বিষয়বস্তু। ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা করা সেই সুদূর অতীতে ছিল যথেষ্ট সাহস ও আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসের পরিচায়ক। কৃষ্ণকমলবাবু ঐ কবিতায় সেই সাহস ও আত্মশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক। তাঁর নামে খুরুট অঞ্চলে একটি বাস্তাব নামকরণ করে হাওড়া মিউনিসপ্যালিটি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।[৩]

নীল বিদ্রোহে ঃ

ইংরেজ শাসকরা তাদের বিরোধী শক্তিকে কোনদিনই লঘু করে দেখেনি। তারা যাদেরই হত্যা করত তাদেবই বিচাবের নামে প্রহসন ঘটিয়ে এনে ফাঁসী দিত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীলচাষ নিয়ে যে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, হাওড়ায় আন্দোলন আকারে না হলেও চাষীদের প্রতিবাদ যে ছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোড ও জি. টি. রোডের সংযোগস্থলটি প্রাচীনদের কাছে 'ফাঁসীতলারমোড়' নামে আজও খ্যাত। এখানে প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসী দেওয়া হতো। তার মধ্যে যে ইংরেজ অনুসৃত নীলচাষ নীতির বিরোধী নীলচাষীরা ছিলেন না এমন প্রমাণ নেই।

১৮৪৩ সাল পর্যন্ত হাওড়া হুগলী জেলার অংশ ছিল। ১৮৫৯-৬১ সালে নীল বিদ্রোহ হুগলী জেলায় ব্যাপক আকার নেয়।ডোমজুড থানার ডোমজুড় গ্রামের শিকদাব

আড়ায় নীলচাষের পুকুর আছে। এই পুকুরের কয়েক গজ পশ্চিমে সরস্বতী খালের ধারে বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি গাবগাছে তখন ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা ছিল। সর্বশেষ ফাঁসী দেওয়া হয় হেবো মীর নামক এক কৃষককে। ডোমজুড় থানার দক্ষিণ ঝাপড়দা'র জেলে পাড়ায় (পুর্বনাম ফিরিঙ্গীরবেড়--- ফিরিঙ্গী শব্দটি পর্তুগীজ Francez শব্দ থেকে সৃষ্টি) এখনও নীলকর সাহেবের কবর আছে। তখন মাকড়দা--ডোমজুড়ের সংযোগকারী সরাসরি রাস্তা না থাকায় (এখন যেমন আছে), ডোমজুড় ষষ্ঠীতলা--চড়কডাঙ্গা--মাকড়দা মুসলমানপাড়া সংযোগকারী যে রাস্তা ছিল সে রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে আসতে গিয়ে এক নীলকর সাহেব ঘোড়াসহ পড়ে যান। ঘোড়াটি মরে যায়। পুকুরটি আজও 'ঘোড়ামারাপুকুর' নামে আখ্যাত হয়। খাঁটোরা গ্রামের পূর্ণ দত্তর শ্মশানের কাছে নীল ভেজাবার দুটি চৌবাচ্চা আছে। ফলে, ঐ আন্দোলনে এখানকার কৃষকরাও যুক্ত ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। [৪]

শ্রমিক আন্দোলনে ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে সারাভারতে বিদেশী মালিকদের স্বার্থে শিল্পায়ন হতে থাকে। অধিকাংশ পুঁজিই আসে ব্রিটেন থেকে। গঙ্গানদীর মোহানার সন্নিকটে এবং শহর কলকাতার লাগোয়া হয়ে থাকায় শিল্প কারখানা বৃদ্ধির সুযোগ কিছুটা পরিমাণে হাওড়ায় বর্তেছে।

ভারতের প্রথম সুতাকল স্থাপিত হয় হাওড়ায়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বাউড়িয়ায় 'ফোর্ট গ্লস্টার মিলস্' নামে সুতাকলটি হয়। [৫]

"বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাতে দেখা যায় যে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল নব-গঠিত রেলওয়েতে। ১৮৬২ সালের এপ্রিল মে মাসে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভারতের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালেবোম্বাই-এ এবং বাংলায় রেলপথ স্থাপিত হয় তার পরবৎসর ১৮৫৪ সালে। রেলপথ স্থাপনের মাত্র ৭/৮ বৎসর পরই ভারতের রেলশ্রমিকদের এই ধর্মঘট যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

"কলকাতার সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশে' এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় ঃ

'সম্প্রতি হাবড়ার রেলওয়ে. স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘন্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘন্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক

পাইবেন না।' (সোমপ্রকাশ, ২৩শে বৈশাখ ১২৬৯, ইং ৫ই মে, ১৮৬২)।

"এই ধর্মঘটের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে যে আমেরিকার শিকাগোতে ১৮৮৬ সালে ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের ঘটনাবলী সংঘটিত হবার ২৪ বৎসর পূর্বেই ভারতের রেলশ্রমিকরা খুব বিচ্ছিন্নভাবে হলেও দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রমের দাবিতে ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন।" [৬]

হাওড়ার ঘুসুড়ি কটন মিলে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে একবার দশ দিনের এবং ১৮৯০ সালে আর একবার ৩ দিনের জন্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটের কারণ মালিক কর্তৃক মজুরী হ্রাস করা। [৭]

মাঝি-মাল্লাদের ধর্মঘট ঃ

গঙ্গানদীর সমস্ত মাঝি-মাল্লারাও ১৮৫৬ সালে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন ঃ

"ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এক আদেশ বলে নৌকার মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ফতোয়া জারি করলেন। কিন্তু সরকারের এ সিদ্ধান্তে দেখা দিল যত রকম বিপত্তি। তারা সরকারী করনীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন গঙ্গানদীর সমস্ত মাঝিরা। তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটে সামিল হলে এবং গভর্ণমেন্ট নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে,মাঝি-মাল্লারাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে বাধ্য হলেন নৌকা না চালানোতে। মাঝি-মাল্লাদের এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ঘটনা সে দিনের সংবাদপত্রেও স্থান করে নেয়। ১৮৫৬ সালের ২ রা ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকাটি সেদিনের কলকাতার পার্শ্ববর্তী নদীর মাঝি-মাল্লাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের খবরটি ছাপে ঃ 'হাবড়ার একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে। সাধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।' সত্যিই তো সেদিন নৌকার মাঝি-মাল্লাদের ধর্মঘটে বাণিজ্যিক কলকাতার নাভিশ্বাস উঠেছিল। সেজন্যই সংবাদপত্র জনসাধারণের কষ্টবৃদ্ধির কথা প্রকাশ না করে পারে নি। কারণ সেকালের নৌকাছাড়া বাণিজ্যিক কলকাতার কোন উপায়ই ছিল না।' [৮]

জাতীয় আন্দোলনে ঃ

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরই হাওড়া জেলায় রাজনৈতিক ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। ১৮৮৭ সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ায় 'রিপন কলেজিয়েট স্কুল' (অধুনা 'অক্ষয় শিক্ষায়তন') নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে এখানে শিক্ষকতা করতে থাকায় জনগণ ও ছাত্রদের মধ্যে বিরাট প্রভাব পড়ে। [৯] হাওড়া জেলার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৮৯১ সালে

কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনার জন্য হাওড়া টাউন হলে সাঁতরাগাছির কেদারনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় উক্ত সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় ঃ

"The Seventh National Congress.- A public meeting in connection with the seventh Indian National Congress and the approaching Bengal Provincial Conference was held on Saturday last at the Howrah Town Hall at 5 p.m. Baboo Kedar Nath Bhattacharjee, Zemindar and Honorary Magistrate, Presided. The following resolutions were unanimously adopted . (I)- That this meeting having considered the appeal which has been issued by the Calcutta Standing Congress Committee desires to record its warm approval of its unabated zeal in the Congress cause, and of its determination to do everything in its power to spread the principles of the Congress far and wide, throughout the district. (II)- That this meeting is of opinion that the national honour is pledged to the fulfilment of the promise to hold the Congress in London, all things being convenient, for the Session of 1892, and this meeting is of opinion that the necessary preliminary arrangements be made in this behalf. (III)- That delegates be elected to the seventh Indian National Congress to be held at Nagpore to represent the district of Howrah (IV)- That this meeting expresses its hearty sympathy with the aims and objects of the Bengal Provincial Conference and approves of the subjects tentatively fixed by the Standing Committee of the Conference. (V)- That delegates be elected for the approaching provincial Conference to be held in Calcutta. After the resolutions were adopted Baboo Surendra Nath Banerjee, at the request of the Chairman, addressed the meeting, and then with a vote of thanks to the Chair and Baboo Surendra Nath Banerjee the meeting seperated at 6.30 p.m."

[সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস ঃ

'সপ্তম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং আসন্ন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে গত শনিবার হাওড়া টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জমিদার ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় ঃ (১) এই সভা কলিকাতা স্ট্যান্ডিং কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রচারিত আবেদনটি বিবেচনা ক'রে আবেদনটিকে উষ্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করছে। এই সভা কংগ্রেসের লক্ষ্যের প্রতি অনবদমিত ঔৎসুক্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং জেলার সর্বত্র কংগ্রেসের আদর্শকে সর্বশক্তি দিয়ে সম্প্রসারিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে ;

(২) এই সভা মনে করে যে, ১৮৯২ বর্ষের জন্য লণ্ডনে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত পালিত হলে জাতীয় সম্মান সুরক্ষিত হবে এবং এই সভার অভিমত এই যে, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক ; (৩) নাগপুরে অনুষ্ঠিতব্য সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে হাওড়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক; (৪) এই সভা বঙ্গীয় জাতীয় সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করছে এবং সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্তৃক সাময়িক স্থিরীকৃত বিষয়াবলীব প্রতিও অনুমোদন জ্ঞাপন করছে ; (৫) কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্যও প্রতিনিধি নির্বাচন করা হোক।

প্রস্তাবাবলী গৃহীত হবার পর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় ভাষণ দান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে ৬-৩০ মিনিটে সভার কার্য শেষ হয়।']— ধরে নেওয়া যেতে পারে নাগপুরের সর্বভারতীয় অধিবেশনে এবং কলকাতার প্রাদেশিক সম্মেলনে হাওড়াও প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে বালীতে যে স্বল্পবিত্ত চাকুরীজীবী সমাজ গড়ে ওঠে তাদের সঙ্গে কলকাতা শহরের যোগাযোগ স্বাভাবিক কারণে ঘনিষ্ঠতর হয় এবং শহরের চিন্তাভাবনার ধারা ক্রমে ক্রমে বালীতে অনুপ্রবেশ করে। সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও সৃজনধর্মী কাজে এবং পরে বৃহত্তর পারিবেশে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'সাধারণী সভা' স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৩ সালে বালী পৌরসভার প্রথম অধিবেশনে ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাকে উপেক্ষা করে গ্রামের একজন শিক্ষিত নাগরিক সর্বোচ্চ ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ঘটনা সেই সময় বালীতে নজির সৃষ্টি করে। [১০]

ঐ সমকালীন সময়ে হাওড়ার বিশিষ্ট অঞ্চল উলুবেড়িয়ার মানুষও যে কি রকম সমাজ সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তাঁদের প্রেরিত প্রতিবাদ পত্রের মাধ্যমে ঃ "We learn by telegram from a correspondent at Oloaberia that the inhabitants of that place had assembled in a public meeting to protest against the Calcutta meeting in honour of Lord Dufferin. The Calcutta public, the telegram says, have no right to speak on our behalf, and a message was sent to the Sheriff to that effect." [১১]

উপরন্তু, হাওড়া জেলার প্রথম রাজনৈতিক পাক্ষিক 'গ্রামবাসী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে উলুবেড়িয়া থেকে। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। [১২]

সূত্র ঃ

(১) আন্দুলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মৌড়ীর ডাঃ ইন্দুভূষণ দাস ও গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের দেওয়া বিবরণ।

(২) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম খণ্ড)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (পৃঃ২৩)।

(২/১) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পৃঃ ২৫)

(২/২) হাওড়া জেলার ইতিহাস-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩৫৭)

(৩) হাওড়ার রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়-এ অনুষ্ঠিত এস. টি. ই. এর ১৩-তম বার্ষিক সম্মেলন—এর স্মারক পত্রিকায় শিশির কর-এর লিখিত প্রবন্ধ 'হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।'

(৪) স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া বিবরণ ; 'লোকমুখ' পত্রিকার প্রবন্ধ ঃ 'স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলার কৃষক'—জয়কেশ মুখার্জী (পৃঃ৩)

(৫) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)– সুকোমল সেন (পৃঃ ৪৭)

(৬) ঐ (পৃঃ ১১৭)

(৭) ঐ (পৃঃ ১২০-১২১)

(৮) ভারতের ধর্মঘটের ইতিহাস—বাসুদেব মোশেল (পৃঃ ৫৯)

(৯) পাঁচশো বছরের হাওড়া— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩০)

(১০) শতাব্দীর পরিক্রমায় বালীগ্রামের ইতিকথা— শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১০৯-১১০)

(১১) 'লোকমুখ' পত্রিকা (১ম বর্ষ ২য় সংকলন)— প্রবন্ধঃ 'বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও হাওড়া জেলা' --ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ৯-১০)

(১২) রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা ঃ প্রবন্ধ- শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে হাওড়ার সাময়িক পত্র— অচল ভট্টাচার্য।

বঙ্গভঙ্গে ঃ

বালীগ্রাম ঃ

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হবার পর প্রথম সংগঠিত আন্দোলন হয় লর্ড কার্জনের বাংলাদেশকে ভাগ করার হীনচক্রান্তের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫)। হাওড়া জেলার শহরে ও বিভিন্ন গ্রামে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে

পড়তে থাকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নানা জায়গায় সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--পরবর্তীকালে দেশবাসী যাঁকে 'রাষ্ট্রগুরু' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। হাওড়ায় রিপন কলেজিয়েট স্কুল স্থাপনা ও সেখানে শিক্ষকতা করার মধ্য দিয়ে হাওড়াবাসীর সঙ্গে তাঁর পূর্বেই যোগস্থাপন হয়েছিল, এখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রবাহে সেই সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। বালী গ্রামের মথুর গাঙ্গুলী, ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ চক্রবর্তী প্রভৃতি যুবকরা নলিনচন্দ্র মিশ্রের (১৮৭৪-১৯২২) নেতৃত্বে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। নলিনবাবু প্রথম যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। সেই যুগটাই ছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের। বালী গ্রামে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যে সভা হয় তাতে তাঁকে ফিটন গাড়িতে (সম্ভবতঃ গাড়িটি ছিল উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের) চাপিয়ে নলিনচন্দ্র প্রমুখ নির্ভীক স্বদেশীপ্রচারক যুবকবৃন্দ সেই গাড়ি নিজেরাই টেনে নিয়ে আসেন। সেখানে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ খণ্ডিত বাংলাদেশকে পুনরায় যুক্ত করার শপথ নেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের প্রবর্তন করেন। তিনি যেমন গঙ্গাস্নানান্তে রাখী হস্তে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সমবেতকণ্ঠে গান করতে করতে ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলের হাতে রাখী পরিয়ে দিতেন ও কোলাকুলি করতে করতে চলতেন—নলিনচন্দ্রও বালী-বেলুড়ে গঙ্গাস্নানান্তে কল্যাণেশ্বর দেবকে প্রণাম করে সদলবলে রাখীহস্তে গান করতে করতে ঐভাবে পথ পরিক্রমা করতেন। আগের দিন কোন বাড়িতে রান্না হতো না। নলিনচন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ি থেকে এক মুঠো করে চাল সংগ্রহ করে একদিন কাঙালী ভোজন করাতেন। স্বদেশী প্রচারেব জন্য বালীতে স্বদেশী সভা গঠিত হয়েছিল এবং তা স্থাপিত হয়েছিল মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে। এই সভা থেকে যুবক ও ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বদেশী কাপড় বিক্রী করত এবং নলিনচন্দ্র প্রমুখ বক্তারা নানাস্থানে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতেন। তাঁদের এই উদ্যোগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি বালীগ্রামে এসে স্বদেশীর বীজ বপন করেন। স্বদেশীর যুগে যে সভায় মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন পড়িয়েছিলেন, বালীগ্রামে সেরকম বিরাট সভার আয়োজন আর কখনও হয়েছিল বলে মনে হয় না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই সভা সংগঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে নলিনচন্দ্রের ও অপরাপর কয়েকটি যুবকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে বাংলায় যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখনও নলিনচন্দ্র

তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরই রচিত গান গেয়ে "দেশভাই তবে দেশভাই দ্বারে, দেশভাই মোরা করি নিবেদন"—দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যকল্পে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতেন। বর্ধমানে বন্যার সময়ও নলিনচন্দ্র শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, বি.এল মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে বালীতে Flood Relief Commitee গঠন করেন।

তখন দিকে দিকে স্বদেশী ভাণ্ডার গড়ে উঠতে লাগল। এই রকমই একটি দোকান স্থাপিত হয় বাঁড়ুয্যে পাড়া (বর্তমানের শান্তিরাম রাস্তা) যেখানে জি.টি.রোডে মিশছে, সেখানে। দোকানটি দেন নলিনবাবুর খুড়তুতো ভাই সঞ্জীবন মিশ্র। দোকানে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কাগজ, খাতা, দেশী পেন্সিল, কালি, কলম, লজেন্স, বিস্কুট (এ দেশেই তখন তৈরি হচ্ছে) পাওয়া যেত। কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়ে গেল। এই সময় জি. টি.রোড দিয়ে একটি লোক পায়ে ঘুঙুর পরে নাচতে নাচতে গেয়ে যেতেন, "কোথা ক্ষুদিরাম, কাঁদছে অভিরাম।" সঞ্জীবনদা তাকে ডেকে এনে নাচগান শুনতেন এবং ছাত্র ও পথচারীবৃন্দও তা শুনতেন। এর ফলে জনমনে দেশপ্রেমিক আবেগ সৃষ্টি হতো।[১]

হাওড়া শহর ঃ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ২৯শে আগস্ট হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার নাগরিকরা সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই সভার বিবরণ ১৯০৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'হাওড়া হিতৈষী'তে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্র রচনাবলী-(১ম খন্ড) থেকে জানা যায় স্বদেশী-আন্দোলনের ব্যাপারে-অর্থ সংগ্রহের জন্য অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সংগে রামকৃষ্ণপুরে এসেছিলেন এবং সাধারণ মানুষ অর্থ দিয়েছিলেন। শিবপুরে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছিল। ঐ সময়েই হাওড়াবাসীরা বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ তার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯০৫ সালের ২৯শে নভেম্বরের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে শিবপুর বি. ই. কলেজের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিরোধিতা করেন। বিদেশী দ্রব্য কেনার ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবীদের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান করা হচ্ছিল। ১৯০৫ সালের ৭ই ডিসেম্বরের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, তৎকালীন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ফরেস্ট বিদেশী দ্রব্য কেনায় কাউকে বাধা দিলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[২]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হাওড়ার 'পিপল এ্যাসোসিয়েশন'-এর সভায় শ্রী অরবিন্দ হাওড়া পৌরসভায় আসেন।[৩]

ডোমজুড় ঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকেই রাখীবন্ধনের সূত্রপাত। সেই রাখীবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাতে ডোমজুড়ের যুবমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডোমজুড় গ্রামের অধিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন

কলকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার। তিনি এম. এ পাশ ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খাঁটোরা গ্রামের পঞ্চানন মিত্র প্রমুখের সহযোগিতায় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে খাঁটোরা গ্রামে সভা হয়। কবিগুরু প্রবর্তিত রাখীবন্ধন উৎসব এখানেও আরম্ভ হয়। প্রতিবৎসর রাখীবন্ধনের দিনে শোভাযাত্রা বের হতো। কোথাও কোথাও শোভাযাত্রাকারীরা লাল তেকোণা ঝান্ডা উড়িয়ে গান গেয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। কোথাও কোথাও চাল পয়সা সংগ্রহ করে বালক ভোজন হতো। এই সময় যুবকদের কণ্ঠে এই গানটি শোনা যেত ঃ

'গাও মাতৃনাম যতেক সন্তান
হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান
আজিকে সেদিন যেদিন গৌরাঙ্গ
করেছে অঙ্গচ্ছেদ এ সোনারই বঙ্গ...' [৪]

বরিশাল সম্মেলনে ঃ এই সময়ে ডোমজুড় থানার পার্বতীপুরের প্রখ্যাত গায়ক নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পিতা-জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়) তাঁর সুললিত কণ্ঠের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে এতদঞ্চল মুখরিত করে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে তিনি সুর দিয়েছিলেন। তাঁর সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনেকেরই আলাপ ছিল এবং বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের (পরবর্তীকালের ঋষি অরবিন্দের) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। অনেক জায়গাতেই অরবিন্দবাবু নারায়ণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নারায়ণবাবু তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা অটলবিহারী মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দাদা)-কে নিয়ে লাঠিখেলা শিখতে খুলনা যান। খুলনা থেকে তাঁরা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত আহূত বরিশাল সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হবে স্থির হয়। সভাপতিত্ব করবেন ব্যারিস্টার আবদুল্লা রসুল এবং অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। কিন্তু সভা শুরু হবার আগেই পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের নির্দেশে তাঁর চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি. সি লায়ন পথে পথে পার্কে পার্কে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোর্খা সৈন্যরা লাঠি নিয়ে জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারায়ণবাবু আহত হন এবং সম্মেলন শেষে সঙ্গীসহ স্বগ্রামে ফিরে আসেন, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসেন বরিশালে বর্বর দমননীতির স্মৃতি। তারপর নানাস্থানের সভা সমিতিতে ছড়িয়ে পড়ত তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত গান—'আজি বরিশাল পুণ্যে বিশাল হল লাঠির ঘায়ে..'। [৫*]

এই সম্মেলনে 'হাবড়া হিতৈষী'-র সম্পাদক গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তবে আহত হন নি। প্রথম দিনের অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবও তিনি সমর্থন করেছিলেন।[৫ক]

'ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির এই প্রথম সংঘর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এই সংঘর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবল প্রেরণা দিয়াছিল। বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাতের মত ঘটনায় বিস্ফোরণ হয়। বাংলায় চরমপন্থী দলের ও বাহুবলে বাহুবল প্রহত করিবার চেষ্টার উদ্ভব হয়।' [ভারতবর্ষ—চৈত্র ১৩৫৭, পৃঃ৩২০]

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে 'পুণ্যে বিশাল বরিশালের' প্রাদেশিক সম্মেলনীতে যে স্মরণীয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাতে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ, উপাধ্যায়, বিশারদ ও অন্য অন্য নেতাদের উপর সিপাহীর আক্রমণ ও আক্রমণে উদ্যত হবার ঘটনা ঘটে।[৬]

ডোমজুড়ের যুবকদের মধ্যে চরমপন্থী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। অটলবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হন ও লাঠিখেলায় অসম্ভব পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। এই সময় থেকে নারায়ণবাবু কলকাতার দর্মাহাটায় শেঠদের বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি পাঞ্জাবে চলে যান।[৭]

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সুরেন্দ্রনাথের এক সভার উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণের ফলে উদ্ভূত এক মর্মান্তিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন অমিয় ঘোষ তাঁর 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' প্রবন্ধে ঃ

"১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। উত্তাল করে তুলেছে সারা বাংলাকে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ শোভাযাত্রা আর পার্কে পার্কে জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কলকাতা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমনি একটি দিনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিডন স্কোয়ারে এক সভায় শহর ও শহরতলি থেকে দলে দলে স্কুল কলেজের ছাত্ররাও যোগ দিয়েছে। হাওড়া থেকে ছাত্রদের শোভাযাত্রায় দ্বারিকানাথও ছিল। বাংলা বিভাগের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা সহ্য হল না বৃটিশ শাসক অনুচরদের। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা শান্তিপূর্ণ নিরীহ জনতাব ওপর। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল জনতা, সংঘর্ষ শুরু হোল—পুলিশের গুলিও চলল। আহতদের তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। চিরতরে হারিয়ে গেল দ্বারিকানাথ। হত বা আহত দ্বারিকানাথের আর কোনদিনই খোঁজ পাওয়া গেল না।"

এই দ্বারিকানাথ হলেন পরবর্তীকালের হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সুবিখ্যাত কর্ণধার এবং এ জেলায় সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী কর্মধারার অন্যতম নায়ক হরেন্দ্রনাথ ঘোষের পরের ভাই। এ পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে আমরা নিঃসন্দেহে সেই কিশোর স্বাধীনতা সংগ্রামীকে হাওড়া জেলার 'প্রথম শহীদ' আখ্যায় ভূষিত করতে পারি।

সাহিত্য প্রকাশনঃ

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক 'মাতৃপূজা' নামে এই সময় একখানি বই লেখেন। বইখানি ছিল গানের বই। জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বইখানির প্রকাশক। হাওড়ায় তখন 'দি ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে। নামটি থেকেই বোঝা যায় দেশপ্রেমমূলক পত্র পত্রিকা পুস্তকাদি ছাপার প্রয়োজনেই প্রেসটির স্থাপনা। 'মাতৃপূজা' পুস্তকটির মুদ্রক ছিলেন নবীনচন্দ্র পাল। লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে নিয়ে মামলা শুরু হয় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ। ঐ বছর ১২ই জুলাই মামলার রায় বের হয়। এতে কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের একবছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। মুদ্রাকর নবীনচন্দ্র পালের ২০০ টাকা অর্থদন্ড হয়। [৮]

সূত্র ঃ

(১) নলিনচন্দ্র মিশ্র প্রণীত 'বালী গ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থের মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভূমিকা ও ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ, শতাব্দীব পরিক্রমায় বালীগ্রামের ইতিকথা—শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা ১১০-১১১)।

(২) 'লোকমুখ' (১ম বর্ষ ২য় সংকলন) প্রবন্ধ-'বৈপ্লবিক সংগ্রামে হাওড়া'-ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়' (পৃঃ ৯)।

(৩) এস টি. ই. এ-র ১৩তম সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত 'হাওড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়' প্রবন্ধ।

(৪) বিপ্লবী আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্য।

(৫) ডোমজুড় থানার পার্বতীপুরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত তথ্য; 'বিপ্লবী বাংলা'—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী (পৃঃ১১৭)।

(*) গানটি রচনার সমর্থন আছে 'বিপ্লবী বাঙ্গালা ও স্বাধীনতার ইতিহাস'—রাজেন্দ্রলাল আচার্য প্রণীত গ্রন্থে (পৃঃ ২১৫)।

(৫ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল— হীরালাল দাশগুপ্ত (পৃঃ ৫১ ও ৫৫)

(৬) বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো (পৃঃ ৭৬)

(৭) স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।

(৮) 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' (১ম খন্ড)-কালীচরণ ঘোষ (পৃঃ ২০৪)

— ০ —

বিপ্লবী সংগ্রামে ঃ

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্রের সভাপতিত্বে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের দোলপূর্ণিমার দিন উক্ত গুপ্তসমিতি 'অনুশীলন সমিতি' নাম গ্রহণ করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র দত্ত, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল গুপ্ত শিবপুরের ধর্মতলায় 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির অনুসৃত কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে এখানে লাঠিখেলা, কুস্তিলড়া, তরবারি চালনা প্রভৃতি শেখানো হতো। [১]

বালী ঃ বালীতে পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহপ্রাঙ্গণের কুস্তি আখড়ায় অনুশীলন সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের বিপ্লববাদী শিক্ষাব্রতী সতীশ সেনগুপ্ত ও বিপ্লবী সঙ্ঘের কর্মী ডাঃ আশুতোষ দাসের সান্নিধ্যে আসেন পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠী বীরেন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্র দাস, ঘনশ্যাম গোস্বামী প্রভৃতি। আত্মগোপনকারীকে গোপন-আশ্রয় দান করা, অর্থসাহায্য দেওয়া, পত্রের আদান প্রদান করা প্রভৃতি তাঁদের কর্মসূচীর মধ্যে থাকত। এ সব কাজে আরও যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা হলেন—সতীশ চক্রবর্তী, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। [২]

উল্লাসকর দত্তের অস্ত্র কারখানা ঃ

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত জন্মসূত্রে না হলেও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য শিবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে স্বীয় বাসভবনকে অস্ত্রনির্মাণ কারখানায় পরিণত করে বিশ শতকের শুরুতে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনের প্রথম যুগেই হাওড়াকে ইতিহাসে স্থান করে দেন।

তিনি ছিলেন শিবপুর বি. ই. কলেজের অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্তের পুত্র। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দেখেন, পুলিশ ভিড় সরাবার জন্য বেপরোয়া লাঠি চালাচ্ছে। পুলিশের এই কাজের প্রতিবাদ করায় পুলিশ তাঁকে প্রহার করে ও থানায় নিয়ে যায়। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস তাঁকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন। পরে উল্লাসকর বরিশাল সম্মেলনেও যান। [৩]

উল্লাসকর প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকা কালে অধ্যাপক রাসেল বাঙ্গালী ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছু কটূ মন্তব্য করায় উল্লাসকর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন এবং 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে কলেজ ত্যাগ করেন, আর যান না। প্রেসিডেন্সী কলেজের গায়ে পোস্টার পড়ে 'House to let. Apply to Lord Curzon.'

বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এসে শিবপুরের বাড়িতে গোপন ল্যাবরেটরি স্থাপন

করেন। সেখানে বোমা নির্মাণ এবং বিস্ফোরক সম্বন্ধে উচ্চপর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। নাইট্রো গ্লিসারিন ও ফ্যালমিনেট অব মাকরিী তাঁর পরীক্ষাগারে করতে সক্ষম হন। এইখান থেকেই জেলিগনাইট ও পিকরিক অ্যাসিডের বোমা তৈরি করে সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। তাঁরই নির্মিত বোমা চন্দননগরের মেয়র তার্দিডেলের গৃহে নিক্ষিপ্ত হয় ; নারায়ণগড়ে ছোটলাট স্যার এণ্ড্রুফ্লেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন ওড়াতে তারই তৈরি মাইন ব্যবহৃত হয়।

যশিডিতে 'দিঘিরিয়া' পাহাড়ে তারই তৈরী বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। সেটা ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। উল্লাসকর নিজেও আহত হন। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মৃত্যুর মধ্যদিয়েই উল্লাসকরের ফরমূলার কার্যকারিতা প্রমাণ হয়ে গেল এবং সেই সব ফরমূলা অনুযায়ী প্রস্তুত বোমা নিয়েই প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু মাস দুই পরে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। [৪]

১৯০৮ সালের ২রা মে বারীন্দ্র , হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র কলকাতার মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়ী সশস্ত্র পুলিশ তল্লাসী করে। উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্তের শিবপুরের বাসাতেও পুলিশ হানা দেয়। [৫]

ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকির মজঃফবপুর অ্যাকশনের (৩০/৪/১৯০৮-এর) পর পুলিশ যে হানা দেবে সে খবর বিপ্লবীরা টের পেয়েছিলেন। ঠিক হলো, উল্লাসকরকে দিয়ে গোপীমোহন দত্ত লেনে যে সব যন্ত্রপাতি ও জিনিস ছিল তা ৫/৬টি বাক্সে ভর্তি করে নিয়ে গিয়ে কয়লাঘাট থেকে নৌকা আলাদাভাবে ভাড়া করে তার বাবার ল্যাবরেটরিতে রাখা হবে, ল্যাবরেটরিতে ওসব কেউ সন্দেহ করবে না—বাকি জিনিস গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গোপীমোহন দত্তের বাড়িতেও কিছু মাল রইল, কিছু মাল হ্যারিসন রোডে উল্লাসকরের এক আত্মীয় কবিরাজের বাড়িতে রাস্তার ধারে বসবার ঘরের খাটের তলায় রাখেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পুলিশের নজরে এসে যায়। যিনি উল্লাসকরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর 'অবিমৃষ্যকারিতাতেই' এমন অঘটন ঘটে গেল, উল্লাসকরের এতে কোন দোষ ছিল না। [৬]

মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি ও অন্যান্য স্থান তল্লাসীর পর পুলিশ আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলা চালু করে। তাতে স্বীকারোক্তিতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেন ঃ

"উল্লাসকর দত্ত একটি ছোট 'ডিনামাইট মাইন' এবং কতকগুলি 'ফিউজ্' ও 'ডিটোনেটর' লইয়া চন্দননগরে গমন করেন ও লাটসাহবের 'স্পেশাল ট্রেন' আসিবার পূর্বে, উহা রেল লাইনে পাতিবার মনস্থ করিয়া যখন স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন তখন কতকগুলি লোক আসিয়া পড়ে।... সেজন্য কয়েকটি কার্তুজ রেললাইনে রাখিয়াই

সরিয়া পড়েন। উহাতে সামান্য একটু বিস্ফোরণ হয়, কিন্তু ট্রেনের কোনই ক্ষতি হয় না...আমার, উল্লাস ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়াই সকল কার্যক্রম স্থির করা হইত।" [৭]

উল্লাসকর আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এল. বালির কাছে ইংরাজীতে যে বিবৃতি দেন তাতে উল্লেখ থাকে —"আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতিতে বৈদ্য এবং গো-পালন আমার পেশা। আমার নিবাস ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত মৌজা কালীকচ্ছে। হাল সাকিম গ্রাম শিবপুর, হাওড়া।"[৮]

আলিপুর বোমার মামলায় দায়রা জজ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে তাঁর প্রাণদণ্ডের রায় দেন। রায় শুনেই উল্লাসকর আনন্দে বলে ওঠেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' [৯] তারপর আদালতের সকলকে মুগ্ধ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে থাকেন ঃ

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে।।
...আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতে নয়ন রেখে
মুদবো নয়নশেষে।।"

হাইকোর্টের আপীলের রায়ে (২৩শে নভেম্বর, ১৯০৯) দণ্ডাদেশ হ্রাস পায়—যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হয়। তৃতীয় জজও সেই রায় বহাল রাখেন। তাঁর রায় দানের তারিখ ১৮/২/১৯১০। [১০]

আন্দামানের কারা কর্তৃপক্ষও তাঁর প্রতি প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করত। "প্রচণ্ড রোদে ইট তৈরির কাজে পরিশ্রান্ত উল্লাসকরকে মেডিক্যাল অফিসারের পরামর্শ উপেক্ষা করে কাজে বহাল রাখতে চাইলে উল্লাসকর তা অস্বীকার করেন। এর পরিণাম সাতদিন দাঁড়া-হাতকড়ি এবং ১০৬ ডিগ্রি জ্বরে চেতনালোপ। উপেন্দ্রনাথ আন্তরিক মমতার সঙ্গে উল্লাসকর সম্পর্কে বলেছেন -- 'আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রণায় যাঁহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই, তিনি আজ উন্মাদ রোগগ্রস্ত।" [১১] মুক্তি লাভের পর তিনি আর কোন রাজনৈতিক সংস্রব বজায় রাখেন নি। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে এই বিপ্লবী স্বাধীন দেশের মাটিতে বহুজনের অগোচরে নিঃশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংবাদপত্রে অবশ্য অতিসংক্ষিপ্তাকারে হলেও সে সংবাদ বেরিয়েছিল।

স্বদেশী ডাকাতির সিদ্ধান্ত ঃ

বিশ শতকেব প্রথম দশকেই (১৯০৬/৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ) বিপ্লবী সংগঠনকে

উপযুক্তরূপে পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। অর্থ সংগ্রহের বিষয় আলোচনার জন্য রাজা সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে একটি দৃপ্ত সভা বসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। সেখানে আলোচনান্তে ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রী অরবিন্দ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। সরকারী টাকা লুঠ করতে গেলে যে প্রস্তুতি ও শক্তির দরকার হয় বিপ্লবীদের তা ছিলনা। সুতরাং দেশের লোকের মধ্যে যারা দেশদ্রোহী, গুপ্তচর, মদ্যপ, অত্যাচারী, সুদখোর তাদের বাড়িই ডাকাতি করা হবে বলে স্থির হয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির হয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর উক্ত টাকা পুরোপুরি ফেরৎ দেওয়া হবে।[১২]

সেদিন বিপ্লবীরা তাঁদের শৌর্য বীর্য ত্যাগ চারিত্রিক মহত্ত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন স্বাধীনতার পর দেশের বল্গা তাঁদের হাতেই ধরা থাকবে। তাই, সেদিন তাঁরা ডাকাতির টাকা পুরোপুরি ফেরৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে, স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর যে মূল্য তাঁদের পাওয়া প্রয়োজন, তা তাঁরা পাবেন না।

ডাকাতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই নানাস্থানে ডাকাতি সংঘটিত হতে থাকে। আবার কয়েকটি নরহত্যাও অনুষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবী কার্যধারাকে স্তব্ধ করার জন্যই 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা' নিয়ে আসা হয়। সে বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সূত্রঃ (১) 'লোকমুখ' (১ম বর্ষ, ২য় সংকলন) ঃ প্রবন্ধ ঃ বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও হাওড়া জেলা—ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১০)।
(২) শতাব্দীর পরিক্রমায় বালীগ্রামের ইতিকথা-শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৩)।
(৩) বিপ্লবী বাংলা-তারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী (পৃঃ ১৪৭-১৪৮)।
(৪) 'অগ্নিযুগ'-(সম্পাদনা ঃ শৈলেশ দে) প্রবন্ধ ঃ আশ্চর্য মানুষ উল্লাসকর—লেখক ঃ মনোরঞ্জন ঘোষ (পৃঃ ২৫) ও ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় (পৃঃ ৭৮-৭৯)।
(৫) বিপ্লবী বাংলা—তারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী (পৃঃ ১৬৮-১৭০)।
(৬) বাংলায় বিপ্লববাদ—হেমচন্দ্র কানুনগো (পৃঃ ১৬৭)।
(৭) বিপ্লবী বাংলা—তারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী (পৃঃ১৭৫)।
(৮) ঐ (পৃঃ ১৭৭)।
(৯) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (পৃঃ১০৯)।
(১০) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক সর্বতথ্য সারসংগ্রহ—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (পৃঃ ৬৩৮-'৪০)।
(১১) বাংলার কারাসাহিত্য-আদিত্য চৌধুরী (পৃ:৪৫)।
[অন্ত্য উদ্ধৃতিঃ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (পৃ: ৪২)]।
(১২) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম খন্ড)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (পৃঃ ১১০) এবং বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীগুহ (পৃঃ৯৩)।

নন্দলাল ব্যানার্জীর হত্যায়

'সবার অলক্ষ্যে'(১ম পর্ব) গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠায় বিপ্লবী ভূপেন রক্ষিতরায় লিখছেন—

"১৯০৮সনের এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরের ঘটনা ঘটে গেছে। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই পিস্তলের গুলীতে নিজেকে নিঃশেষ করে বাঙলার শহীদ-অগ্রদূতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু এই তরুণ বীরকে গ্রেপ্তার করেছে যে পুলিশ কর্মচারী, তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। বিপ্লবী শ্রীশ পাল উক্ত পুলিশ কর্মচারী নন্দলাল ব্যানার্জীকে ছেড়ে দিলেন না। 'আত্মোন্নতি'-র সঙ্গে যোগাযোগে এই কাজটি সম্পন্ন হল। বিপ্লব সংস্থার কঠিন শাস্তি বিপ্লব-ইতিহাসে স্বাক্ষরিত হয়ে রইল। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে শ্রীশচন্দ্র গুলীর আঘাতে নন্দলালকে নিহত করলেন। পুলিশ-নন্দলাল বিপ্লবীর বিচারে তার অপকীর্তি ও দেশদ্রোহিতার জন্যে মৃত্যু দণ্ড লাভ করল।.....এই দুর্জয় অভিযানে শ্রীশবাবুর একটি সঙ্গী ছিলেন। বীর্যবান সে তরুণ 'আত্মোন্নতি' দলেরই কর্মী। তাঁর নাম রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

"শ্রীশ বাবুকে কেউ ধরতে পারল না। পুলিশ তো দূরের কথা, বিপ্লবীদলের দু'চারজন ছাড়া অপর বিপ্লবীদের কাছেও কে বা কারা যে ঐ কাজটি করেছেন তা' অজানা রয়ে গেল। আজ পর্যন্ত অনেক বিপ্লবী বা ঐতিহাসিক পুলিশ-রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে না পেরে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।......"

আমাদের গর্বের বিষয় শ্রীশচন্দ্রের সেই 'দুর্জয় অভিযান'-এর সঙ্গী রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী আমাদের হাওড়া শহরেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পৈতৃক বাসভবনের ঠিকানা '৬৪নং বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন, হাওড়া'। তাঁর জন্ম ঐ ঠিকানায়, কুখ্যাত নন্দলালকে হত্যা করার সময়ও তিনি মধ্য হাওড়ার ঐ ঠিকানায় বসবাস করেছেন এবং আমৃত্যু ঐ ঠিকানাতেই ছিলেন।

উক্ত 'সবার অলক্ষ্যে' (১ম পর্ব) গ্রন্থে লেখক রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর লেখা একটি পত্র ছেপেছেন (পৃঃ২৩৩-২৩৪)। সেই পত্রের মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন —

"['আত্মোন্নতি সমিতি'র প্রবীন বিপ্লবী সভ্য রণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পুলিশের দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জীকে সার্পেন্টাইন লেনে হত্যার ব্যাপারে (৯-৫-১৯০৮) সংশ্লিষ্ট ছিলেন। * হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আগে তাঁর একখানি পত্র 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র ২৫-১১-৬৫ তারিখের সংখ্যায় 'পাঠকমন' অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়। এই পত্র থেকে নন্দলালকে হত্যা করার ব্যাপারে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের সঠিক

---

* সম্ভবতঃ এই তারিখটি ৯-১১-১৯০৮ হবে - (লেখক)।

সংবাদ পাওয়া যায় বলে উহা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী রূপে একমাত্র রণেন্দ্রনাথ-ই বর্তমানে জীবিত আছেন।]"

গ্রন্থে রণেন্দ্রনাথের পুরো চিঠিটিই ছাপা হয়েছে। নীচে শুধু সংশ্লিষ্ট অংশটিই তুলে দিলাম —

" আমি নন্দলালের ওপর নজর রাখার এবং হত্যার নির্দেশ পেয়েছিলাম আত্মোন্নতি সমিতির 'হরিশ্চন্দ্র শিকদারে'র কাছ থেকে। **এই ঘটনায় আরও একজন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল।** শ্রীশচন্দ্র পাল তখন থাকতেন হরিশ্চন্দ্রের বাড়ির পাশে আমহার্স্ট স্ট্রীটে ছুতোর পাড়ার মোড়ে।"

এই পত্রেই রণেন্দ্রনাথের বাড়ির পূর্বোল্লিখিত ঠিকানা দেওয়া ছিল। তা থেকেই জানা গেল যে, তিনি হাওড়ার অধিবাসী ছিলেন।

ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায়ের 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থের (৫৮পৃঃ) থেকে জানা যায় যে,—

১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের 'মুক্তি সংঘে'র যোগসাজশে। 'মুক্তিসংঘ'-এর কলকাতার প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল। তাঁবই গুলির আঘাতে দেশদ্রোহী নন্দলাল নিহত হয়। এই কাজে শ্রীশচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন 'আত্মোন্নতি'-র রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

এ সম্বন্ধে উক্ত লেখক উমা মুখার্জীর 'Two Great Indian Revolutionaries' নামক গ্রন্থের (২৩১পৃঃ) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

"... At the appointed hour Ranen and Naren (Srish Pal) set out and waited before the old Siva temple cracking and taking ground-nuts, and shortly after finding Nandalal Banerjee coming out of his house they moved forward. It was Naren (Srish Pal) who actually killed Nandalal just at the S.W.Corner of St.James Park at about 7p.m. To be sure of the accomplished murder Ranen also struck the head of the man with his own revolver."

এরপর ওঁরা বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। পুলিশও জানতে পারলনা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন, বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই জানতে পারলেন না কোন-কোন বিপ্লবীর হাতে এই দেশদ্রোহী পুলিশ কর্মচারীর মৃত্যু ঘটল।

রণেনবাবুর ব্যাক্তিগত শেষ জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গেল তাঁর প্রতিবেশী পরেশনাথ শেঠ ও তাঁর দৌহিত্র অজিত ভট্টাচার্যের কাছ থেকেঃ

রণেন বাবুর পৈতৃক স্থায়ী নিবাস হাওড়াতেই। তাঁরা দুভাই ছিলেন। রণেনবাবুর নিজের ছিল নিউ মার্কেটে স্পোর্টসের দোকান। কিছু বেশি বয়সেই আন্দুল-মৌড়ীতে

বিবাহ করেন। একপুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবার আগেই স্পোর্টসের দোকান বিক্রি করে দেন। পুত্র বিমলের বিবাহের কথা চলার সময়েই তাঁর মৃত্যু হয় (১৪.১.১৯৭১)। পুত্রের মৃত্যুর পরই নিজে অকর্মণ্য হয়ে যান। তাঁর তিন কন্যারই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। পৌনে চারবছর 'রিষড়া সেবা সদনে' শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুন ঐ সেবাসদনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি জীবিত ছিলেন —কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমের স্বীকৃতি স্বরূপ কোন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আমরা করিনি, তাঁর মৃত্যুতেও কোন শোকসভা হয়নি। নিঃশব্দে নীরবে চরম দুঃখ সীমাহীন দারিদ্র্য ও নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে এই বিপ্লবী বীরের জীবনাবসান ঘটল।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ঃ

১৯১০ সালের মার্চ মাসে ৫০ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুগাল ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই হাওড়ার শিবপুরের ননীগোপাল সেনগুপ্ত এবং আরও ৪৫ জন আসামীকে কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য সোপর্দ করেন। 'দি হাওড়া গ্যাং কেস' নামে মামলাটি পরিচিত হয়।

মামলাটির পশ্চাৎপট হলো ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল হাওড়ার শিবপুরের শ্রীহরিণপাড়ায় ক্ষীরোদ চন্দ্র দাসের বাড়ি একটি ডাকাতি হয় ও ৪০০ টাকা সংগৃহীত হয়। ড্যালির রির্পোটে লেখা হয়-- "The earliest ......was a dacoity at the changripota railway station committed on the 6th December 1907, and followed by dacoities at Sibpur on the 3rd April 1908".

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে কলকাতার বিপ্লবীদের একটি বিরাট দলকে গ্রেপ্তার ক'রে ৪ঠা মে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ আলিপুর বোমাব মামলা চালু করে। এই মামলায় সরকারী উকিল থাকেন মিঃ হিউম। কোথাও যাবার উপলক্ষে তিনি হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনের কামরায় উঠলে তাঁকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা চারটে নারকেল বোমা ছোঁড়েন, কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান। তাঁকে আরও কয়েকবার বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। ঐ মামলার অন্যতম সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আলিপুর ফৌজদারী আদালতে খুলনার চারুচন্দ্র বিশ্বাসের গুলীতে নিহত হন (১৭-২-১৯০৯)। ঐ বছর নভেম্বর মাসে বিপ্লবীদলের অন্যতম সদস্য হাওড়ার কেশবচন্দ্র দে'র আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করেন, এতে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি, কোনও মামলাও হয়নি। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌সপেকটর সামসুল আলম একটি ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী হাইকোর্টের সিঁড়ির উপরে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত সামসুল আলমকে হত্যা করেন। ১৯০৯

সালের ৫ই নভেম্বর ইংরেজ পুলিশ ললিতমোহন চক্রবর্তী নামে বিপ্লবী দলের এক সদস্যকে দার্জিলিং-এ গ্রেপ্তার করে। তিনি রাজসাক্ষী হন ও ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা হাকিম চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিভিন্ন ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী বত্রিশজন বিপ্লবীর নাম বলে দেন ও দলগুলির অস্তিত্ব ফাঁস করে দেন। যে দলগুলির নাম তিনি বলেন, সেগুলি হলো ঃ (১) শিবপুর দল (২) কুরচি দল (৩) খিদিরপুর দল (৪) চিংড়িপোতা দল (৫) মজিলপুর দল (৬) হলুদবাড়ী দল (৭) কৃষ্ণনগর দল (৮) নাটোর দল (৯) ঝাউগাছা দল (১০) যুগান্তর দল (১১) ছাত্রভাণ্ডার দল (১২) রাজসাহী দল (রামপুর বোয়ালিয়ার)।

এই মামলার ষড়যন্ত্রের স্থানরূপে চিহ্নিত করা হয় হাওড়ার শিবপুর এবং সন্নিহিত জায়গার ডাকাতির নায়ক রূপে চিহ্নিত করা হয় শিবপুরের ননীগোপাল সেনগুপ্তকে। এই মামলা সংগঠিত করার প্রধান উদ্যোক্তা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর সামসুল আলম-এর হত্যাকাণ্ডের পিছনে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বিরাট ভূমিকা ছিল। ললিতমোহন চক্রবর্তীর কাছ থেকে তথ্যাদি পাবার পরই সামসুল আলম ষড়যন্ত্র শুরু করার ব্যাপারে উৎসাহিত হন ও নিহত হন। তাঁর হত্যার তিন দিন পরেই ২৭শে জানুয়ারী ১৯১০ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী গ্রেপ্তার হন। মানিকতলা বোমার মামলার ফলে অরবিন্দ-বারীন্দ্র-উল্লাসকর প্রমুখ বিপ্লবীরা সরে যাবার পর বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী দলগুলিকে সংঘবদ্ধ করার ভার যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর উপর পড়েছিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বহুবিধ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের তিনিই ছিলেন নেতা।

এই সময় বিভিন্ন রকম বিপ্লবান্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে হাওড়া। এফ. সি. ড্যালির রিপোর্টে ১৯০৮-এর শেষ দিকে ই.বি.রেলে, রায়তায়, হলুদবাড়ীতে, মৌরেহল-এ ডাকাতি সম্বন্ধে বলা হয় ঃ "Among the persons who had confessed and retracted in this case was one Jotin Hazra of Kurchi in the Howrah District. This man subsequently gave a considerable amount of information to the police, which was the first clue obtained as to the existence of a formidable dacoity gang under the leadership of a man named Nani Gopal Sengupta of Shibpur in Howrah."_ বলা বাহুল্য যতীন হাজরাও রাজসাক্ষী হয়।

১৯১০ সালের ৯ই মার্চ কৃষ্ণনগরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ J.A. Ezechiel- এর কাছে শৈলেন্দ্রকুমার দাস যে স্বীকারোক্তি করেন তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে হাওড়ারও বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ থাকে। শৈলেন্দ্রকুমার দাস হলুদবাড়ি ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন.।

"He introduced me to Harendra Chandra Banerjee, an old member of his society.One morning Haren Banerjee took me to Botanical Gardens,

where I was again initiated by Nanigopal Gupta of Shibpur, the leader of the society."

"Haren asked me to go in a party for committing a dacoity somewhere on the Howrah-Amta Light Railway. He asked me to go to Telkal Ghat station, where Jogesh Chandra Mitter alias Madaru of Sibpur would be waiting for me :"

"We used to see Noni Babu in three places : (1) in the Botanical Gardens, (2) in a broken house beside the house of Bishnupada Chatterjee in Sibpur."

"The Following members of our society are known to me by name and sight : (1) Bhuban Chandra Mukherjee of Sibpur, (2) Bhutan, younger brother of (1), (6) Joges Chandra Mitter alias Madaru of sibpur, (7) Bishnupada Chatterjee of Sibpur, (8)Gyanaranjan Banerjee of Sibpur."

সরকার পক্ষের অভিযোগ অনুসারে এই মামলার অন্তর্ভুক্ত সময়কাল ধরা হয়েছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত। শিবপুর ডাকাতি মামলা থেকে আরম্ভ করে কলকাতা হুগলী বাঁকুড়া মেদিনীপুর যশোর প্রভৃতি নানাস্থানের সরকার বিরোধী কার্যকলাপকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এই ষড়যন্ত্র মামলায় 'সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' এবং এই 'ষড়যন্ত্রের স্থান হলো হাওড়ার শিবপুর' (ড্যালির গোপন নোটে বলা হয়েছিল "...including conspiracy to wage war against the king emperor. The Place of this conspiracy was said to be shibpur in Howrah District") এবং ললিত চক্রবর্তীর বিবৃতি অনুসারে প্রতিটি গ্রুপের অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলিকে এই মোকদ্দমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ঃ

চাংরিপোতা রেলওয়ে স্টেশন ডাকাতি (৬/১২/১৯০৭), শিবপুরের ডাকাতি ৩/৪/১৯০৮), বরা ডাকাতি (২/৬/১৯০৮), বিঘাতি ডাকাতি (১৬/৯/১৯০৮), প্রতাপ চকের ডাকাতি (১৪/১০/১৯০৮), রতিয়ার ডাকাতি (২৯/১১/১৯০৮), মোরহলের ডাকাতি (২/১২/১৯০৮), মুসাপুরের ডাকাতি (২৭/২/১৯০৯), নেত্রা ডাকাতি (২৩/৪/১৯০৯), মহারাজপুরের ডাকাতি(২৭/৭/১৯০৯), হলুদবাড়ি ডাকাতি (২৮/১০/১৯০৯)।

শিবপুরের ডাকাতির অভিযোগ ছিল নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে। ডাকাতি অনুষ্ঠানের ২/১দিন পরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে অব্যাহতি দেবার পরও 'হাওড়া গ্যাং কেসে' তাকে গ্রেপ্তার করে ঐ ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১(এ), ১২২ এবং ১২৩ ধারায় মামলাটি হাইকোর্টে সোপর্দ হয়। কিন্তু আইনগত কারণে পরে ১২৩ ধারাটি মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত আসামীরা হলেন ঃ (১) ননীগোপাল সেনগুপ্ত (২) বিষ্ণুপদ চ্যাটার্জী

(৩) নরেন্দ্রনাথ বসু (৪) নিবারণ চন্দ্র মজুমদার (৫) সুরেশচন্দ্র মজুমদার (৬) যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী (৭) পবিত্র কুমার দত্ত (৮) শরৎ চন্দ্র মিত্র (৯) শিবু হাজরা (১০) সুরেশ চন্দ্র মিত্র (১১) সতীশচন্দ্র মিত্র (১২) হরিপদ অধিকারী (১৩) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪) অন্নদা প্রসাদ রায় (১৫) বিমল চরণ দেব (১৬) কালীপদ চক্রবর্তী (১৭) পুলিন বিহারী সরকার (১৮) হরেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী (১৯) ভূতান মুখার্জী (২০) চারুচন্দ্র ঘোষ (২১) চুনিলাল নন্দী (২২) ভূষণ চন্দ্র মিত্র (২৩) রামপদ মুখার্জী (২৪) অতুল পাল (২৫) যোগেশ মিত্র (২৬) গণেশ দাস (২৭) মন্মথ বিশ্বাস (২৮) শ্রীশ চন্দ্র সরকার (২৯) শৈলেন দাস (৩০) রজনী ভট্টাচার্য (৩১) নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (৩২) বিধুভূষণ বিশ্বাস (৩৩) বিজয় চক্রবর্তী (৩৪) দাশরথি চ্যাটার্জী (৩৫)শৈলেন চ্যাটার্জী (৩৬) ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী (৩৭) কার্তিক দত্ত (৩৮) তারানাথ রায়চৌধুরী (৩৯) মন্মথ চৌধুরী (৪০) সুশীল কুমার বিশ্বাস (৪১) অতুল মুখার্জী (৪২) উপেন্দ্রনাথ দে (৪৩) ভুবন মুখার্জী (৪৪) কিরণ রায়। এছাড়াও ললিতমোহন চক্রবর্তী ও যতীন হাজরা—এই দুজনে রাজসাক্ষী হন। অভিযুক্তদের বিষয়ে ননীগোপাল সেনগুপ্ত সম্বন্ধে ড্যালির রিপোর্টে আছে—" Nani Gopal Sengupta was one of the most important and dangerous leaders of the Howrah gang and was implicated in the attempts to seduce the 10th Jats."

এই ষড়যন্ত্রের কাহিনীর মধ্যে ছিল যে দশম জাঠ রেজিমেন্টের সজ্জন সিং, চুনাই হাবিলদার ও রামগোপাল নামক তিনজন সেপাইকে বিপ্লবী দলের কর্মী নরেন চ্যাটার্জী, শরৎ মিত্র, ভূতান মুখার্জী ও ননীগোপাল সেনগুপ্ত নিজেদের দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। নরেন চ্যাটার্জী সজ্জন সিং ও রামগোপালকে হাওড়ার শিবপুরে ভূতান মুখার্জীর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। একবার সজ্জন সিংকে সে টাকাও দিয়েছিল। সজ্জনকে আরও দুবার টাকা দেওয়া হয়েছিল রাজসাক্ষী ললিত চক্রবর্তীর মাধ্যমে। ড্যালির গোপন তথ্যে ছিল ঃ "One of the charges against the accused in the Howrah case was tampering with the loyalty of the soldiers. Nikhileswar Roy Moulick had contact with the 10th Jat regiment posted in Fort William. The contact was first established by Naren Chatterjee, an absconding accused in the Howrah Case. As the soldiers were afraid to cross the Ganges to come to Howrah, the contact was maintained by Sarat Mitra Of kidderpore and the Chhatra Bhander group."

এই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীই ছিলেন প্রধান আসামী। তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীরাও সংঘবদ্ধ হন এবং বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

এই মোকদ্দমার বিশিষ্ট আসামী ননীগোপাল সেনগুপ্ত বিচারাধীন বন্দী থাকার সময় অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে পাগল হয়ে যান।

এই মোকদ্দমায় হাওড়ার যেসব বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ননীগোপাল সেনগুপ্ত, বিষ্টুপদ চ্যাটার্জী, পবিত্র কুমার দত্ত, কালীপদ চক্রবর্তী. হরেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, ভূতান মুখার্জী, যোগেশ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, অতুল মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ দে ও ভুবন মুখার্জী। এঁদের কেউ কেউ শিবপুরের এবং কেউ কেউ সাঁতরাগাছির অধিবাসী ছিলেন।

হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুনাল শৈলেন দাস, সুশীল বিশ্বাস, অতুল মুখার্জী, গণেশ দাস, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবকে ১২১(এ) ধারায় শাস্তি দেন। বাকি অভিযুক্তরা খালাস পান। যাঁরা দণ্ডপ্রাপ্ত তাঁরা অন্য মামলায় দণ্ডিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স আসামীদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন। রায়দানের তারিখটি হলো ১৯১১ সালের ১১ই এপ্রিল।

এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন পি. এল. রায়। আসামীদের পক্ষে ছিলেন জে. এল. রায়, বি. সি. চ্যাটার্জী, ই. পি. ঘোষ, নিশীথচন্দ্র সেন, শৈলেন্দ্র কুমার সেন।

সাহায্যকাবী গ্রন্থাদি ঃ

(১) আদালতের আঙিনায়—চিন্ময় চৌধুরী (পৃঃ ৩৭-৪৩ ও১৫৪-১৬২)।

(২) 'লোকমুখ' (১ম বর্ষ ২য় সংকলন)—প্রবন্ধ ঃ বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও হাওড়া জেলা-ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১০-১৩)।

(৩) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস—সুপ্রকাশ রায় (পৃঃ ১৭২-১৭৩,১৮১)।

(৪) বিপ্লবী বাংলা—তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী (পৃঃ ২০৬, ২৩০-২৩১,২৩৪)।

(৫) পাঁচশো বছরের হাওড়া--- হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৯৭-৯৮)।

(৬) বাংলার বিপ্লব সাধনা—পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ ৫৮)।

(৭) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম খন্ড)—গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য (পৃঃ ১৪১)।

(৮) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক সর্বতথ্য সারসংগ্রহ— জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (পৃ: ৬৫৬)।

(৯) ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় (পৃঃ ১০৩-১০৪)।

(১০) বিপ্লবী বাঙ্গালা বা স্বাধীনতার ইতিহাস-রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য (পৃ: ২৯৯)।

রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুট ও বিপ্লবী শ্রীশ মিত্র (হাবু) ঃ

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে হাওড়ার যে সব কর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন মূলতঃ তাঁদের নেতা ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। 'যুগান্তর' বা 'অনুশীলন সমিতি'র তেমন কোন শাখা এ জেলায় গড়ে ওঠেনি। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র কর্মকর্তারাই হাওড়া জেলার বিপ্লবী যুবকর্মীদের নেতৃত্ব দিতেন। এ জেলার কর্মীদের মধ্যে কোন চুলচেরা বিভাগ কখনও ছিল না। যে কোনও গ্রুপের কর্মীরাই প্রয়োজনে এ জেলার কর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। এটা 'আত্মোন্নতি সমিতি'র উদার নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছিল বলে আমার ধারণা।

'আত্মোন্নতি সমিতি'র উদ্ভব সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি লক্ষণীয় ঃ-

"১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (রাজা সুবোধ মল্লিক পার্ক) ছিল উদ্ভবের স্থান ; পরে ১৩-১ বহুবাজার (বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীটে উঠে যায়। একেবারে গোড়ার দিকে এর উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেবা শিক্ষা স্বাস্থ্যচর্চা ছিল প্রধান কার্যতালিকা ; আর ১৯০৫ সাল থেকে দস্তুরমত বিপ্লব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস চন্দ্র দেব, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খাঁটি বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।" [জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১ম খণ্ড)ঃ শ্রীকালীচরণ ঘোষ পৃঃ ১০৫]

হাওড়া জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা এইসব খাঁটি বিপ্লবীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সব নেতাদের সান্নিধ্যে এখানকার কর্মীরা এসেছেন তাতে তাঁদের মধ্যেকার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা দেখেই কর্মীরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন। নিঃশেষে সব কিছু ত্যাগ করতেও যে কর্মীরা দ্বিধা করেন নি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রডা কোম্পানীর কর্মচারী আমতার রসপুরের অধিবাসী শ্রীশ চন্দ্র মিত্র (হাবু মিত্র)।

শ্রীশ চন্দ্র মিত্র সম্পর্কে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'Freedom Struggle and Anushilan Samity' পুস্তকের ১১১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ

"One Srish Mitra was an employee in Messrs Rodda & Co. He, however, belonged to the revolutionary party and was a trusted disciple of Anukul Mukherjee, a leading figure of Atmonnati group. Sometime before 26 August 1914, Srish brought the information to his leaders that a consignment

of guns, pistols and ammunition sent for his company from a foreign country would reach the Customs office in Calcutta by 26th and it was likely that he would be entrusted with the task of transport of the said imported goods from the Custom House to the Company's Stores. Anukul Mukherjee, Haridas Dutta, Atul Krishna Ghosh, Narendra Nath Bhattacharyya and Srish Mitra made a plan whereby a part of the stock might be spirited away in course of transit In the actual operation Ashu Roy and Kalidas Bose also took part.

Srish was acutally entrusted with the task of obtaining clearance of the import and bringing the same to the Company's stores from the Custom House. According to plan Srish hired seven bullock carts for transport of the stock. Srish cleared 202 cases of arms and ammunition and loaded them in those carts, but ultimately only six carts reached the Company's warehouse at Vansittart Row, Calcutta, carrying 192 packages. The remaining 10 packages which had been, according to plan, loaded in the cart going last, did not reach the destination. Haridas Dutt officiated as the cartman of this last cart. He adopted a go-slow tactics so that the six other carts went ahead, and he diverted his cart through a lane unnoticed by others. The cart was taken to the house of Bhujangadhar Roychowdhury, where the goods were unloaded. The booty consisted of 50 mauser pistols and 46000 rounds of ammunition. The Sedition Committee has remarked that this arms theft "was an event of greatest importance in the development of revolutionary crime in Bengal". The pistols and ammunition had been distributed amongst different groups including Anushilanites and the later years mauser pistols were freely used in revolutionary actions."

কলকাতার রডা কোম্পানী বন্দুক ব্যবসাতে ছিল বিখ্যাত। ভ্যান্সিটার্ট রো-তে ছিল তাঁদের অফিস। তাঁরা বিদেশ থেকে সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র যেমন আমদানী করতেন, তেমনই জার্মানী থেকে মসার পিস্তল (Mauser pistol)-ও আমদানী করতেন। বড়লোক ও রাজারাজড়াদের কাছে বিক্রী করে তাঁরা প্রচুর মুনাফা লুটতেন। জার্মানীর তৈরি মসার অতি শক্তিশালী পিস্তল। সুন্দর কারুকার্য করা একটি যন্ত্র, কিন্তু এর বিধ্বংসী ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণতঃ ৪৫০ বোর-এর রিভলবারের ট্রিগার টানতে হাতের কব্জির বেশ জোরের দরকার হয়। কিন্তু এ পিস্তলের ট্রিগার সহজেই টানা যায়। এর গঠনটিও এত ভাল যে নানাভাবে একে ব্যবহার করা যায়। যেমন, একটা কাঠের ফ্রেমে ঢুকিয়ে কোমরে বেঁধে চলা যায়, দরকার মত সেই ফ্রেম সরিয়ে পিস্তলের বাটে লাগিয়ে রাইফেল বা বন্দুকের মত কাঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। ব্রিটিশ শক্তিকে এদেশ থেকে উৎখাত কবার মারণ-যজ্ঞে এমন আকর্ষণীয় পিস্তল ব্যবহার করার আকাঙ্ক্ষা এদেশের বিপ্লবীদের দীর্ঘদিনের। শ্রীশ মিত্র বিপ্লবীদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে দিয়েছিলেন।

রডা কোম্পানীর সহকারী গুদাম সরকারের চাকরী পেয়েছিলেন শ্রীশ চন্দ্র মিত্র। তাঁর ডাক নাম ছিল হাবু মিত্তির। আত্মোন্নতি সমিতির বিপিন গাঙ্গুলী, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল। অনুকূলবাবু বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহ করে দিতেন। অন্য জায়গা থেকে অস্ত্র পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ায় এই অসুবিধার কথা অনুকূলবাবু শ্রীশ মিত্রকে (হাবু বাবুকে) বলেন। নেপাল সরকার রডা কোম্পানীর মারফৎ পঞ্চাশখানা মসার পিস্তল ও পাঁচ বাক্স কার্তুজ আনাবার অর্ডার দিয়েছিল। কোম্পানীর কাছে খবর এলো যে, অন্যান্য মালের সঙ্গে ঐ অর্ডারের মালগুলিও আসছে। আগে থেকেই এই অর্ডার দেবার সংবাদ শ্রীশ মিত্র (হাবুবাবু) মারফৎ বিপ্লবীরা শুনেছিলেন। তখন থেকেই তাঁরা আশার আলো দেখছিলেন। কোম্পানীর কাছে মসার পিস্তল আসার খবরটি পাওয়া মাত্রই হাবুবাবু সংবাদটি অনুকূলবাবুকে জানিয়ে দিলেন। খবর পৌঁছানোর দিনই কলকাতার ছাতাওয়ালা গলিতে শ্রীশ মিত্র (হাবু), আশু রায়, হরিদাস দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [ইনিই পরবর্তীকালে মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম, এন, রায়) নামে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছিলেন।] প্রমুখ কর্মীবৃন্দ একটি গোপন সভায় মিলিত হলেন। এ কাজটা সম্ভব হবে কিনা এবিষয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সন্দেহ প্রকাশ করেন। হাবু বাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এ কাজ করা সম্ভব। কাষ্টমস্ অফিস থেকে রডা কোম্পানীতে মাল যাবে—এ আর কতটুকু দূরত্ব! ডালহৌসি স্কোয়ারের এ মাথা থেকে ও মাথা। কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্ব। গরুর গাড়ীতে মাল আসবে। বিপ্লবীদের সাজানো গাড়ীর গাড়োয়ান হবার দায়িত্ব নেন হরিদাস দত্ত। গাড়ী চালাবার কৌশল তাঁকে আয়ত্ত করে নিতে হয় এই সময়টুকুর মধ্যে। তাঁকে চুল কাটিয়ে পুরোপুরি গাড়োয়ান সাজাবার দায়িত্ব নেন প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা। (হিম্মৎসিংকাজী পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা হিসাবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।)

কাস্টমস্ হাউসে মাল পৌঁছে গেল। মাল খালাস করবার জন্য সহকারী গুদাম সরকার শ্রীশ মিত্র (হাবুবাবু) সাতখানা গরুর গাড়ী নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন। তারিখটা ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট। দুপুর বেলা। গরুর গাড়ীগুলির মধ্যে বিপ্লবী হরিদাস দত্তও গাড়োয়ান বেশে একটি গাড়ীকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। সাজ পোষাকে তাঁকে গাড়োয়ান ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না। হাঁকডাক করে তাঁর গাড়িতেই শ্রীশ মিত্র (হাবুবাবু) মসার পিস্তলের পেটি আর পাঁচটা বড় বড় বাক্স বোঝাই কার্তুজ, মসার পিস্তলের স্প্রিং, খাপ ইত্যাদি তুলে দিলেন। এই মাল তুলে দেবার পিছনে সমস্ত বুদ্ধি কৌশল ছিল হাবু বাবুর।

মালবোঝাই সাতখানা গাড়ীই রডা কোম্পানীর দিকে রওনা দিল। সর্ব পশ্চাতের গাড়ীখানার চালক বিপ্লবী হরিদাস দত্ত। ভ্যান্সিটার্ট রো'র মুখে এসে ছ খানা গাড়ীই হাবু বাবুর সঙ্গে রডা কোম্পানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল; আর হাবু বাবুরই ইঙ্গিতে হরিদাস দত্ত সোজা পূর্বদিকে গাড়ী চালিয়ে দিলেন। তাঁর গাড়ীর দুপাশে বিপ্লবী দলের শ্রীশ পাল ও খগেন দাস সশস্ত্র রক্ষীরূপে এগিয়ে চললেন। গাড়ী বর্তমান মিশন রো হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট পেরিয়ে চাঁদনীচক-এর পাশ দিয়ে মলঙ্গা লেন-এ অনুকূলবাবুর আস্তানায় গিয়ে হাজির হল।

অনুকূলবাবু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ-ধর রায় চৌধুরী প্রমুখ কর্মীদের সহায়তায় মালগুলি অন্যান্য স্থানে সরিয়ে দিলেন। কালিদাস বসু ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান সেজে হবিদাস দত্তের সহায়তায় গাড়ী চালিয়ে মালগুলি প্রথম ভুজঙ্গ -ধর রায় চৌধুরীর বাড়ি নিয়ে আসেন।

কলকাতার ২নং ছিদাম মুদি লেন-এ অতুল কৃষ্ণ ঘোষের বাসায় বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও থাকতেন। শ্রীশ মিত্র (হাবু) অতুলবাবুকে সংবাদ দেন যে, নির্জনস্থানে অস্ত্রগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে। ঐ দিন রাত্রে অতুলবাবু ও নরেনবাবু অস্ত্রগুলির একাংশ ছিদাম মুদি লেন-এ নিয়ে আসেন। কিন্তু সেখানে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ওঁদের বাড়ীর পুরোহিত হরি ভট্টাচার্যের বাড়ী অস্ত্রগুলি নিয়ে যান। হরি ভট্টাচার্য সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরীর পেনেটির বাগানবাড়ীতে অবস্থিত দেবালয়ে পূজা করতে যেতেন। তিনি বিপ্লবীদের ওখানেই অস্ত্রগুলি রেখে আসার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শমত প্যাকিংগুলি খুলে অস্ত্রগুলি থলেয় ভরে ওঁরা পেনেটির বাগানবাড়ীর উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি যোগে যাত্রা করেন। বাগানবাড়ীর আধ মাইল দূরে ট্যাক্সি থামানো হয়। সাইকেলে করে থলেগুলি বাগানের দেবালয়ে নিয়ে আসা হয়। তখন রাত্রি প্রায় শেষ। ঐ শেষ রাত্রেই নরেন্দ্র ভট্টাচার্য অন্যত্র যান। অতুলবাবু কয়েকজনের সহায়তায় কাঠের বাক্সগুলি পুড়িয়ে ফেলেন।

এদিকে রডা কোম্পানীর অফিসে হাঁক-ডাক করে ছ'খানি গরুর গাড়ীর মাল তোলাবার ব্যবস্থা করেই শ্রীশ মিত্র (হাবু) সরে পড়লেন। ষষ্ঠ গাড়ীর মাল খালাসের পরেই সপ্তম গাড়ীর খোঁজ পড়ল। এই সময় খোঁজ পড়ল হাবু বাবুরও। কিছুক্ষণ আশেপাশে অফিসের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় গরুর গাড়ীর তল্লাস করা হল, অফিসের এঘর-ওঘর হাবু বাবুর খোঁজ করা হল—কিন্তু গাড়ীও নেই, হাবু মিত্রও নেই। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর গেল—পুলিশও ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। রাস্তায় যত গরুর গাড়ী দেখল, জমা করতে লাগল। চলল গাড়োয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদ—বল কে ভাড়া গিয়েছিলি? আজ কোথায় কোথায় ভাড়া গিয়েছিলি? —আঁতিপাতি অনুসন্ধান। কিন্তু হায়, সে

গাড়ী, সেই গাড়োয়ান আর সেই হাবু মিত্র—কারোর পাত্তা নেই। বিকেল থেকে সারা রাতের অনুসন্ধানেও কোন হদিশ পুলিশ পেল না।

সেদিন রাত্রেই হাবু মিত্র (শ্রীশ মিত্র)-কে নিয়ে বিপ্লবী কর্মী শ্রীশ পাল দার্জিলিং মেলে রংপুর পাড়ি দিলেন। রংপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরীতে ছিল 'মুক্তি-সংঘ'-এর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক নেতা ছিলেন ডাঃ সুরেন বর্ধন। 'মুক্তি-সংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ। রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে হেমচন্দ্র ঘোষও জড়িত ছিলেন। তাই তিনি আগেই ডাঃ সুরেন বর্ধনকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রয়োজনে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অনুযায়ীই শ্রীশ পাল, শ্রীশ মিত্র (হাবু)-কে নিয়ে তাঁর আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে পরের গাড়ীতেই কলকাতা চলে এলেন।

ডাঃ সুরেন বর্ধনের বন্দোবস্ত করা নানা আশ্রয়েই শ্রীশ মিত্র (হাবু) আত্মগোপন করে রইলেন। চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ বর্ধনের নামডাক ছিল, থানার অফিসাররাও তাঁকে সমীহ করতেন। একদিন এক অফিসার তাঁকে এসে জানিয়ে গেলেন যে, আই.বি. অফিসাররা আসছেন, হয়ত তাঁর বাড়ী সার্চ হতে পারে। ইতোমধ্যে হরিদাস দত্ত কলকাতার বাঁশতলা লেন-এ ধরা পড়েন। পুলিশ সেখানে বিশ হাজার টোটা পায়। এর সবগুলিই ছিল রডা কোম্পানীর। এই ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী কর্মী শ্রীশ পাল রংপুরে ডাঃ বর্ধনকে জানিয়ে দেন-- যেন তিনি অবিলম্বে শ্রীশ মিত্র (হাবু)-কে আসামে পাঠিয়ে দেন। সংবাদ পৌঁছানো মাত্রই ডাঃ বর্ধন শ্রীশ মিত্র (হাবু)-কে পার্বত্যজাতি 'রাভা'দের আস্তানায় পাঠিয়ে দেন। রাভাদের মধ্যে ডাঃ বর্ধনের যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল। কয়েকজন তরুণ 'রাভা' ছিলেন তাঁর গোপন সংস্থার কর্মী।

পুলিশ বীরভূমের ঝাউপাড়ায় দুকড়িবালা দেবীর বাড়ী থেকে সাতটি মসার পিস্তল ও এগার হাজার গুলি পায়। শালকিয়ার যুগল কিশোর দত্তের কাছ থেকে একটি মসার পিস্তল পায়। অস্ত্র লুটের ঘটনার পর আর কোনদিন শ্রীশ মিত্র (হাবু) চাকরীক্ষেত্রে যোগ তো দেনই নি, তিনি সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গেলেন। শোনা যায়, তিনি নেশা-ভাং করতেন, বলতেন হিমালয়ে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যেই আসামের জঙ্গলের দিকে যান আর ফিরে আসেন নি। ডাঃ সুরেন বর্ধন ২১-১১-৬৫ তারিখের পত্রে ভূপেন রক্ষিত রায়কে জানিয়েছেন, যে-রাভা যুবকের দায়িত্বে হাবুবাবু ছিলেন, সেই যুবকও নিখোঁজ। অজ্ঞাত ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দেবার চেষ্টায় তাঁদের শেষ পরিণতি ঘটেছে বলে তাঁর ধারণা।

ব্যক্তি জীবনে হাবুবাবু খুবই রসিক লোক ছিলেন। গায়ে তাঁর পালোয়ানের শক্তি ছিল। তাঁর রসিকতার একটি নমুনা ঃ-

অস্ত্র লুটের আগে বউবাজারের মলঙ্গা লেনে বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জীর বাড়িতে একদিন তিনি এসেছেন, অনুকূলবাবুর বাড়ীর সামনেই ছিল মাঠ। সেখানে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোষের গাড়ীর জমজমাট ভীড় সবসময় প্রায় লেগেই থাকত। নানা ভাষাভাষীর গাড়োয়ান ও কুলীরা ঘোরাফেরা করত, আড্ডা দিত। অনুকূলবাবু বাইরে বসে শ্রীশ মিত্র (হাবু)-র সঙ্গে গল্প করছেন, হাবুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সেই সময় খুব কাছেই থাকা একটা ঘোড়া ঘড়র্ ঘড়র্ আওয়াজ করছিল। একটুক্ষণ ঘোড়াটার ঐরকম আওয়াজ শুনেই হাবুবাবু ঘোড়াটার থুতনীতে টেনে এক ঘুঁসি মেরে দিলেন-- 'গুরুদেবের সামনে ভড়র্ ভড়র্!' ঘোড়া ঘুঁসি খেয়ে চুপ করে গেল। এই ব্যাপারটা দেখে সমবেত সকলের সেদিন কি হাসি!

রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুট পরবর্তী বিপ্লবান্দোলনকে অসামান্য সহায়তা দান করেছিল। সেই অস্ত্র নানাস্থানে ব্যবহৃত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে নিদারুণ বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কিত রির্পোটে বলা হয়েছে ঃ "৫০ টা মসার পিস্তল বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে প্রায় অচল করে তুলেছিল।" সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"The authorities have reliable information to show that 44 of these pistols were almost at once distributed to 9 different revolutionary groups in Bengal and it is certain that the pistols so distributed were used in 54 cases of dacoity and murder subsequent to August 1914. It may indeed safely be said that few, if any.revolutinary outrages have taken place in Bengal since August 1914 in which Mauser Pistols stolen from Rodda & Co. have not been used". [Sedition Committee Report- p.-66.]

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্টের পর অনুষ্ঠিত ৫৪টি ডাকাতি ও নরহত্যায় অথবা ডাকাতি বা নরহত্যার চেষ্টায় এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল।

হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামে শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু মিত্রের পৈতৃক বসতি। এই গ্রামের জল-হাওয়ায় তাঁর বাল্য কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রডা এণ্ড কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যৌবনেই দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে সহায়তা করার উদগ্র বাসনায় নিজের চাকরী ছাড়লেন, জীবনের সব সুখ পরিত্যাগ করলেন, আত্মীয়-স্বজনহীন দূর প্রবাসে নাম-যশ-নেতৃত্বের কোন আকাঙক্ষা না রেখে অকাতরে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেন। দেশের স্বাধীনতালাভের প্রায় একদশক পরে তাঁর পৈতৃক ভূমির উপর তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় স্বগ্রামবাসীগণ একটি বেদী নির্মাণ করে দেন। এতে বিশেষ ভূমিকা নেন তারাপদ প্রামাণিক মহাশয়। কয়েকবছর পর 'রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরী'র পরিচালন সমিতি

দামোদর বাঁধের পাশে এই স্বার্থলেশহীন আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকের স্মরণবেদী নির্মাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু কোন বেদীতেই আজও তাঁর জন্মতারিখ উল্লেখ করা যায়নি। এই মহান দেশপ্রেমিকের জীবনের অজানা তথ্য জানা ও প্রকাশ করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়েই তাঁর যথার্থ স্মৃতিচারণ করতে হবে। এ বিষয়ে তরুণ গবেষকরা এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে এই মহান বিপ্লবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তথ্যসূত্র ঃ-বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনী কিশোর গুহ (পৃঃ ২৭৬, ২৭৭); ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব—ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় (পৃঃ ১৩১-১৩৮); ভারতে বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস — সুপ্রকাশ রায় (পৃঃ ১৯৬); বাংলার বিপ্লব সাধনা—পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ ৭৬-৮০); বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী (দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বিখ্যাত আসামী) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

বালেশ্বরের পথে পঞ্চবীর ঃ

'হাওড়া গ্যাং কেস' নানারকম দলে-বিভক্ত বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করল। বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, মাদারিপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, উত্তরবঙ্গের যতীন রায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে সমবেত হলেন। দামোদরের বন্যায় আর্তত্রাণ করতে গিয়ে যাদুগোপাল মুখার্জী এবং হরিকুমার চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় অতি সহজেই বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন হলো। এই সময় যুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠায় শিখ 'গদর' দল ও বাঙালী বিপ্লবীরা জার্মানদের সাহায্য নেবার জন্য চেষ্টিত হয়ে উঠলেন। বাঙালী বিপ্লবীরা বাটাভিয়া থেকে এবং 'গদর' বিপ্লবীরা ব্যাংকক থেকে জার্মানদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সংযোগ স্থাপিত হলো। সাংহাইয়ের জার্মান কনসাল দু'খানা জাহাজে অস্ত্র পাঠালেন। কথা ছিল, একখানা জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে এবং অন্যখানা উড়িষ্যার বালেশ্বরে আসবে। অস্ত্রগ্রহণের জন্য হ্যারি এণ্ড সন্স বালেশ্বরে "ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' খুলেছে। পুলিশ কিছু টের পাবার আগেই জার্মান এজেন্ট 'হ্যারি এণ্ড সন্স' মারফৎ ৪৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের খরচের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'মেভারিক' নামক জাহাজ আসার কথা বালেশ্বরে। তাতে ৩০ হাজার রাইফেল, ৪০০ বার আওয়াজ করার মত উপকরণ এবং দু লক্ষ টাকা আসবে। *

* বিপ্লবী বাঙ্গালা বা স্বাধীনতার ইতিহাস - রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য (পৃঃ ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪)।

বাগনানে প্রথমবার ঃ

ইতোমধ্যে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীকে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী যখন মসার পিস্তল ও কার্তুজ ভাগ বাটোয়ারা করছিলেন, তখন নীরদ হালদার নামে এক গোয়েন্দা সেখানে যেতেই চিত্তপ্রিয় তাকে গুলি করেন। সে তৎক্ষণাৎ মরে না। হাসপাতালে মরণকালীন বিবৃতিতে বাঘাযতীনকে হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত করে। পুলিশ ইন্সপেকটর সুরেশ মুখার্জী যতীন্দ্রনাথকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। চিত্তপ্রিয় তাকে ও কলেজ স্ট্রীটে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেন। ** এই সময় চিত্তপ্রিয় ও বাঘাযতীনকে আশ্রয় দেন হাওড়ার বাগনান স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুলচন্দ্র সেন মশাই। তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে চিত্তপ্রিয় ও বাঘা যতীন কিছুদিন বাস করেন।

অকুতোভয় প্রধান শিক্ষক ঃ

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাগনানের অন্যতম অগ্রণী সৈনিক চণ্ডীদাস ঘোষ মহাশয় সংকলিত 'অগ্নিযুগের বাগনান' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আরও অনেক বিবরণ ও তথ্য পাওয়া যাবে, তা থেকে অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু বিবরণ উল্লেখ করে দিলাম।

'যুগান্তর' পার্টিই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনা মত অতুল সেন মশাইকে বাগনান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে পাঠান। (পৃঃ ২) নিজেকে সরকারী রোষবহ্নি থেকে আড়াল করার প্রয়োজন সর্বদাই থেকে যাওয়ায় তিনি বাগনানের মিশনারী ডাক্তার এক মেমসাহেবের সঙ্গে খুবই আলাপ জমিয়ে ফেলেন। তাঁর কাছে অনেক সাহেব আসতেন। অতুলবাবু তাঁদের সঙ্গেও আলাপ করতেন। 'থানার দারোগা বাবু অতুলবাবুর সঙ্গে খাতির জমান আরও এইজন্য যখন দেখেন, কত সাহেব মেমসাহেব ওঁর বন্ধু'। (পৃঃ ৩)

গ্রামে গ্রামে সেবা করার কাজে মিশনারী মেমসাহেবের সঙ্গে অতুলবাবুও যেতেন। স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে তিনি কলেরার সেবা কাজেও যোগ দেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। (পৃঃ ৩-৪) মেমসাহেবের সহায়তায় একটি বন্দুকের লাইসেন্স পান। বন্দুক কিনে নিয়েই কলকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়' -এর অফিসে যান। (পৃঃ ৪) গ্রামে ফিরে রূপনারায়ণের তীরে বন্দুক ছোড়া শেখা আরম্ভ হয়। (পৃঃ ৫) প্রথমে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন তিনজন ছাত্র--প্রভাত ভট্টাচার্য, চন্দ্রকান্ত সামুই ও সনৎ চক্রবর্তী। পরে সতীশ চন্দ্র সিংহ, ফেলুরাম চক্রবর্তী, ভূধর বিশ্বাস, লক্ষণচন্দ্র রায়, হরেকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি ছাত্রগণ যোগ দেন। অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা ও তা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়। তখন

** ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় (পৃঃ ১৭৯)।

চারিদিকে স্বদেশী ডাকাতির হিড়িক। হরেকৃষ্ণ দাসকে বাউল সাজিয়ে সাতদিন কমল-পুর যাবার রাস্তার এক মোড়ে বসিয়ে রাখা হয়। তিনি দিনের বেলায় গান গাইতেন, ভিক্ষে করতেন, গাছের তলায় এসে চাল ফুটিয়ে রান্না করে খেতেন। রাত্রে উপবাসে কাটাতেন। সবাই তাঁকে সাধু ফকির বলে ধরে নেন (পৃঃ ৫)। নির্দিষ্ট রাতে ডিহিমণ্ডলঘাটে এক জমিদার বাড়িতে ডাকাতি হোল। ভোরে হরেকৃষ্ণ সাধুর থলিতে ডাকতেরা একটি টাকার তোড়া দিয়ে চলে গেল, বিপ্লবী কর্মীরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠলেন। হরেকৃষ্ণ উধাও হয়ে গেলেন। এই সময়ে বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মেটেবুরুজের কেল্লায় মেরামতির কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, কেল্লার সব খবর জানা। তিনি কয়েকটি ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠাবার জন্য খবর দিলেন। কয়েকজন ছেলে গেল, কয়েকদিন তারা কুলী সেজে মাটি কাটা, ইট বওয়ার কাজ করলো। কিছুদিন পরে তাদের কাজেরও শেষ হোল - কিন্তু সেই কেল্লা থেকে কোনও অস্ত্রাদি সরানো হয়েছিল কি-না বা সেই কেল্লার ভিতরের অস্ত্রাদির কোনও খবর পাওয়া গিয়েছিল কি-না তার কিছুই তারা জানতে পারলো না। (পৃ:৭)

পুলিশকে ধোঁকা ঃ

'যুগান্তর' দল ইতোমধ্যে বাগনানে 'শ্রমজীবী' সম্প্রদায়ের একটি কাপড়ের দোকান খোলেন। দলের কর্মী ভুবনচন্দ্র সামুই সেই দোকান চালানোর ভার নেন। কাপড়ের দোকানে মিলিত হয়ে বিপ্লবীরা কাজের সলা পরামর্শ চালাতে থাকেন। রডা কোম্পানীর অস্ত্রলুঠের মসার পিস্তল অতুল সেন, প্রভাত ভট্টাচার্য, চন্দ্রকান্ত সামুই ও সনৎ চক্রবর্তীর কাছে একটি করে থাকতো। (পৃঃ ৮-৯)

কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশের নজর পড়লো। স্কুল বাড়ী সার্চ করতে এলেন সি. আই.ডি অফিসার। অতুলবাবু চুটিয়ে গল্প জুড়লেন। ছেলেরা জল আনবার নাম করে জালার মধ্যে রাখা কার্তুজ সরিয়ে নিয়ে গেল। ঘরের মাঝে রাখা ছইয়ের পার্টিশান সরাবার নামে দুটো পার্টিশানের মাঝে সোর্ড (Sword), ছোরা, রাইফেল প্রভৃতি অস্ত্রাদি দুলে পাড়ায় সরিয়ে নিয়ে গেল। স্কুলের ঘর সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেলনা। (পৃঃ ১১)। এর কয়েকদিন পর বাঘা যতীনকে আশ্রয় দেবার প্রশ্ন এলো। যুগান্তর দল তাঁকে বাগনানে আশ্রয় দেবেন বলে স্থির করেন। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা চলতে থাকে।

পঞ্চবীরের আগমন ঃ

একদিন রাতে হাওড়া ষ্টেশন থেকে আসা একটি নির্দিষ্ট ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে উনসানি (বর্তমান মৌড়ী গ্রাম) স্টেশনে বিশেষ কায়দায় একটি টর্চের আলো বাইরে পড়লো। ট্রেনের কামরায় বসেছিলেন পূর্বে উল্লিখিত সনৎ চক্রবর্তী। বাঘা

যতীন ও তাঁর চারজন সহকর্মী - পূর্ব থেকেই ঐ স্টেশনে অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা আলোর সংকেত পেয়ে ঐ কামরায় উঠে পড়লেন। এই চারজন সহকর্মী হলেন বালেশ্বর সংগ্রামের বীরযোদ্ধা চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ। (পৃঃ ১২)

মাঝপথে মহিষরেখা পুলের কাছে ওঁরা নেমে পড়েন। ঐটাই নামার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ওখান থেকে প্রভাত ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে একদল যুবক সাইকেলে করে ওঁদের বাগনান হাইস্কুলে নিয়ে আসেন। (পৃঃ-১৩) এখানে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকার পর উড়িষ্যার পথে যাবার প্রয়োজন এসে গেল। উড়িষ্যায় যেতে গেলে একটা ছদ্মাবরণ দরকার। বাগনান স্কুলের হেডপন্ডিত মশাই বিপ্লবী শ্যামবাবু বুদ্ধি দিলেন-- দাদাকে বর সাজিয়ে নাও, আমি পুরোহিত, ছেলেরা বরযাত্রী ও পাল্কীর বেয়ারা।

ছদ্মবেশে ঃ

'একদিন সন্ধ্যার মুখে সকলেই দেখেন বর পাল্কীতে বসে বিয়ে করতে যাচ্ছে। অনেক বরযাত্রী। বীরকুলের পথে মাঠে এসে নির্জনে পোষাক পাল্টে নেন। সতীশের মাসির বাড়িতে লাউ চিংড়ি খেয়ে ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলল। সতীশ ধন্য, সতীশ বাঘা যতীনকে কাঁধে নিয়ে চলল, রূপনারায়ণ নদের চরের কাদা পেরিয়ে নৌকা পর্যন্ত। নৌকা নিয়ে আমতলা বোর্ডিং-এর ছাত্ররা প্রস্তুত ছিল। দাদাকে তুলে দিল, প্রণাম করল সবাই। বাগনানের ছাত্রেরা বলল, দাদা আমাদের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়েছিল। আমরাও তা নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি।' (পৃঃ ১৫)

তারপর বুড়ী বালামের তীরের ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের মহানায়ক যতীন মুখার্জী। মনে রাখা দরকার, ঋষি অরবিন্দ (তৎকালীন অরবিন্দ ঘোষ)-এর সহকর্মী বিপ্লবীরা, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ শহীদবৃন্দ, রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীরা, বাঘাযতীন ও তাঁর সহকারী শহীদবৃন্দ —এঁরা সকলেই গান্ধীজীর পূর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু আজ সরকারী মসনদে সমাসীন কারো কারোর মুখ থেকে শোনা যায় — স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হবে তখন থেকেই যখন থেকে গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বভার নিয়েছেন। ইতিহাস লেখার এই যদি নিরিখ হয়, তবে সে ইতিহাস বিকৃত ইতিহাস হতে বাধ্য।

গ্রেপ্তার ও নির্যাতন ঃ

বাগনান স্কুলের বিপ্লবী ছেলেদের পুলিশের রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহে গ্রামোন্নয়নে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অতুলবাবু গ্রেপ্তার হয়ে যান। 'রবীন্দ্রনাথ অতুলবাবুর স্ত্রীকে সমবেদনা জানিয়ে পত্র দেন'। (পৃঃ ১৭) তারপর একে একে ছেলেরা চলে আসতে থাকে। ভৈরব বাজারে এক ডাকাতিতে

সতীশচন্দ্র সিংহ জড়িত হন, পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ হয়। পরে গ্রেপ্তার হন। চন্দ্রকান্ত সামুই-এর বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে একটি মসার পিস্তল পায়। তার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। প্রভাত ভট্টাচার্যের বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ কিছুই পায়না। কারণ, চন্দ্রকান্তের বাড়ি সার্চ করে এবাড়িতে পুলিশ আসার আগেই প্রভাত ভট্টাচার্যের বন্ধু সুপ্রকাশ পাল দৌড়ে এসে পিস্তল ও তরবারি নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসে। হরেকেষ্টর বাড়ি থেকে একখানি তরবারি পায়। এদের ক'জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। (পৃ:১৭-১৮) বিপ্লবী বাঘা যতীন বালেশ্বরে যুদ্ধ করে (৯/৯/১৯১৫) তাকে মহাতীর্থে পরিণত করেছেন। সেই তীর্থে যাবার পূর্বে বাগনানে কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী পঞ্চবীর বাগনানকে ধন্য করেছেন, ধন্য হয়েছি আমরা হাওড়া জেলার অধিবাসীরা। যিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেই অকুতোভয় প্রধান শিক্ষক অতুল সেন, তাঁর সহকর্মী বিপ্লবী শিক্ষকবৃন্দ ও সাহায্যকারী বিপ্লবী ছাত্রবৃন্দের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারতের প্রথম 'স্টেট প্রিজনার'
ননীবালা দেবী (১৮৮৮-১৯৬৭)

ভারতের মধ্যে প্রথম মহিলা রাজ্য রাজনৈতিক বন্দী (State Prisoner) হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন হাওড়া জেলারই এক বিধবা মহিলা, নাম ননীবালা দেবী। ১৮৮৮ সালে হাওড়া জেলার বালিতে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম সূর্যকান্ত ব্যানার্জী, মায়ের নাম গিরিবালা দেবী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু ষোল বছর বয়সেই তিনি বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। আড়িয়াদহের খ্রীস্টান মিশনে পড়াশুনা করার সুযোগ আসে, সেখানে ভর্তি হন, কিন্তু বেশিদূর পড়াশুনায় অগ্রসর হতে পারেন না।

হুগলী উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'যুগান্তর দলের' বিশিষ্ট নেতা। তিনি ছিলেন ননীবালা দেবীর দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ননীবালা দেবীকে বিপ্লবের দীক্ষা দিলেন এবং আত্মগোপনকারী বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্য করার দায়িত্ব দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের সেজ পিসীমা, 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলেও 'সেজ পিসিমা' নামে পরিচিতা হলেন। রিষড়ায় তিনি তাঁর কাছে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে লাগলেন।

রডা কোম্পানীর মসার পিস্তল লুটের পর (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) -এর পরামর্শ ও নেতৃত্বে 'যুগান্তর দলের' নেতারা কলকাতায় দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। একটি হলো 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে

একটি কাপড়ের দোকান, আর একটি 'হ্যারি এণ্ড সন্স' নামে বিবিধ পণ্য সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। 'শ্রমজীবী সমবায়' পরিচালনা করতেন রামচন্দ্র মজুমদার, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আর 'হ্যারি এণ্ড সন্স' পরিচালনা করতেন হরিকুমার চক্রবর্তী। দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র গোপন স্থানে রাখা ও ওইখান থেকেই গোপনে কর্মীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

[রামচন্দ্র মজুমদার যে কত সতর্ক ও বিশ্বাসী ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত ঃ ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্ধে একদিন পূর্বাহ্নে শ্রী অরবিন্দ যখন তাঁর 'কর্মযোগিন পত্রিকা' অফিসে কর্মরত ছিলেন তখন রামচন্দ্র মজুমদার তাঁকে গিয়ে বলেন যে, 'কর্মযোগিন'-এ লিখিত কোন প্রবন্ধের জন্য শ্রী অরবিন্দের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। অরবিন্দ সেইদিনই চন্দননগরে যান, মতিলাল রায়ের আশ্রয়ে থাকেন ও পরে ফরাসী অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরীতে চলে যান। অন্যথায় তাঁকে পুলিশী নির্যাতন ভোগ করতে হতো।]

যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা তখন জার্মানীর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারত জুড়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবার প্রচেষ্টায় রত। ইংরেজ রাজশক্তি এই ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পারল। বালেশ্বরে 'বাঘা যতীন'-এর নেতৃত্বে খণ্ডযুদ্ধ তার নিদর্শন (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর।)

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ননীবালা দেবীও যুক্ত হয়ে পড়েন। চন্দননগরের বিপ্লবী কর্মীদের আস্তানায় সধবা সেজে আশেপাশের লোকজন ও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে চলছিলেন। একটি ঘরে গৃহকর্ত্রী হয়ে তিনি ভাড়া থাকতেন। সেখানে বিপ্লবী নেতারা পলাতক হয়ে ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যাদুগোপাল মুখার্জী, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, অতুল ঘোষ প্রমুখ নেতারা-- যাঁদের প্রত্যেকেরই মাথার দাম ছিল বেশ কয়েক হাজার ক'রে টাকা।

ইতোমধ্যে 'শ্রমজীবী সমবায়ে'র পরিচালক রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হয়ে যান। পুলিশ তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রাদি কিছু পায় না। কিন্তু তাঁর কাছে যে মসার (Mauser) পিস্তল ছিল,সেটি তিনি কোথায় রেখেছেন তা-ও দলেব কাউকে জানিয়ে যেতে পারেন নি। এমতাবস্থায় ননীবালা দেবীর উপর দলের দায়িত্ব পড়লো রামচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে অস্ত্রের সন্ধান জেনে আসার। রামচন্দ্র মজুমদার তখন প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে ইন্টারভিউর অছিলায় জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। এই দুরূহ কাজ অবলীলাক্রমেই সেরে এলেন ননীবালা।

কিন্তু কিছুদিন পরেই পুলিশ ননীবালা দেবীর বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকার কথা জানতে পারে। তাঁর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ফলে, তাঁকেও পলাতক হতে হলো। বিপ্লবীকর্মীরা তাঁকে বাংলা দেশের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ননীবালা প্রথমে কাশী যান এবং কাশী থেকে পেশোয়ার যাবেন ঠিক হয়। সঙ্গে থাকেন তাঁর এক বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র, তিনি কর্মোপলক্ষে পেশোয়ার যাচ্ছিলেন। পুলিশ সন্ধান করতে করতে কাশীতে উপস্থিত হয়। কাশীর তদানীন্তন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিতেন ব্যানার্জী তাঁকে গ্রেপ্তারের দায়িত্ব পান। পেশোয়াব থেকে ননীবালাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থাতেই পুলিশ ওঁকে স্ট্রেচারে করে পুলিশ হাজতে আনে। কয়েক দিন হাজতে রাখার পর কাশীর জেলে চালান করে দেওয়া হয়। এবার চলল জেরা , অত্যাচার, দিনের পর দিন। ননীবালা চুপ। এবার চরম অত্যাচারের অঙ্গ হিসাবে আলাদা সেলে নিয়ে গিয়ে জমাদারনীকে দিয়ে জোর করে উলঙ্গ করে শরীরের অভ্যন্তরে লঙ্কাবাটা দেওয়া হলো। এই নিষ্ঠুরতার পরও তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কোনও গোপন সংবাদ বের করতে না পেরে তাঁকে আলোবাতাসহীন সেল-এ রাখা হলো। প্রথম দুদিন আধঘণ্টা করে সেই অন্ধকার কক্ষে রাখা হলো। তৃতীয় দিন রাখা হলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ননীবালা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এখানে এসে ননীবালা দেবী খাওয়া বন্ধ করলেন। জেল কর্তৃপক্ষ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে অনুরোধ করাতেও খেলেন না। আই.বি. পুলিশের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গোল্ডি প্রায়ই জেরা করতেন। কি শর্তে অনশন ত্যাগ করবেন জিজ্ঞাসা করলে ননীবালা এক দরখাস্তে লেখেন যে বাগবাজারে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পত্নীর কাছে তাঁকে রাখা হলে খাবেন। কিন্তু গোল্ডি সেই দরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলেন। এইভাবে তাঁর লেখা দরখাস্তের অপমান করায় ননীবালা গোল্ডির গালে চড় মারেন। এই ঘটনার পর তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে রাজ্য রাজবন্দিনী করে প্রেসিডেন্সী জেলেই রেখে দেওয়া হয়। অন্যতমা বন্দিনী দুকড়িবালা দেবী (বীরভূম)- ও সেখানে ছিলেন। (পূর্বেইবলা হয়েছে, তাঁর বাড়ি থেকে সাতটি মসার পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল।) তিনি ছিলেন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা। ব্রাহ্মণকন্যা দুকড়িবালা দুজন ঝি-এর সহযোগিতায় তাঁকে রেঁধে দেবেন, ননীবালার দাবী অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট সেই ব্যবস্থা করে দিলে ২১ দিনের অনশনের পর ননীবালা দেবী খেতে সম্মতা হন। এই ভাবে দুকড়িবালাকে তিনি কঠোর সশ্রম দণ্ড থেকে রেহাই করান।

দু বছর বন্দী জীবন যাপনের পর ১৯১৯ সালে তাঁর মুক্তির আদেশ হয়। মুক্তির পর মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেন না। পুলিশের ভয়ে কেউ তাঁকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না। তাঁর বাবা কলকাতায় একটা ছোট ঘর ভাড়া করে দিলেন। দীর্ঘ দিন

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তথ্যসূত্র ঃ বিপ্লবী বাংলা--তারিণী শক্কর চক্রবর্তী (পৃঃ১৯৬); 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ'-- সম্পাদক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (পৃঃ৯৮-১০১); 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-- সুপ্রকাশ রায় (পৃ ঃ২২২); 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত' ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃ ঃ ৮৫); সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (১ম খন্ড) (পৃঃ ২৩৯) 'স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ভারতীয় নারী' ঃ কৃষ্ণকলি বিশ্বাস (পৃ ঃ১১৫-১১৯)।

—০—

কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতি ঃ (১৯১৫-১৯২৩)

হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা কয়েকটি ডাকাতি ও খুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল শিবপুর। কিন্তু হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা (গ্যাং কেস) সমাপ্ত হবার বছর পাঁচেক পরেই পুনরায় পর পর স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী কলকাতার যুগান্তর সমিতির পুলিন মুখার্জী ও অতুল ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা হাওড়ার শালকিয়ার হরিদাস পাইনের বাড়ি ডাকাতি করে ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। [১]

এই সময় ডোমজুড় থানার বলুটি হাইস্কুলে একজন শিক্ষকের বদলিতে নিযুক্ত শিক্ষক কলকাতার তালতলার বিমান ঘোষ স্কুলের একদল ছাত্রকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। আত্মোন্নতি সমিতির জিতেন দাসের কাছ থেকে বন্দুক এনে তিনি দফরপুরে চড়কডাঙার মাঠে ছাত্রদের বন্দুক ছোঁড়া শেখাতেন। তাঁর যে সব ছাত্র এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন তাঁরা হলেন দফরপুরের হরেন চ্যাটার্জী, সত্যচরণ ঘোষ, বামাপদ ঘোষ, কেষ্ট ঘোষ, ভাস্কুড়ের কেষ্ট চৌধুরী, গরলগাছার মনি মুখার্জী প্রভৃতি। এদের নিয়ে তিনি উত্তর ঝাপড়দার প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েত দফরপুর ব্যানার্জীপাড়া নিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বন্দুক চুরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কেষ্ট চৌধুরী। পাইপ বেয়ে তিনি দোতলা পর্যন্ত উঠেছিলেন কিন্তু কেউ এসে পড়ায় সফল হন নি।

দফরপুরে বসাকের ডাঙ্গায় ছিল ভিক্টোরিয়া ক্লাব। হীরু ঘোষ ঐ মাঠ কিনে নিলে ক্লাব উঠে যায় চড়কডাঙার মাঠে। নাম হয় প্রিন্স এলবার্ট ক্লাব। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ* হীরু ঘোষের বাড়ি ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা বালাক্লাভা পরে আসেন। হাতে

রিভলবার থাকে। সে রিভলবারও তাঁদের সরবরাহ করেছিলেন তালতলার আত্মোন্নতি সমিতির জিতেন দাস। বাড়ির লোকের চীৎকারে অনেক লোক জমায়েত হলেও বিপ্লবীদের হাতের রিভলবার দেখে কেউ ভয়ে এগোয় নি। বিপ্লবীরা দু হাজার টাকা পান।

কয়েকদিন পরেই পুলিশ সুপার ফেয়ারওয়েদার বহু সংখ্যক ঘোড়ার গাড়ী ও পুলিশ নিয়ে গরলগাছা, ভাস্কুড়, দফরপুর গ্রামের এই ডাকাতিতে অংশ-গ্রহণকারী যুবকদের বাড়ি বাড়ি তল্লাসী চালান। আপত্তিকর কিছু না পেলেও সত্যচরণ ঘোষ, হরেন চ্যাটার্জী, কেষ্ট চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। আদালতে মামলা চলে। আসামীপক্ষ সমর্থন করেন মাকড়দার অন্নদা দত্তের পুত্র হরি দত্ত। প্রমাণাভাবে আসামীরা খালাস পান। কিন্তু সরকারী আদেশে এঁদের অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। সত্যচরণ ঘোষকে প্রথমে মাদারিপুরে ও পরে জলপাইগুড়িতে বছর দেড়েকের জন্য, হরেন চ্যাটার্জীকে মুর্শিদাবাদে মাস ছয়েকের জন্য এবং কেষ্ট চৌধুরীকে বাঁকুড়ায় বছরখানেকের জন্য অন্তরীণ করে রাখা হয়।

দফরপুর স্বদেশী ডাকাতির সাথে জড়িত কর্মীরা প্রথমে চণ্ডীতলা পোস্টাপিসে একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা কার্যকারী করা না যাওয়াতে হীরু ঘোষের বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়।

বিপিন গাঙ্গুলীর দলের সভ্যরা হাওড়া জেলার একটি গ্রামে ডাকাতি করে ২ হাজার টাকা পান। এই ডাকাতির সূত্রে বিপিন গাঙ্গুলীর দল ও বরিশালের যুগান্তর শাখার বহু সদস্য গ্রেপ্তার হন। [২] এটা বুড়িবালামের খণ্ডযুদ্ধের (১৯১৫ সেপ্টেম্বরের) পরের ঘটনা।

২৬শে জুন (১৯১৬) কলকাতার একটি ডাকাতির সূত্রে শালকিয়ার একটি বাড়িতে অতুল ঘোষকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ আসে। অতুল ঘোষ গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। ঐ বাড়ির অন্য কেউ কেউ গ্রেপ্তার হন। [৩]

২৬শে জুন ১৯১৬ হাওড়ার গোপীনাথ রায় লেনে গৌরচন্দ্র তালুকদারের ঘরে এগার হাজার টাকা ডাকাতি হয়। ঐ জুন মাসেই বাকসাড়াতে ডাকাতি হয়। ১৬ই মে ১৯২৩ কোনায় প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ডাকাতি হয়। [৪]

কলকাতার প্রখ্যাত বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উত্তর ঝাপড়দার ক্ষেতু মুখার্জী ও কাটলিয়ার এক ডাকাতের সহযোগে খসমরার জমিদার ঘোষেদের বাড়ি ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে তা আর সম্ভব হয় নি

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার হরিপদ বসু কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে

পড়তে এসে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। তিনি দলের অর্থ সংগ্রহের জন্য হাওড়ার লক্ষণ দাস লেনে বাইশ হাজার টাকা ডাকাতি করেন। এই ডাকাতিতে হরিপদ বাবুর সঙ্গে ছিলেন কমল শ্রীমানি।[৬] সম্ভবতঃ ইনি মাকড়দহের কমল শ্রীমানি।

১৯২৩ -এর ৩রা আগষ্ট বেলা ৩টে নাগাদ শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসে তিনটি যুবক ডাকাতি করে। পোস্টমাস্টার অমৃতলাল নিহত হন। অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন মধ্য হাওড়ার আচার্য পাড়া লেনের বরেন্দ্র ঘোষ। তিনি গ্রেপ্তার হন। হাইকোর্টের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। স্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষার আবেদনে বড়লাট তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেন।[৭] ঐ ডাকাতিতে আচার্যপাড়া লেনের হরপ্রসাদ মুখার্জীও ধরা পড়েন। তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়। এঁরা সন্তোষ মিত্রের দলে ছিলেন, বিপিন গাঙ্গুলী সংগ্রহ করেছিলেন।[৮]

রসপুরের ভোলা মাল ও হাওড়ার জীবন মাজী রসপুরের একটি বাড়ি থেকে একটি বন্দুক চুরি করে। আমতার সেকেণ্ড অফিসারের উপর তদন্তের দায়িত্ব পড়ে। তিনি অমরাগোড়ীর পুলিন পালকে ডেকে সাবধান করে দেন।[৮ক]

তথ্য সূত্রঃ

* দফরপুর ডাকাতির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন ঐ গ্রামের বর্ষীয়ান নাগরিক শ্রদ্ধেয় ভক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ডাকাতির তারিখ ১৫.৩.১৯১৫ বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী ইতিপূর্বে প্রকাশিত নানা নিবন্ধে সেই তারিখ উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থে [যথাঃ বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনী গুহ (পৃঃ ১৯৮)] ১৫.৩.১৯১৫ উল্লেখ থাকায় সেই তারিখটিই এখানে উল্লেখ করলাম।

(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক সর্বতথ্য সার সংগ্রহ--জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় (পৃ:৬৫৯)।

(২) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস-- সুপ্রকাশ রায় (পৃ ঃ ২০৭)

(৩) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস-- সুপ্রকাশ রায় (পৃ ঃ ২০৮)

(৪) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক সর্বতথ্য সার সংগ্রহ- জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (পৃ ঃ ৬৬০,৬৬২)।

(৫) দফরপুরের শ্রদ্ধেয় ভক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণ।

(৬) মুক্তিপথের যাত্রী যাঁরা--- সুধীর ঘোষ প্রমুখ ১৬ জন কর্তৃক সম্পাদিত (পৃ ঃ ১৭৯-১৮০)

(৭) বিপ্লবের পথে —সুবোধকুমার লাহিড়ী (পৃঃ ৩৩) ও হাওড়া জেলার ইতিহাস — হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২০৭)

(৮) ও (৮ক) বলাই সিংহ কথিত।

— ০ —

চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে যোগাযোগ

দফরপুর স্বদেশী ডাকাতির মূল পরিকল্পনাকার বিমানঘোষ এই ঘটনার কিছু দিন পরেই আমেরিকা চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

এই সময় থেকেই দফরপুর গ্রামের উপর পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি কয়েক বছরের জন্য অব্যাহত থাকে। এই গ্রামে অবস্থিত তেলিনীপাড়ার জমিদার রাজনন্দিনী দেবীর কাছারী বাড়ীতে গোয়েন্দা অফিস বসে। সেই অফিস পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন ধুরন্ধর গোয়েন্দা আশুতোষ বোস।

পুলিশের দমনপীড়নের জন্য কিছুদিন যাবৎ দফরপুরের কর্মীরা কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। বামাপদ ঘোষ ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার না হলেও তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই পুলিশী তল্লাসী ঘটতে থাকে। উপরন্তু একেবারে চোখের উপর গোয়েন্দা দপ্তর বসে থাকার জন্য কর্মীরা বিশেষ কিছু করতেও পারছিলেন না।

অন্তরীণাবদ্ধ কর্মীরা ছাড়া পেয়ে ফিরে আসবার পরই নতুন কর্মপ্রেরণার সঞ্চার হয়। এই সময়ে একটি বিশেষ যোগযোগ ঘটে। অন্তরীণাবদ্ধ সত্যচরণ ঘোষের দাদা অন্নদা ঘোষ সাউথ ইউনিয়ন জুটমিলের স্পিনিং ইনচার্জ ছিলেন। ঐ মিলেরই হেডক্লার্ক ছিলেন প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ বিপ্লবী নির্মল বক্সী (পরবর্তীকালের চিদানন্দ স্বামী)। ১৯১৬ সালে নির্মলবাবুর চাকুরী যায়। প্রবর্ত্তকের মতিবাবু তাঁকে মানুষ গড়ার কাজে নিযুক্ত হতে বলেন। নির্মলবাবু অন্নদা ঘোষের মারফৎ দফরপুরের কর্মীদের সংযোগে আসেন, গঠনমূলক কাজে ও ধর্মালোচনায় কর্মীরা লিপ্ত হন। কর্মীরা ভাস্কুড়ে কেষ্ট চৌধুরীর বাড়ী তাঁত বসাবার সিদ্ধান্ত নেন। কেষ্টবাবুর জমির উপর গোলপাতার ঘর করে সেখানে ৬ খানা তাঁত বসানো হয়। তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রাদি নিয়ে সত্যচরণ ঘোষ, বামাপদ ঘোষ, পরেশ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কর্মীরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করতে যেতেন। উত্তর ঝাপড়দার খোদাবক্স, দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখোপাধ্যায়, ঝাপড়দা স্কুলের শিক্ষক পার্বতীপুর গ্রামনিবাসী গোষ্ঠ বিহারী মুখোপাধ্যায়, ঐ গ্রামেরই বসন্ত ঢেঁকি, ডোমজুড় গ্রামের হৃষিকেশ দাস প্রভৃতি প্রবর্তক আশ্রমের ক্রিয়াকলাপের দিকে আকৃষ্ট হন।

দফরপুরে প্রবর্তক আশ্রম স্থাপনে ঃ

খোদাবক্স ও ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রম থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেন। ১৯১৮ সালের ২রা অক্টোবর দফরপুর গ্রামে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাপদ ঘোষ,অন্নদা প্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ প্রসাদ ঘোষ, অক্ষয়

কুমার ঘোষ, ভরত চন্দ্র কোঙার, লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যচরণ পাল, যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, কৃষ্ণমোহন চৌধুরীর প্রচেষ্টায় 'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী' স্থাপিত হয়।[১]

দফরপুর স্বদেশী ডাকাতি মামলায় ধৃত অন্তরীণাবদ্ধ কর্মীরা ছাড়া পাবার পর আর কোন বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন নি। কিন্তু ঐ মামলায় যাঁরা গ্রেপ্তার হননি, (যেমন রামাপদ ঘোষ), তাঁদের সাথে ঝাপড়দা, ডোমজুড় প্রভৃতি গ্রামের দেশপ্রেমিক যুবকদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের মাধ্যমেই কর্মীরা বিপ্লবান্দোলনের দিকে ঝোঁকেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সংঘের কার্যকলাপ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার দিকে মোড় নিতে থাকে। প্রথম দিকে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জী, ঝাপড়দা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সনৎ সিংহ, ঐ স্কুলের আরও দুজন শিক্ষক গোষ্ঠবিহারী মুখার্জী (পার্বতীপুর) ও হৃষীকেশ দাস (ডোমজুড়), উত্তর ঝাপড়দার খোদাবক্স (পিতা সেকেন্দার বক্স) প্রভৃতি প্রবর্তক সঙ্ঘ পরিচালিত ক্লাসে যোগ দিতেন। কখনও এই ক্লাস দফরপুর চড়কতলার মাঠে বটগাছের নীচে, কখনও ডোমজুড়ের হৃষীকেশ দাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হোত। প্রবর্তক সংঘ ধর্মীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ায় এই সকল যুবকদের মধ্যেকার বিপ্লবী প্রেরণাসম্পন্ন যুবকরা গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দিকেই ঝোঁক দেন। সংঘের সেবামূলক কাজ ও সংগঠনের সাথে তাঁরা যুক্ত রইলেন। এই সময় অনাথ ভাণ্ডার, Anti-Malaria Society প্রভৃতি সেবামূলক সংগঠন স্থানে স্থানে গড়ে ওঠে। জনৈক কথক ঠাকুর এই সময় কথকতার মাধ্যমে দফরপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চরকায় সুতা কাটার জন্য জোর প্রচার চালান। ভাস্কুড়ের কেষ্ট চৌধুরী নার্ণার কালিদাস প্রামাণিক প্রভৃতির সহযোগিতায় যে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র খুলেছিলেন তার উৎপাদনও খুব বেড়ে যায়। বিপ্লবান্দোলনের কর্মীরাও স্বদেশী বস্ত্রের উৎপাদনে উৎসাহ দিতে থাকেন। তাঁরা একটি যোগাযোগের কেন্দ্র খুঁজতে থাকেন এবং ঝাপড়দা বাজারে অবনী মুখার্জীর দোতলায় মাসিক ৪ টাকা ভাড়ায় একটি ঘর পেয়ে যান। এর নাম দেন তাঁরা 'সংঘ ভাণ্ডার'। সেখানে সনৎ সিংহ, গোষ্ঠ মুখার্জী, ধীরেন মুখার্জী প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন। প্রধান শিক্ষক সতীশবাবু ও এই সকল শিক্ষকদের চেষ্টায় ঝাপড়দা স্কুলের লাইব্রেরীও স্বদেশপ্রেম-মূলক পুস্তকে ভরে গিয়েছিল। রাজস্থানের ইতিহাস, দাহিরের উপর আক্রমণের করুণ কাহিনী সম্বলিত পুস্তক, নেপোলিয়ন-মাৎসিনি-গ্যারিবল্ডী-কাভুর প্রভৃতির জীবনী, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কিত পুস্তক থাকতো। ছাত্ররা এইসব পুস্তক পড়ে সহজেই প্রভাবিত হোত। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণ ঝাপড়দা) বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি

এখানকার শিক্ষক ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্বাধীনতাপ্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। [২]

১৯২১ সালে সি, আর, দাশের নেতৃত্বাধীন ক্যালকাটা পুলিশ আইন ভঙ্গ করেন দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। জোড়াবাগান কোর্টে তাঁর বিচার হয় এবং তিন মাসের জেল হয়। তখনও তিনি কংগ্রেসের সদস্য হননি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সে চাকুরী করতেন। জেল থেকে ফিরে ডোমজুড়ে সংগঠন গড়বার কাজে লিপ্ত হন। নিজের কর্মদক্ষতা, আদর্শনিষ্ঠা ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেমের জন্য তিনি অচিরকালের মধ্যেই কর্মীদের মনে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন।

অবনী মুখার্জীর দোতলাবাড়ীর কেন্দ্র থেকেই ধীরেন মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, খোদাবক্স, বামাপদ ঘোষ, শিবপ্রসাদ মুখার্জী (দঃ ঝাপড়দা) প্রভৃতি আন্দুল, সাঁকরাইল, মৌড়ী, মাজু, মুন্সিরহাট প্রভৃতি স্থানে সপ্তাহে একদিন খাদি বস্ত্র বিক্রি করতে যেতেন। এই সঙ্গে তাঁরা প্রবর্তকসংঘ ও অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত বইও বিক্রি করতেন। সব মিলিয়ে দৈনিক ২০০/২৫০ টাকার বিক্রি হোত। পাঁতিহাল দামোদর স্কুলের প্রধান শিক্ষকমশাই, মৌড়ির জমিদার কুণ্ডুবাবুরা বইয়ের ভাল ক্রেতা ছিলেন।

সেবা সূত্র ধরে বিপ্লবান্দোলনে ঃ

কিছুদিনের মধ্যেই কর্মীদের মধ্যে Nursing Brotherhood গড়ে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় এঁরা রোগীদের শুশ্রুষা করতে যেতেন। কর্মীদের সঙ্গে ডাক্তার হিসাবে ডাঃ নলিনী মোহন চ্যাটার্জী এম, বি, ও যেতেন। তিনি ছিলেন আন্দুলের বাবুরাম ডাক্তারের জামাই। এখানে তাঁকে নিয়ে আসেন ধনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দঃ ঝাপড়দা), সতীশচন্দ্র ঘোষ (প্রধান শিক্ষক) ও মাকড়দার প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু))। নলিনীবাবু অধর আশের ডোমজুড় বাজারের দোকানঘরে ডিস্‌পেনসারি খুলেছিলেন এবং সপরিবারে থাকতেন দক্ষিণ ঝাপড়দায়। রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করার মধ্যে দিয়ে কর্মীদের জনপ্রিয়তা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি স্বদেশী কাজের বিরোধীরা সেবা ও সহানুভূতি পেয়ে বিরোধিতা ভুলে যেতে থাকেন। কর্মীরা ঝাপড়দা স্কুলে অবস্থিত Old Boys' Library- টি অবনীবাবুর দোতলার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। লাইব্রেরীটি ১৯১৭ সালে ঝাপড়দা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলনের প্রস্তাবক্রমে স্থাপিত হয়েছিল তাঁদেরই ব্যবহারের জন্য। লাইব্রেরীটি এখানে আনবার উদ্দেশ্য হোল, এর আকর্ষণে ছাত্র ও যুবকদের এখানে নিয়ে এসে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া যাবে।

কংগ্রেসের কাজের সূত্রে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। শরৎবাবুর শিবপুরের বাসাতেই প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে আশুবাবুর পরিচয় ঘটে। তারপর থেকেই বিপিনবাবুর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ডোমজুড়ের কর্মীরা চলতে থাকেন। বিপিনবাবুর দুর্গা পিতুরী লেনের বাসায় এখানকার কর্মীরা যোগাযোগ করতে শুরু করেন। বিপিনবাবু ডোমজুড়ে আসা যাওয়া করতে থাকেন। শরৎবাবুর বাড়ীতে উত্তরমৌড়ী উনশানির নারায়ণ দাস দে'র (পরবর্তীকালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) সঙ্গে এখানকার কর্মীদের পরিচয় ঘটে।

বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃন্দ ভাবতে সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্রবান্দোলনের কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এ পার্থক্য ডোমজুড়ের ক্ষেত্রে বিশের দশকের প্রথমার্ধে তেমন প্রকটভাবে দেখা দেয় নি। গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনে ১৯২০-২১সালে খসমরা গ্রামের নিবারণচন্দ্র ঘোষ যোগদান করেন। ঐ সময় গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি. এ. পরীক্ষা দেন কিন্তু সমাবর্তনে যোগদান করেন না এবং সার্টিফিকেটও নেন না। ডোমজুড়ের হৃষীকেশ দাস (শিক্ষক) বি.এ. পরীক্ষাই বর্জন করেন। গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের সমর্থনে তাঁরা ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আবার বিপ্লবান্দোলনের প্রতিও তাঁরা অকৃপণভাবে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছেন। কোনরকম গোঁড়ামি এসে চলার পথে বাধার সৃষ্টি করেনি।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এখানকার কর্মীদের ক্লাস নিতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন, "Means will justify the end' - তিনি কর্মীদের কাছে অস্ত্রাদির ব্যবহারিক কৌশল দেখাতে লাগলেন। এতে কর্মীদের উৎসাহ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। অবনী মুখার্জীর দোতলাতেই লাইব্রেরী, কংগ্রেসের কাজ, প্রবর্তক কর্মীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনা একসাথে চলতে লাগল। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের একাংশ রাত্রে ঐখানেই শুতেন এবং প্রাতঃকৃত্য সারবার পর অরবিন্দ ঘোষ নির্দেশিত পথে একঘণ্টা সমবেত যোগসাধনা চলত। উপস্থিত সব কর্মীরাই তাতে গুরুত্ব সহকারে অংশ নিতেন। এখানে ঝাপড়দা স্কুলের শিক্ষক গোষ্ঠবাবু ও সনৎবাবু নিয়মিত আসতেন এবং উভয়েই মনে প্রাণে বিপ্লবান্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। আদর্শবাদী শিক্ষক হিসাবে এঁদের প্রতি ছাত্রদের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক হৃষীকেশ দাসও এখানে নিয়মিত আসতেন। গোষ্ঠবাবু সনৎবাবুর সাথে তিনিও ছাত্রদের সঙ্গদান করতেন। (হৃষীকেশ দাস মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য চন্দননগরে শিক্ষকতা করেন ও পরে আবার ঝাপড়দার স্কুলে আসেন এবং এখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন।) [৬]

বিপ্লবান্দোলনের জন্য কর্মীসংগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় শিক্ষক হিসাবে গোষ্ঠবাবুর ছিল খুবই সুযোগ। স্কুলের শেষে বাছাই বাছাই ছাত্রদের নিয়ে তাঁরা যেতেন দক্ষিণ ঝাপড়দা বা খাঁটোরার কোন মাঠের ধারে। সেখানে রাত ৮টা ৯টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ক্লাস নেওয়া হোত, 'বঙ্গবানী' মাসিক পত্রিকা পড়া হোত। গোষ্ঠবাবুর প্রেরণায় 'উষা' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা এখানে বের করা হয়। তাতে প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি থাকত। [৪]

আন্দোলনের গভীর পথে ঃ

গোষ্ঠবাবু বাড়ীতে কয়েকটি ছেলেকে পড়াতেন। এদের মধ্যে একটি ছাত্র তাঁর বিশেষ নজরে পড়েন। ছেলেটির বাড়ী গোষ্ঠবাবুর স্বগ্রাম পার্বতীপুরে। চাষীর ছেলে, শক্ত সমর্থ এবং বিপ্লবী তত্ত্ব জানতে খুবই আগ্রহী। গোষ্ঠবাবু একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন মানুষ ভয় পায়?' ছেলেটি চট্‌পট্ উত্তর দিল, 'মানুষ জন্মের পূর্বে কি ছিল জানে না, মৃত্যুর পর কি হবে জানে না— সেই জন্য ভয় পায়।' উত্তর শুনে গোষ্ঠবাবু খুবই খুশী হলেন। ছেলেটিকে ধীরে ধীরে তিনি গোপন কাজের মধ্যে টেনে নিলেন। ইনিই পরবর্তীকালের মির্জাপুর বোমার মামলার আসামী বসন্ত কুমার ঢেঁকি। বসন্ত ঢেঁকি, উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পার্বতীপুর নিবাসী ছাত্রদের নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে গভীর রাতে নোনাকুণ্ডুর কেলোরমোনের জাঙ্গালে অস্ত্র শিক্ষা দিতে নিয়ে যেতেন। গোষ্ঠবাবু মূলতঃ কর্মী সংগ্রহ করতেন, ধীরেন মুখার্জী তাঁদের শিক্ষা (training) দিতেন এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র রাখা ও আত্মগোপনকারীদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করার দায়িত্বে ছিলেন।

এই সময় অবনী মুখার্জীর দোতলায় যে সব যুবক ও ছাত্র নিয়মিত যেতেন তাঁদের কয়েক জন হলেন খাঁটোরার পুলিনকৃষ্ণ পাল (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক), পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চ্যাটার্জী (বলাই), দক্ষিণ ঝাপড়দার জীবন ব্যানার্জী, কেশবপুরের শিরীষ ঘোষ (ইনি স্কুল হোস্টেলেই থাকতেন), দক্ষিণ ঝাপড়দার প্রবোধ কুমার চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র ,মাকড়দার লক্ষণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটলিয়ার সন্তোষ দাস (বর্তমানের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তীকালে এঁরা প্রত্যেকেই নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

যে সব কর্মী দলভুক্ত হলেন তাঁদের চিঠি ও বই আদান প্রদান করা, গোপন বৈঠক করা প্রভৃতির মাধ্যমে ট্রেনিং হোত। যাঁরা রাজনীতিতে একটু পাকাপোক্ত হয়ে উঠতেন, তাঁদের বোমা তৈরী শিক্ষা দেওয়া হোত।

গোষ্ঠবাবু একদিন শালকিয়ার হেরম্ব ব্যানার্জীর পুত্র বিপ্লবী কর্মী বিজন ব্যানার্জীকে বসন্ত ঢেঁকির বাড়ীতে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য বসন্তবাবুকে দিয়ে কতখানি

কাজ করানো যাবে তা যাচাই কবা। কথাবার্তার মধ্যে বিজনবাবু বসন্তবাবুর দৃঢ়তা দেখে সন্তুষ্ট হন্‌ এবং শালকিয়ায় যোগাযোগ করতে নির্দেশ দিয়ে যান। সেইখানকার যোগাযোগেই বিপ্লবান্দোলনের বিখ্যাত বোমা-বিশারদ হরিনারায়ণ চন্দ্রের নির্দেশনায় ডোমজুড়ে বোমা প্রস্তুত হতে থাকে। পরবর্তীকালে কলকাতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনেই বসন্তবাবুকে কাজ করতে হয়।[৫]

কর্মীদের উপর দায়িত্ব বৃদ্ধি হবার সাথে সাথেই গুপ্তকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ডাঃ নলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ডিস্‌পেনসারিতে একটি গুপ্তকেন্দ্র খোলা হয়। এখানে বোমার খোল ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রাখা হোত। ওষুধ আনবার অছিলায় আনা হোতে লাগল বোমা তৈরীর সাজসরঞ্জাম। দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (ছোট খোকা) ঝোড়ায় করে ঐ সব বিস্ফোরক পদার্থ বয়ে আনতেন। তখন ওঁর বয়স কম ছিল, সন্দেহও হোত না। কলকাতা থেকে বিদেশী বোমার খোলও এখানে এনে রাখা হোত।[৬]

বিপ্লবান্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার, বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি প্রভৃতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন। এতে একদিকে কংগ্রেসের কাজে কর্মীদের সংগ্রহ করবার সুবিধা হয়, ঐ সকল বাড়ীগুলি বোমা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যায় এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের নৈকট্য গড়ে ওঠায় তাঁদের পিত্রালয়ে ও বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আত্মগোপন করার সুবিধা হয়। দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ঐ গ্রামেরই কালীকিঙ্কর মুখার্জীর বাড়ীর পাশের ঘরে ১৯২২ সালে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অর্থ সাহায্য করেন দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সত্যচরণ দাস প্রভৃতি। এর পূর্বেই ঐ সালের প্রথম দিকে অবনীবাবুর দোতলা থেকে Old Boys' Library- টি সরিয়ে আনেন দক্ষিণ ঝাপড়দার গোবর্ধন দে-র বাড়ীতে। বালিকা বিদ্যালয় ও লাইব্রেরীর ঘরে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও বসন্ত ঢেঁকি প্রমুখ কর্মীরা সকলের অগোচরে বোমা তৈরী করতেন এবং পরীক্ষা করতেন। লক্ষ্মী ঘোষ নামে সালকিয়ার একটি কারখানার কারিগর প্রয়োজন মতো বোমার খোল তৈরী করে দিতেন এবং রিভলবার খারাপ হয়ে গেলে মেরামত করে দিতেন দফরপুর গ্রামের কর্মকারপাড়ার দুলাল কর্মকার।

দক্ষিণ ঝাপডদায় বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপনের পর কর্মীদের যোগাযোগের পরিসর বৃদ্ধি পায়। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কর্মীগণের চেষ্টায় পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হয়। তাতে প্রধান অতিথি হিসাবে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় আসেন। হাওড়া কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রবোধ চন্দ্র বসু প্রায়ই এখানে আসতে থাকেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং থাকতেন শিবপুরে ১১নং নাগপাড়া লেনে। তাঁরই সঙ্গে একবার এসেছিলেন হাওড়ার খুরুট নিবাসী কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট সুগায়ক হরেন দত্ত। এখানে তিনি 'বন্দেমাতরম্', 'বল বল বল সবে', 'জাতের নামে বজ্জাতি তোর' প্রভৃতি স্বদেশী সঙ্গীত গান করেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মৌড়ীর পূর্বকথিত নারায়ণ দাস দে-ও প্রায়ই আসতেন। এই সকল নেতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিপিনবাবু। কলকাতার ৬০নং মলঙ্গা লেনের অনুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত বিপ্লবী অনুকূল মুখোপাধ্যায়, বউবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাথেও কর্মীরা পরিচিত হয়ে ওঠেন। হাওড়ার শালকিয়ার বিজন ব্যানার্জীর সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষ চন্দ্র বসুর বাড়ীর সঙ্গেও কর্মীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শালকিয়ার বিশিষ্ট বিপ্লবীকর্মী, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলাখ্যাত বীরেন ব্যানার্জী (পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট নেতা ও দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনের পর বিরোধী দলের ডেপুটিলীডার), দেবেন দে (পরবর্তীকালে পঃ বঃ সরকারের পরিষদীয় মন্ত্রী) প্রমুখের সাথে ডোমজুড়ের কর্মীদের যোগাযোগ ও যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কর্মীদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ মাত্র তিনিই তাঁকে জানতেন। অহেতুক কৌতূহল পোষণও গর্হিত ছিল। অস্ত্রাদি সরবরাহ, চিঠিপত্র বা সংবাদ আদান প্রদান সবই অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠেছিল। পোস্ট অফিসের মারফৎ চিঠি আসা যাওয়া কর্মীরা বন্ধ করলেন। কলকাতার সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের কয়েকটি কেন্দ্র ঠিক হোল। কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র অরবিন্দ কর্মকার (দক্ষিণ ঝাপড়দা), হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন ঐ কলেজেরই ছাত্র ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাকড়দা), বড়বাজারে ৫২ নং রাজা কাটরায় দোকান ছিল দক্ষিণ ঝাঁপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের, ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর পাশে চুন সুরকীর দোকান ছিল রমনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আমতা), হাওড়ার ৩২ নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেনে থাকতেন উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (পার্বতীপুর)— কলকাতা থেকে খবর আসতো এবং ডোমজুড় থেকে খবর যেতো এঁদের কাছে। এই সকল যোগাযোগের মধ্যে উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই বেশী খবর আসা - যাওয়া করতো। ডোমজুড়ের কর্মীরা ট্রেনে যাওয়া আসা না করে সাইকেলেই আন্দুলের মধ্যে দিয়ে বা বলুহাটি— কালীপুর—উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে হাওড়া - কলকাতায় সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করতেন। একবার দলের প্রয়োজনে দক্ষিণ ঝাপড়দার এক কর্মী দক্ষিণ ঝাপড়দারই এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে একটি সাইকেল চুরি করে এনেছিলেন।

পোর্ট কমিশনার্সের চাকুরীয়া বিপ্রন্নপাড়ার বিপিন বিহারী চ্যাটার্জী আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, অস্ত্রও রাখতেন। উনসানি দিয়ে যাওয়া আসার পথে মৌড়ীর ডাঃ ললিতমোহন চক্রবর্তীর ডিসপেনসারিতে দেখা করতে যেতেন। প্রতিদিনই বিপ্লবী কার্যকলাপের খোঁজ-খবর দেওয়া-নেওয়া চলতো। বিপিনবাবুকে সাহায্য করতেন প্রশস্থ গ্রামের মন্মথ হালদার। চাষী যজমানদেব বাড়িতেও তিনি অস্ত্রাদি রেখে দিতেন। স্তব-আরাধনার আড়ালে খুব সুচতুরভাবে তিনি একাজ সমাধা করতেন। এই সময় ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর প্রেরণায় মৌড়ীতে একটি বিপ্লববাদী সংগঠন দানা বাঁধতে থাকে। [৭]

বিপ্লবান্দোলনের সহায়তায় বলুহাটি ঃ

হুগলী জেলার জনাই গ্রামের ফণীন্দ্রমোহন মুখার্জী দফরপুর ডাকাতির (১৫.৩.১৯১৫) অন্যতম অংশগ্রহণকারী এবং অন্যান্যদের মত তিনিও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পাবার পর তাঁকে কুতুবদিয়ায় পাঁচ বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়।

সেখান থেকে ফিরে তিনি পুনরায় বিপ্লবান্দোলন সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি উপেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একটি তরুণকে কাছে টানেন। উপেনবাবুর পৈতৃক নিবাস খোঁড়াগোড় দত্তপুর। তিনি বাক্‌সা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেখান থেকে তিনি তখন মামাবাড়ি বলুহাটিতে এসে বাস করছেন এবং বলুহাটি স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকমশাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উপেনবাবুর সহযোগিতায় ফণীন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ কর্মী জনাইয়ের নিরাপদ মুখার্জী প্রায়ই বিকালের দিকে এসে ছাত্রদের কাছে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্য সংগঠিত হবার আহ্বান রাখতেন। তাঁর সঙ্গে জনাইয়ের পদ্মকুমার দে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, বাক্‌সা গ্রামের অনাথনাথ মিত্র প্রমুখ যুবকরা আসতেন। জনাইয়ের ফণীন্দ্রবাবুর বাড়িতেই পার্বতীপুরের বসন্ত ঢেঁকির সঙ্গে উপেনবাবুর পরিচয় হয়।

এই সময়ে উপেনবাবু বলুহাটিতে একটি বিপ্লববাদী সংগঠন গড়ে তোলেন, তাতে থাকেন বলুহাটির নির্মল দাস, নরেন ব্যানার্জী, সুশীল কুমার (পটলবাবু)। ধীরে ধীরে কলকাতার অনুকূল মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। অনুকূল মুখার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল মুখার্জী একদিন এসে এখানকার কর্মীদের কাছে পাঁচটি বোমা দিয়ে বলেন যে, সুভাষবাবু প্রমুখ ৭২জন নেতা গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন, অনুকূলবাবুর বাড়িও ঘেরাও হয়েছে, তাঁর কাছে ৮টি বোমা ছিল, সব আনা যায় নি ইত্যাদি। বোমাগুলি পেয়ে বলুহাটির যুবকরা বিপ্লবান্দোলনে অংশগ্রহণ করার প্রথম স্বীকৃতি পেলেন।

বৌবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গিরিন ব্যানার্জীর সঙ্গে উপেনবাবুর আলাপ হয়। জনাইয়ের ফণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে এক সভায় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 'বড়দা' পরিচয়ে এসেছিলেন। পরে কর্মীরা তাঁর আসল পরিচয় পান। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত হয়,

উপেনবাবুর কাছে অস্ত্রাদি থাকবে। তিনি কোনসময়েই আন্দোলনের সামনে যাবেন না। তিনি গ্রেপ্তার হলে প্রয়োজনের সময় অস্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ থাকবে না । সেইভাবে গোপনভাবে উপেনবাবু কাজ করে যেতে থাকেন। তিনিই বিপিনবাবুকে ১৯২১ সালে বলুহাটিতে প্রথম আনেন।

পরবর্তীকালে নেতৃত্বের নির্দেশমত এখানকার কর্মীরা অস্ত্র সংরক্ষণ করেছেন। কর্মীরা বরানগরের খগেন চ্যাটার্জীর কাছ থেকে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী 'কবিরাজ' নামধারী এক যুবক মারফৎ একটি ছোট 'প্যাকেট' নিয়ে আসেন যার মধ্যে ৫০টি ডিনামাইট ও ৫০টি কালমিনেট অব্ মার্কারী (অর্থাৎ ডিনামাইট চার্জ করার আগে তাতে লাগিয়ে নেবার জন্য পলতে জাতীয় জিনিস) ছিল। প্যাকেটটি লোকচক্ষুর অগোচরে বলুহাটির শ্মশানে হেলানো একটি বটগাছের ফোকরের খাঁজে কর্মীরা রেখে দেন।

বলুহাটিতে নির্মল দাস বোমা তৈরী করতে পারতেন এবং নিজে খুব দ্রুত ছুঁড়তে পারতেন বলে নিজেই বোমা নিক্ষেপ করার দায়িত্ব নিতেন। তেজস্ক্রিয় বোমা নিক্ষেপ করার অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্ফোরিত হতো—সুতরাং নিক্ষেপকারীর দ্রুততা না থাকলে তাঁর নিজেরই আহত হবার সম্ভাবনা দেখা দিত।

এরপর উপেনবাবু দুটো মসার পিস্তল, কোল্ট এর দুটো সাতঘরা রিভলবার এবং বিয়াল্লিশটি কার্তুজ পান। স্বগ্রামের বিশ্বস্ত কর্মী সুশীল কুমার (পটল)-এর সাহায্যে তাঁদের পটল ক্ষেতে গর্ত করে একটা কড়ির জারের মধ্যে রেখে পুঁতে দেন। তারপর ওগুলি চারপাশে ইট দিয়ে পিচ ঢালাই করে দেন। কয়েকদিনের চেষ্টায় রাতের অন্ধকারে একাজ করা হয়। বাইরের কেউ জমিটা দেখলেও বুঝতে পারতো না যে, সেখানে কিছু আছে। দাদামশাইয়ের বৈঠকখানায় সুশীলবাবু একা শুতেন বলেই গভীররাত পর্যন্ত বাইরে থাকায় তাঁর কোন অসুবিধা ছিল না।

মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে নারায়ণ রায় শিয়াখালায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ার জন্য আসতেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশানুযায়ী জনাইয়ের ফণীন্দ্রবাবু উপেনবাবুকে নারায়ণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নারায়ণবাবুর সঙ্গে উপেনবাবুর যোগাযোগ হয় নি। এই নারায়ণ রায়ই পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জেরে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, বিধায়ক হন এবং বিশিষ্ট জনদরদী চিকিৎসকরূপে খ্যাত হন।

নেতাদের নির্দেশ কর্মীরা যথাযথরূপে পালন করার জন্য সমস্ত রকম ভয়কে তুচ্ছ করেই এগিয়ে যেতেন। কর্মীরা যেমন অস্ত্রাদি সংরক্ষণ করেছেন তেমনই নেতাদের নির্দেশমত গোপনে তা হস্তান্তরিতও করেছেন। একবার নির্দেশ এলো, রাত ৯টা নাগাদ

হাওড়া স্টেশনের ১০নং প্লাটফরমে কোল্ট-এর রিভলবার দুটি এবং কার্তুজগুলি পৌঁছে দিতে হবে নির্দিষ্ট বর্ণনার দুটি ছেলের হাতে বিশেষ সংকেত বুঝে নিয়ে--যথারীতি তা পালিত হলো। অস্ত্র পৌঁছে দিয়ে উপেন্দ্রনাথ লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরলেন। আবার অনেক সময় নির্দেশানুযায়ী গেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তি না আসায় ফিরে আসতে হয়েছে। যেমন একবার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছিল গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলকে মসার পিস্তল দুটি দিয়ে আসতে হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত উপেনবাবু যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন, কিন্তু তাঁরা এলেন না। পরে নির্দেশমত ওগুলি জনাইয়ে পৌঁছে দেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ ডিনামাইটগুলি গোপন আস্তানা বলুহাটির শ্মশানে বটবৃক্ষের কোটরে থেকে যায়।

কয়েক বছর ধরে নানাস্থানে উপেনবাবু, নির্মলবাবু ও সুশীলবাবুর সহায়তায় অস্ত্রাদি সংরক্ষণ করেছেন কখনো মাটির নীচে, গাছের কোটরে, পোড়ো বাড়ির ইটের ফাঁকে যথারীতি দেওয়ালে ইট সাজিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে লোককে বুঝতে না দিয়ে —কিন্তু এমন একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা উপেনবাবুর চোখের উপর ঘটে যায় যার ফলে তিনি এই আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাইলেন। ঘটনাটি হলো—

একটি টাইমবোমা পরীক্ষা করার নির্দেশ আসে। পাঁচজন বিপ্লবী কর্মী একাজে নির্বাচিত হন—বলুহাটির উপেনবাবু, জনাইয়ের নিরাপদ মুখার্জী ও অন্যান্য স্থান থেকে আরও ৩ জন। তাঁদের পরিচয় উপেনবাবুদের জানা ছিল না। তার মধ্যে একজন ছিল অতি সুদর্শন একটি তরুণ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণে স্বাস্থ্যের সৌকুমার্যে অনিন্দ্যসুন্দর। স্থান নির্বাচিত হয়েছিল দমদমের ঘুঘুডাঙ্গায় ধানক্ষেতের পূর্বদিকে বাবলাগাছে ভরা দ্বীপের মত একটা স্থানে। উপেনবাবুকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যান নিরাপদবাবু। প্রায় তিনমাইল পথ কাদাজল মাড়িয়ে ওঁরা ঐ দ্বীপে গিয়ে ওঠেন। বোমা পরীক্ষার ব্যাপারে সেই সৌম্যদর্শন ছেলেটিই আগ্রহ দেখায়। কিন্তু সে বোমাটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি বিস্ফোরিত হয়ে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। [৭ক]

স্বাধীনতার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়েই সেই ১৯/২০ বছর বয়সের তরুণ বিপ্লবান্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। বোমা বিস্ফোরণের ক্ষণকাল পূর্বেও সেই তরুণটি বা তার সহকর্মীদের কেউই এমন মর্মান্তিক পরিণতির কথা ভাবতে পারেন নি। এই বিয়োগান্ত ঘটনার স্মৃতি সেই তরুণের সহযোগীরা বা তাঁর পরিচিতজনেরা বা আত্মীয়রা যারাই শুনেছিলেন —তাঁরা কি আমৃত্যু তা ভুলে থাকতে পারবেন? —এই গ্রন্থ সংকলনের যোল বছর আগে বলুহাটির স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকার ৭৮ বছর বয়সী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ যখন এই ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ শোনান তখন তাঁর দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় নির্গত অশ্রুবারিরাশি এই প্রতিবেদকের সামনে উপেন্দ্রনাথের যে

হৃদয়বেদনার চিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়েছিল তা এই অক্ষম লেখকের ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

উপেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে কালীপদ মুখার্জী (পরবর্তীকালে পঃ বঃ সরকারের মন্ত্রী) আসতেন। তাঁর সঙ্গে কুলদা বাবু নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী একবার এসেছিলেন। বলুহাটির কর্মীদের নিয়ে উপেনবাবুও নেতাদের বাড়ী যেতেন। একবার বলুহাটির সুবোধ মুখার্জী ও শিবু ঘোষকে নিয়ে উপেনবাবু বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বৌবাজারে একটি বাড়ীতে যান। বিপিনবাবু তখন সেই বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। শিবু ঘোষ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে দেখেই বিপিনবাবু বলে ওঠেন,—"স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।"

কর্তব্য কঠোর বিপ্লবী নায়কও যে সেই যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনে কতখানি রসিক হতে পারেন এতো তারই প্রমাণ। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' হলেই বোধ হয় এমনতরো প্রাণবন্ত হওয়া যায়।

সুশীল কুমার (পটল দা) কখনও জেল খাটেন নি। কিন্তু বলুহাটির কর্মীদের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুবোধ মুখার্জী ডাঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমপাউণ্ডার ছিলেন। একদিন সকাল দশটায় বারীন নামে একটি ছেলে সুবোধবাবুর কাছে এসে বিপিনবাবুকে আশ্রয় দেবার কথা বলেন। কিন্তু তখন ওখানে আশ্রয় দেবার কোনও সুযোগ থাকে না। বিপিনবাবু ওখান থেকেই জনাই যান, সেখান থেকে বাড়ী যান এবং গ্রেপ্তার হয়ে যান। [৭খ]

গুপ্তচর নিধন চেষ্টায় ঃ

১৯২৪ সালে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন, যাদের চক্রান্তে তিনি গ্রেপ্তার হলেন তাদের হত্যা করার চেষ্টা হতে লাগল। এই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন অত্যাচারী আই বি কমিশনার নলিনী মজুমদার। সুতরাং তাঁকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়ল বসন্ত ঢেঁকি, দেবেন দে, ভবেশ বসুরায় ও অন্য একজন বিপ্লবীর উপর। কিন্তু এঁরা কেউই তো তাঁকে চেনেন না। বিপ্লবী কর্মী অংশু ব্যানার্জী বললেন, 'কপালটা দেখবে খুব বড়।' বাস্, কর্মীরা এই পরিচয়টুকু নিয়েই প্রস্তুত হলেন তাকে হত্যা করতে।

প্রতিদিন কলকাতার ইডেন উদ্যানের পাশে বাবুঘাটে তিনি গঙ্গাস্নানে আসতেন। বিপ্লবী কর্মীরা এই সন্ধান পেয়েই দিন নির্দিষ্ট করে কাজে এগোলেন। একটি গামছার মধ্যে লুকানো রইলো রিভলবার। যথারীতি তাঁর ১৩৯১ নং গাড়ী করে তিনি স্নান করতে এলেন। কিন্তু সুচতুর গোয়েন্দা স্নানঘাটে এসে গাড়ী থেকে নামলেন না। দ্রুতবেগে গাড়ী নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি এমনই সতর্কতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন যে বিপ্লবীরা তাঁকে মারার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

সাহস, শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বসন্ত ঢেঁকি উচ্চ নেতৃত্বের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। জনাই, উত্তরপাড়া, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানের কর্মীদের সঙ্গে, ব্যাঁটরা কদমতলায় সুবোধ মুখার্জীর বাড়ীতে অবস্থিত সেন্টারের সঙ্গে, শরৎ চন্দ্র বসু, সন্তোষ মিত্র, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলাখ্যাত নারায়ণ দাস দে প্রমুখ উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বসন্ত ঢেঁকির যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জী বসন্তবাবুকে আত্মরক্ষার জন্য একটি মসার পিস্তল দিয়েছিলেন। তল্লাসীর পূর্বে অস্ত্র সরাবার জন্য এঁদের ডাক পড়তো। একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের আড্ডায় পুলিশ আসবে জানতে পেরেই ডোমজুড়ে খবর পৌঁছে গেল। বসন্ত ঢেঁকি পার্বতীপুরের সন্তোষ মুখার্জীকে নিয়ে ছুটলেন সেখানে। বোমা— রিভলবার প্রভৃতি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে এসে ডোমজুড়ে হাজির হলেন। [৮]

তথ্য সূত্রঃ

(১) দফরপুরের ভক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র ঘোষ কথিত বিবরণ অনুসারে লিখিত।

(২) ডোমজুড়ের বন্দরপল্লীর হৃষীকেশ দাস ও দক্ষিণ ঝাঁপড়দহের বিপ্লবী আশুতোষ (মহেশ্বর) ভট্টাচার্য কথিত বিবরণ অনুযায়ী লিখিত।

(৩) দক্ষিণ ঝাপড়দহের বিপ্লবী-নেতা আশুতোষ ভট্টাচার্য কথিত বিবরণ।

(৪) দক্ষিণ ঝাপড়দার স্বাধীনতা সংগ্রামী- শ্যামাপদ রায় কথিত বিবরণ।

(৫) পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ (বলাই) চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।

(৬) দক্ষিণ ঝাপড়দার শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় কথিত বিবরণ।

(৭) দক্ষিণঝাঁপড়দার আশুতোষ (মহেশ্বর) ভট্টাচার্য ও পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।

(৭ক) বলুহাটির স্বাধীনতা সংগ্রামী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রদত্ত তথ্য।

(৭খ) বলুহাটির স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধ মুখার্জী প্রদত্ত তথ্য।

(৮) বিপ্লবী বসন্ত ঢেঁকির দেওয়া বিবরণ।

—— o ——

আত্মগোপনকারী মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ডোমজুড়ের দু'টি পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এবং সেই সূত্রে যাতায়াতও ছিল। রাষ্ট্রদ্রোহকর কার্যকলাপের অভিযোগে পুলিশ যখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, বড় বড় রেল স্টেশনে ও জনসমাগমসম্পন্ন প্রধান

প্রধান স্থানে তাঁর নানা বেশের নানা আকৃতির ছবি টাঙিয়ে মোটা অক্ষরে পুরস্কারের ঘোষণা করে চলেছে, তখনও তিনি ডোমজুড়ের আত্মীয়দের বাড়ী এসেছেন। তাঁর পবিত্র স্পর্শে ডোমজুড়ের মাটি ধন্য হয়েছে, ধন্য হয়েছে আমাদের জেলা হাওড়া।

রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে মাতুলালয় পারালা বিঘাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিনোদবিহারী, মাতা ভুবনেশ্বরী। নিজ বাড়ী বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। বর্ধমানের বাড়ী ছেড়ে বিনোদবিহারী চন্দননগরের ফটকগোড়ায় বাস করতে থাকেন। বিনোদবিহারীর দুই সন্তান — পুত্র রাসবিহারী ও কন্যা সুশীলা। ন'বছর বয়সে সুশীলার বিবাহ হয় ডোমজুড় থানার কোলড়া গ্রামে সরকার বাড়ীতে। রাসবিহারীর বয়স তখন এগার।

চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজিয়েট স্কুলে রাসবিহারীর শিক্ষালাভ। সেখানেই বিপ্লবী চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে আসেন। চন্দননগর তখন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্টান্টের চাকরী পান। বহু বিপ্লবীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়। সারা ভারতের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার নেতৃত্বে আসেন — গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যাপক পরিচিতি ঘটে।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজকীয় ঘোষণার কৌশলে বঙ্গবিভাগ বাতিল করার ব্যবস্থা হয়। ঘোষণা করা হয় ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজকীয় দরবারের আয়োজন হলো। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে চড়ে সস্ত্রীক দিল্লী প্রবেশ করতে চললেন। সমারোহ দেখতে লোকে লোকারণ্য পুলিশ-মিলিটারিতে ছয়লাপ। নদীয়ার পোড়াগাছার বসন্ত বিশ্বাস একটি বাড়ীর উপরে ভীড়ে ঠাসা মহিলাদের মধ্যে থেকে মেয়ের ছদ্মবেশ পরে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা ফেললেন।[১]

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী দীননাথ তলোয়ার গ্রেপ্তার হয় এবং সর্বভারতীয় বিপ্লব পরিকল্পনায় রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বের কথা পুলিশকে জানায়। হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ষড়যন্ত্রের নায়কও যে রাসবিহারী পুলিশ তা-ও জানতে পারে। শুরু হলো রাসবিহারীকে খোঁজা। ১৯১৫-র ১১ই মে রাসবিহারীর চারসঙ্গীর— অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ, আমীরচাঁদ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হয়ে গেল। নায়ক রাসবিহারী ফেরার, কিন্তু দমলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী একযোগে সারাভারতবর্ষে সৈন্যবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে

পরিকল্পনা করেছিলেন, কৃপালক সিং- এর বিশ্বাসঘাতকতায় সে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য সর্বসমেত লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হলো।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে 'সানুকিমারু' নামক জাপানী জাহাজে পি.এন.টেগোর ছদ্মনামে রাসবিহারী জাপান যাত্রা করেন। তারই কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রার কথা প্রচারিত হয়েছিল। ভরতসরকার তাঁর নাম দেখে মনে করল তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও তাঁর জাপান সফরের ব্যবস্থা করতেই আগে রওনা হচ্ছেন। [২]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন প্রাচ্যে এসে পড়ল, রাসবিহারী গড়ে তুললেন আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ক্যাপটেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের সমর্থনে আজাদ হিন্দ্ সংঘ। দেশত্যাগী বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী থেকে আনিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন নিজের গড়া বাহিনীকে। সুভাষচন্দ্রকে আখ্যাত করলেন 'নেতাজী' রূপে। শুরু হলো 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর দিল্লী দখলের দৃপ্ত অভিযান—যার সূচনাকার ছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর একমাত্র ভগিনী সুশীলার বিবাহ হয়েছিল কোলড়ার সরকার বাড়িতে—এবিষয়টিকে আলোয় নিয়ে আসেন প্রথম সুসাহিত্যিক ও গবেষক শ্রদ্ধেয় নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' গ্রন্থে। সেই গ্রন্থের সূত্র ধরেই আন্দুল মৌড়ী ও কোলড়া গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গড়েতোলেন 'মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি'। সেই সমিতি কোলড়া গ্রামে ২৪শে ও ২৫শে মে ১৯৮৬-তে মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেন এবং তদুপলক্ষে যে 'স্মারকপত্র' প্রকাশ করেন তাতে উপরিলিখিত প্রসঙ্গ উল্লেখিত থাকে। সেই 'স্মারকপত্র'-এ শ্রী অসীম চট্টোপাধ্যায়ের 'রাসবিহারী বসু অশান্ত সৈনিক' নামক প্রবন্ধে লেখা থাকে,—

"১৯১৫ সালের মে মাসের প্রথম দিকে, সুশীলার সঙ্গে দেখা করতে সাইকেল চেপে কোলড়ায় এসেছিলেন রাসবিহারী। উচ্ছ্বসিত সুশীলা সেদিন নিজহাতে হরেক রান্না করেছিল দাদার জন্য। মন্মথ সরকার * আতিথ্যের ত্রুটি করেন নি। কিন্তু খেয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি দাদার। বাইরে অপেক্ষারত সঙ্গী খবর দিয়েছিল—পুলিশ আসছে। চলে গিয়েছিলেন রাসবিহারী। চোখের জলে ভেসে দাদার মঙ্গল কামনা করেছিল বিধবা বোন। খানিক পরেই এসেছিল পুলিশ বাহিনী। বাড়ি তছনছ করে ফিরে যেতে হয়েছিল তাদের শূন্য হাতেই।...সেরাত্রে কোলড়া ছেড়ে যেতে পারেন নি রাসবিহারী। বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। গিয়েছিলেন পরদিন ভোরবেলা।"

ডোমজুড় থানার কাটলিয়ার সিংহদের বাড়ি ছিল তাঁর সম্পর্কিত মামা বাড়ি। সেখানে আত্মগোপনকারী রাসবিহারী যে অন্ততঃ দুবার-এসেছিলেন সে প্রমাণ পাওয়া

যায়। প্রথম যেবার দিনের বেলা ছিলেন সেবার পুলিশ এসেছিল। কিন্তু রাসবিহারী বাড়ির মধ্যে থাকাকালীন পুলিশ ভিতরে ঢুকতে পারেনি। পাশের বোসেদের বাড়ি বিবাহিতা মাসিমা নিভাননী (স্বামী মন্মথ নাথ বোস) পুলিশকে জানান যে, ঘরে নারায়ণ পূজা হচ্ছে। পূজার অঙ্গ বিসাবে যথানিয়মে কাঁসরঘন্টা বাজে, মন্ত্রপাঠ হয়। নামাবলী গায়ে মুণ্ডিতমস্তক পুরোহিত শালগ্রাম নিয়ে চালপুঁটলিসহ মন্ত্রপাঠ করতে করতে চলেও যান। পুলিশ বাড়িতে ঢোকে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পায় না, অগত্যা হতাশ হয়ে চলে যেতে হয়।

পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পুরোহিতের বেশে যিনি চলে গেলেন, তিনিই রাসবিহারী।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এক রাতে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের বেশে মাথায় গামছা জড়িয়ে রাসবিহারী এসেছিলেন। স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ কথাবার্তায় রাতের কিছু সময় রইলেন, শুলেন—কিন্তু অতি ভোরে উঠেই রওনা দিলেন। চলে যাবার ব্যাপারটা শুধু জানলেন নিভাননী। এই আসা-যাওয়ার ব্যাপার পুলিশ কিছু টেরও পেলনা।[৩]

খ্যাতনামা বিপ্লবীদের মধ্যে একমাত্র বিরল ব্যতিক্রম রাসবিহারী—যাঁকে একদিনের জন্যেও ব্রিটিশরাজ হাজতে পুরতে পারেনি।

১৯৩৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী সুদূর জাপান থেকে সুশীলাকে চিঠি লিখেছেন রাসবিহারী ঃ

'স্নেহের সুশীলা, তোমার পত্র পাইলাম। টাকা পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া বেশী টাকা পাঠাইতে পারিলাম না। যখন পারিব পাঠাইব। এক সপ্তাহ পরে কিছু টাকা পাঠাইবার চেষ্টা কবিব। মাসীমার শরীর খারাপ জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। তিনি কেমন আছেন লিখিও এবং তাঁহাকে আমার প্রণাম দিও। তাঁহার সেবা খুব ভাল করিয়া করিও। চরকা ছাড়িও না।

ইতি
রাসবিহারী বসু।[৪]

সূত্র ঃ

(১) বিপ্লবীবাংলা--তারিণীশংকর চক্রবর্তী (পৃ:২৪) ও অন্যান্য পুস্তক।

(২) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (১ম খন্ড)-গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (পৃ:১১৮,১২৩,১৩০,১৩২, ১৩৩)

* সুশীলার দেবর।

(৩) কাটলিয়ায় রাসবিহারী বসুর আত্মগোপন অবস্থায় আসার বিষয়টি প্রথম আমাকে জানান কাটলিয়া নিবাসী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষ কুমার দাস মহাশয়। পরে (ইং) ১৯৮১ সালে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পত্নী অতিবৃদ্ধা মেনকা চৌধুরীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি এবং 'সান্ধ্য দৈনিক বিবরণ' পত্রিকায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া' শিরোনামের ধারাবাহিক প্রবন্ধে ১৯৮২ সালের ২৫শে ও২৬শে জুন প্রকাশ করি। পরে পূর্বোল্লিখিত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মারকপত্র'-এ 'কাটলিয়ার আত্মীয়বাড়িতে আত্মগোপনকারী রাসবিহারী' শিরোনামে রাসবিহারী সংক্রান্ত অংশটুকু পুনর্মুদ্রিত হয় — লেখক।

(৪) উক্ত 'স্মারকপত্র'-এ শ্রী অসীম চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রাসবিহারী বসু অশান্ত সৈনিক' প্রবন্ধ (১৮ পৃঃ)।

চট্টল বিদ্রোহীদের অস্ত্র কারখানা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল বিপ্লবী যোদ্ধা চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম বীর নায়ক অনন্তলাল সিংহ হাওড়ার শালকিয়া শহরেরই এক গোপন আশ্রয়ে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছিলেন। বিপ্লবীদের নিরাপদ গোপন আশ্রয় রূপেই বাড়িটি ব্যবহারের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে অনন্ত সিং কিভাবে এবং কেন এলেন, তার একটু পূর্ব-কথা বলা দরকার।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা দলের অর্থাভাব ঘোচাতে এ.বি. রেলওয়ের ওয়ার্কশপে হেড অফিস থেকে ফিটনগাড়ী করে বেতন দেবার জন্য টাকা যাবার সময় রাস্তায় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর প্রায় সতেরো হাজার টাকা ডাকাতি করেন। এই ডাকাতি সংঘটিত হয় অনন্ত সিং-এর নেতৃত্বে। ঘোড়ার গাড়ী থামাতে একটা সাইকেল ব্যবহার করতে হয়। সাইকেলটি চুরি করা সাইকেল। একজন তার ভাইঝির বিয়েতে সাইকেলটি দোকান থেকে ভাড়া করে। বিয়ের রাতে সেটি বিপ্লবীদেরই একবন্ধু বিপ্লবীদের প্রয়োজনে লাগানোর জন্য চুরি করে। তখন কিভাবে রটে যায় অনন্ত সিং-ই সাইকেলটি চুরি করেছেন।

এখন এই ডাকাতিতে ঐ সাইকেলটি ব্যবহারই শুধু হলোনা, রাস্তায় ফেলে রেখেও আসতে হলো। সুতরাং ডাকাতির সঙ্গে অনন্ত সিংহের নাম প্রাথমিকভাবে

জড়িয়ে যায় ঐ সাইকেল চুরির সঙ্গে তাঁর নাম পূর্ব থেকে জড়িয়ে থাকার কারণে।

টাকা নিয়ে তাঁরা ওঠেন বাহাদ্দার হাট বাজারের কাছে তাঁদের ভাড়া নেওয়া 'সুলুক বাহার' নামক বাড়িতে। এসেই টাকাটা কলকাতায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী কর্মী জুলুদা'র (নগেন্দ্রনাথ সেনের) কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। ডাকাতির দশদিনের দিন টাকার বৃহদংশ কলকাতায় দলীয় নেতার কাছে পৌঁছে যাবার খবর চট্টগ্রামে পৌঁছে যাবার পর যেদিন বিপ্লবীরা 'সুলুক বাহারে'র বাড়িটি ত্যাগ করবেন মনস্থ করেন, সেইদিনেই স্থানীয় দারোগা আবদুল মজিদ কয়েকজন চৌকিদার দফাদার নিয়ে ঐ বাড়িতে হঠাৎ যায়। এঁদের সশস্ত্র দেখে এবং চিনতে পেরে সে কার্যতঃ পালায় কিন্তু চৌকিদার ও দফাদারদের পাহারায় রেখে যায়, তারা 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলে খবরাখবর করতে থাকলে ঐ বাড়ির সামনে বিরাট জনতা জমে ওঠে।

'সুলুক বাহার' বাড়িতে তখন ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, খোকা (দেবেন দে—পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী), উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস। সমবেত জনতা ওদের তাড়া করে। ওঁরা ফাঁকা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যেতে থাকেন। হাট মাঠ পেরিয়ে প্রায় ১৪ মাইল হেঁটে 'নাগারখানা' পাহাড়ে আশ্রয় নেন। পুলিশের সাথে গুলী বিনিময় হয়, পুলিশ পাহাড়টা প্রায় ঘিরে ফেলে। মাস্টারদা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, রাজেন দাস পটাসিয়াম সায়ানাইড খান। উপেন ভট্টাচার্য, খোকা (দেবেন দে) ও অনন্ত সিং যখন কি করবেন ভেবে পাননা, এক রাখাল বালক গরু খুঁজতে খুঁজতে ওখানে এসে যায় এবং ওঁদের সাহায্য করে।

প্রায় সারারাত পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়ে ভোরে গ্রামের এক বৃদ্ধ কৃষকের সাহায্যে তাঁর বাড়িতে গোপনে তিনদিন থেকে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় নৌকায় সন্দীপ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, আবার স্টীমারে খুলনা, ট্রেনে শিয়ালদা এসে মানিকতলার বলদেও পাড়ায় বি. টি. ইনস্টিটিউশনের হোস্টেলে গণেশ ঘোষের কাছে, সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে কলকাতা পোর্টের কর্মচারী যশোদা পালের ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশান স্ট্রীটের বাড়িতে। সেখানে খবরের কাগজ পড়ে জানেন—মাস্টারদা সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েও মরেন নি, পুলিশ তাঁদের বন্দী করেছে। রাজেনও বেঁচে আছেন। ওখানেই শোনেন গণেশ ঘোষকে আই. বি. অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা তাঁর পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি। জুলুদার (নগেন্দ্রনাথ সেনের) কলকাতার ডাইং এণ্ড ক্লিনিংয়ের দোকান পুলিশ সার্চ করেছে, তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে হাওড়ায় বিপিন গাঙ্গুলীর এক গোপন আশ্রয়ে আছেন।

পলাতক অনন্ত সিং, খোকা (দেবেন দে) ও উপেন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে

যশোদা পাল হাওড়ার এই আশ্রয়ে জুলুদা'র কাছে আসেন। এই আশ্রয়ে বিপিন গাঙ্গুলী, গোপীনাথ সাহা (যিনি পরে টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশতঃ ডে-কে হত্যা করে ফাঁসিতে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন) ও জুলুদা থাকতেন। অনন্ত সিং তাঁদের কাছে ডাকাতি ও নাগারখানা পাহাড়ের যুদ্ধ ও ওখান থেকে পালিয়ে আসার সবিস্তার বর্ণনা দেন।

জুলুদা'র ধারণা হয় রাখাল ছেলের সহায়তা দান, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তীর বাঁচা ও অনন্তবাবুদের পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের দৈবশক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, জুলুদা পণ্ডিচেরী যেতে চাইলেন। পণ্ডিচেরীতে এসে অরবিন্দ দৈবশক্তি প্রয়োগ করেন নি জানলেন এবং তিনি ওদের নির্দেশ পাঠালেন দ্রুত পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে যেতে। এঁরা দক্ষিণভারত ও পুরীর মন্দির দেখে এঁদের হাওড়ার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার পথে ট্রেনে শুনলেন টেগার্ট-ভ্রমে ডে-কে হত্যা করে গোপীনাথ সাহা গ্রেপ্তার হয়েছে।

হাওড়ার আশ্রয়টি ছিল হরিনারায়ণ চন্দ্রের আশ্রয়। অনন্ত সিং, খোকা (দেবেন দে)-রা আসার পর বিপিন গাঙ্গুলী ওখানে আর থাকতেন না। হরিদা এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। জুলুদা ও খোকা উত্তর ভারত বেড়াতে চলে গেলেন।

অনন্ত সিংহের লেখায়,—

"বাঁধাঘাট শালকিয়া থেকে প্রায় চার মাইল দূরে বুন কোম্পানীর ইঁটখোলার কাছে একটা একতলা বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। বাড়ীটি ভাঙাচোরা, বহুদিনের পরিত্যক্ত। বিরাট কম্পাউণ্ডের ভেতরে সামনের দিকে মাত্র চারখানা ঘর। তারই মধ্যে খান দুয়েক একটু বাসোপযোগী করে নিয়ে আমি রইলাম। একেবারে একা থাকতাম, নিজে রান্না করে খেতাম। আমার সঙ্গী ছিল একটি রিভলবার এবং দেয়ালের গায়ে বড় দেখে একটি কালীমূর্তি।...

"সারাদিন কাজও কম করতে হোত না। অন্যদের অনুপস্থিতিতে আমি একা কাজ করবার মত ছোট একটি কারখানা বানিয়ে ফেললাম—যেমন নাকি ইছাপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার কারখানায় ছিল ড্রিলিং যন্ত্র, লোহা কাটার করাত...ইত্যাদি। বোমার স্ট্রাইকার বানাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত এখানে। হরিদা আমার কাজে সাহায্য করতেন। তাঁর কাছ থেকে ঢালাই লোহার ছাঁচ এনে, সাইকেলের ঘন্টার স্প্রিং এবং সরু লোহার শিক কিনে স্ট্রাইকার বানাবার চেষ্টা করছিলাম। অনেকবার পরীক্ষা করবার পর বোমার খোলের উপরে পার্কাশন ক্যাপ এঁটে রাখবার উপযোগী এক ধরণের ক্লিপ তৈরি করি। এমন ধরণের স্ট্রাইকার আবিষ্কার করা হ'ল

ক্যাপে যার আঘাতে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তার সাহায্যে বোমা ফাটানো যায়।

"ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন—আমি, গণেশ, প্রেমানন্দ আর যশোদা পাল একসাথে মিলে আমাদের বিপ্লবী প্রোগ্রাম রচনায় মন দিলাম। আমাদের এই কয়জনের গোপন বৈঠকের কথা জুলুদা, হরিদা এবং বিপিন দা জানতেন না। তখন বিপ্লবীদের মধ্যে এরকম গোপনীয়তা চলত, হয়ত প্রয়োজনও ছিল।...

"....গণেশ বোমার জন্য ঢালাই লোহার খোল বানাবার চেষ্টা করছিল। তার চেষ্টাও সার্থক হল। এবার চাই বারুদ। প্রেমানন্দকে চট্টগ্রামে পাঠানো হ'ল। আমার দাদা নন্দলাল সিং-এর সহায়তায় সে একমন বারুদ যোগাড় করল। সেই বারুদ কলকাতায় এল রেলওয়ে পার্শেলে এবং প্রেমানন্দ সেই বারুদ এনে দিল আমাদের।

"আমি মাঝে মাঝে প্রেমানন্দকে আমার গোপন বাসস্থানে নিয়ে আসতাম। বাড়াটি এত গলি- ঘুঁজির মধ্যে যে সে নিজে পথ চিনে আসতে পারত না। সাধারণতঃ বাঁধাঘাটে দুজনের দেখা হোত। প্রয়োজন হলে সেখান থেকে ওকে আমি আমার গোপন আশ্রয়ে নিয়ে আসতাম। এখানে বসে মন খুলে কথাবার্তা বলে ভবিষ্যৎ কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চলত। গণেশ আর যশোদার সঙ্গেও নিয়মিত দেখা হোত আমার। আমরা চারজনেই যেন একটা গ্রুপ তৈরি করে আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চালাতে লাগলাম।"

একপর একদিন সকালে শালকিয়ার বাঁধাঘাটে অনন্ত সিং মুসলমানের ছদ্মবেশে বড়বাজারে হরিনারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পথে আই.বি.সাব-ইনস্‌পেক্টর প্রফুল্ল রায়ের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। তারপর চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে মামলার পর মামলা। সে অন্য কথা। [১]

সূত্রঃ

(১) অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (১ম খন্ড) অনন্ত সিং (৩য়, ৪র্থ ও৫ম অধ্যায়)।

মির্জাপুর বোমার মামলায়

কলকাতার শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসে হত্যাকান্ডের পর সন্তোষ মিত্র প্রমুখের বিচার হয় ও তাঁদের অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই সময় খবর ছড়ায় যে, সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা শিশির ঘোষ নামের একটি ছেলে সেন্ট্রাল আই. বি-র লোক। সে 'এজেন্ট প্রোভোকেটর'-এর দায়িত্ব নিয়েছে এবং এজন্য সে সরকারের টাকায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটি খদ্দরের কাপড়ের দোকান খুলেছে। দলের ছেলেদের সেই দোকানে আকৃষ্ট করে গোপন তথ্য জেনে নিচ্ছে এবং সরকারকে জানাচ্ছে। সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হলেন মলঙ্গা লেন নিবাসী বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জী। অনুসন্ধানে বিপ্লবীরা আরও জানলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক থেকে ভারতীয় বিপ্লবী সিপাহীদের জন্য কিছু অস্ত্র পশ্চিম সীমান্তে পাঠানো হয়। সেখানে বিপ্লব সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় সেই অস্ত্র অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়। শিশির ঘোষ ছিলেন সেই অস্ত্রের সন্ধানে রত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের নিযুক্ত ঝানু কর্মচারী। সে বিপ্লবী কর্মীদের কাছে টোপ দিত যে, সে সেই সীমান্তের লুকানো অস্ত্র তাদের পাইয়ে দেবে। এই সব তথ্য জেনে অনকূলবাবু শিশির ঘোষকে সরাবার জন্য হরিনারায়ণ চন্দ্রকে বলেন। হরিনারায়ণবাবু শান্তি চক্রবর্তী ও বসন্ত ঢেঁকিকে এই দায়িত্ব দেন।[১]

১৯২৪ সালের জন্মাষ্টমীর দিন শিশির ঘোষের দোকানের কিছু দূরে পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্যাক্সি থেকে নামেন বসন্ত ঢেঁকি ও শান্তি চক্রবর্তী। শান্তি বসন্তকে একটি বোমা দেন। বসন্তবাবুর বোমা ছোঁড়ার ভাল অভ্যাস ছিল। শিশিরও তাঁর গোয়েন্দা সহকর্মী প্রকাশ বণিক তখন দোকানের ভিতর বসে ছিল। ওদের কোন রকম সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই বসন্তবাবু বোমাটি শিশিরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন। বোমাটি শিশিরের কোলের উপর পড়তেই সে মুহূর্তের মধ্যে কাপড় ঝেড়ে বোমাটি আরেক দিকে ছিটকে ফেলে দিয়েই বাইরে বেরিয়ে আসে। যেদিকে শিশির বোমাটি ছুঁড়েফেলে সেদিকেই ছিল প্রকাশ বণিক। বোমাটি বিকট শব্দে ফাটে এবং প্রকাশ মারা যায়। বসন্তবাবু ও শান্তিবাবু দৌড়ে আপেক্ষমান ট্যাক্সির কাছে ফিরে আসেন। পূর্বপরিকল্পনা মাফিক বসন্তবাবু ড্রাইভারকে ঠেলে নামিয়ে দেন। শান্তিবাবুর ড্রাইভিং জানা ছিল। তিনি গাড়ী স্টার্ট দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু গাড়ী স্টার্ট নেয় না। ইতোমধ্যে জনতা 'খুন' 'খুন' বলে চিৎকার করে ট্যাক্সির কাছে ধেয়ে আসে। নিরুপায় ভাবে বসন্তবাবু ও শান্তিবাবু ধরা পড়েন।[২] যে বোমাটি ছোঁড়া হয়েছিল সেটি ছিল নতুন কাস্ট আয়রণ সেলের, এতে গান

কটন দেওয়া থাকত। এসিডের ফোঁটাতেই কাজ হত। বোমাটি ছোঁড়বার পূর্বে বসন্তবাবু বেশী এসিড ঢেলে ফেলেছিলেন। ফলে কয়েক সেকেন্ডেই বোমাটি ফেটে যায়। আসাম বেঙ্গল রেল ডাকাতিতে বিপ্লবীরা যে টাকা পেয়েছিলেন, তাই দিয়েই এই বোমার মডেল তৈরী হয়েছিল এবং মীর্জাপুর স্ট্রীটেই প্রথম সেই মডেলের প্রকাশ্য ব্যবহার হয়।[৩] পরে পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় যে বোমাটি বত্রিশ টুকরো হয়ে ফেটেছিল। এই বোমা নিক্ষেপের পর থেকে বিপ্লবীরা আর উক্ত শিশির ঘোষের কোন সন্ধান পাননি।

বসন্তবাবুদের গ্রেপ্তার করে মুচিপাড়া থানায় আনা হয়। থানার দারোগা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে ওঁরা স্বীকার করেন যে, ওঁরা 'বোমা নিক্ষেপ' করেছেন। কিন্তু দারোগা ডায়েরীতে লেখেন যে, 'রিভলবার থেকে গুলি নিক্ষেপ' করা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট থানায় আসেন। এসেই তিনি মুখে কিছু না বলে বসন্তবাবুর পাটা তুলে দেখলেন। কি দেখলেন, তা তিনিই জানেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করেন, "Have you murdered the fellow?" উত্তরে বসন্তবাবু- বললেন, 'Yes, I have murdered a watcher. What's of that? Am I a coward?' উত্তর শুনে বিশালবপু টেগার্ট একটু নড়ে ওঠেন। কলকাতার একখানি ইংরাজী দৈনিকে এই বিবরণ বিশেষ প্রধান্য দিয়ে ছাপা হয়েছিল।[৪]

বোমা ফেলবার সময় বসন্তবাবুর ডান হাতটা বেশী এসিড ঢালার জন্য পুড়ে গিয়েছিল। মুচিপাড়া থানা থেকে ওঁদের মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। বসন্তবাবু ডাক্তারকে এসিডে হাত পুরে যাবার কথা বলেন, কিন্তু ডাক্তার লেখেন পুলিশের অত্যাচারের ফলেই হাতের ঐ রকম দশা হয়েছে।

সেখান থেকে ওঁদের লালবাজার থানায় আনা হয়। অফিসারের পর অফিসার এসে ক্রমাগত ওঁদের প্রশ্ন করে চলেন। কিন্তু ওঁরা কারোর নাম বলেন না। লালবাজার লক আপ থেকে বসন্তবাবুকে স্বীকারোক্তি গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট (Confessing Magistrate) মি. আমেদ-এর কাছে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-কক্ষের সকলকে বাইরে বের করে দিয়ে বসন্তবাবুকে বলেন, 'দেখুন আপনার কেস হাইকোর্টে হবে। আপনাকে দু-ঘন্টা সময় দিচ্ছি আপনি ভেবে দেখুন।' উত্তরে বসন্তবাবু বলেন, 'আপনার কোর্টে যখন এ মামলা হবে না, তখন যা বলবার হাইকোর্টেই বলব।' ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করেন 'এতবড় Well organised Government-কে আপনারা কিভাবে হঠাবেন?' উত্তরে বসন্তবাবু বললেন, 'আমরাও Well organised !' ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'Session-এ আমি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব।'

সেশানে মামলা চলবার সময় সাক্ষ্য দিতে উঠে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, 'বসন্তবাবু আমায় কোন কথাই বলেন নি। আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না।' আশ্চর্য!

দারোগা 'বোমা নিক্ষেপের' ঘটনাকে চেপে দিয়ে লিখলেন 'রিভলবারের গুলি নিক্ষেপ' ডাক্তারবাবু এসিডে হাত পোড়ার ঘটনাকে ঘুরিয়ে লিখলেন 'পুলিশের অত্যাচার' আর স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অতগুলো কথাকে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে সাক্ষ্য দিলেন 'উনি আমায় কিছু বলেন নি।' ঐ থেকেই বোঝা যায়, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের আগুন সেই অগ্নিযুগে কি দারুণ ভাবেই না স্বদেশবাসীর হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল।

সুভাষচন্দ্র বসুব অনুরোধে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের পৌত্র ব্যারিস্টার সুনন্দ সেন আদালতে বসন্ত বাবুর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। মামলায় সাক্ষীর সংখ্যা ছিল শতাধিক। সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সুনন্দ সেন সওয়াল করে যেতেন। তাঁর পরামর্শমত বসন্তবাবু ভারতীয় জুরি দিয়ে বিচারের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। মিঃ সারওয়ার্দির এজলাসে এই মামলা চলেছিল। জুরিদের মধ্যে ৭জন বাঙ্গালী ও দু-জন ইংরেজ ছিলেন। এই মামলায় ব্যাবিস্টার সুনন্দ সেন ও এটর্নি দিলীপ চক্রবর্তী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

রায়ের দিন ৭ জন বাঙ্গালী জুরি নির্দোষ বলেন আর ২ জন ইংরেজ জুরি দোষী বলেন। জজ কালো কোর্ট গায়ে দিয়ে —মনে হয়, চরমদণ্ড দেবার জন্য এসেছিলেন। জুরিদের কথা শুনে তিনি পুনর্বিচারের নির্দেশ দিলেন। বসন্তবাবুকে আবার জেল হাজতে চলে যেতে হোল।

উল্লেখযোগ্য যে, আদালতের এই পুনর্বিচারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুলসী গোঁসাই লণ্ডনের 'প্রিভি কাউন্সিলে' বসন্তবাবুর পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন।

জাষ্টিস চারুচন্দ্র ঘোষের এজলাসে পুনর্বিচারের মামলা ওঠে। সেইদিন জজ রায় দিয়ে বেকসুর মুক্তির আদেশ দেন। মুক্তি পেয়ে বসন্তবাবু স্বগ্রামে ফিরে আসেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বসন্তবাবুর মামলা দেখাশুনার বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছিলেন দক্ষিণ ঝাপড়দার বিপ্লবী সংগ্রামী ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী।

বসন্তবাবুকে ২৪ ঘন্টা স্বগৃহে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সর্বদা পুলিশ তাঁকে পাহারা দিত। কয়েকদিন পরে পরে থানায় ডাকা হোত। প্রায়ই আই.বি.ইন্সপেক্টর যামিনী বাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তথাপি এত সতর্কতার মধ্যেও একদিন সাইকেলে করে বসন্তবাবু পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে দেখা করে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন।

এই মামলায় পুলিশ যে কত ধূর্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় আদালতে দাখিল করা একটি ফটোতে। বোমা তৈরী করে পরীক্ষার জন্য ওঁরা যে দক্ষিণ ঝাপড়দার মাঠের মধ্যে অবস্থিত অশ্বত্থ গাছের নীচে গিয়ে বসতেন ফটোতে ছিল তারই প্রমাণ। সেই ফটোয় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বসন্ত কুমার ঢেঁকি, জীবন কৃষ্ণ

ব্যানার্জী প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। কর্মীদের আলোচনার সময় বাঁধের উপর দিয়ে চলমান একটি পাল্কী থেকে পুলিশ এই ফটো তুলেছিল।[৫]

১৯২৪ সালে বসন্ত ঢেঁকিকে স্ব-গৃহে অন্তরীণ করার পরেই নানা স্থানের কর্মীদের উপর পুলিশের হয়রানি শুরু হয়। বসন্ত ঢেঁকির বোমার মামলার পূর্ব পর্যন্ত পুলিশ ডোমজুড়ের বিপ্লবী কর্মীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিবহাল ছিল না। প্রায় ৯ বছর আগে দফরপুরে ডাকাতি মামলা হয়েছিল। বিপ্লবী প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেছে এই ছিল কর্তৃপক্ষের ধারণা। কিন্তু এবার বসন্তবাবুর ঘটনা ঘটতেই ওরা বুঝল, বসন্তবাবুর বেশ ভাল দল আছে, তাই তারা চারিদিকে নজর রাখার জন্য উঠে পড়ে লাগল। দফরপুরে গোয়েন্দা ক্যাম্প বসলো। কেন্দ্রীয় আই বি ভূজেন সরকার প্রায়ই পার্বতীপুরে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। এখানকার জন্য আশু বোস নামে একজন আই বি ইনচার্জ এলেন। যুবকদের উপর সন্দেহ হলেই গোয়েন্দা দপ্তরে ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে লাগল। পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে ইলিসিয়াম রো-তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দফরপুরের দুলাল কর্মকারের বাড়ী পুলিশ সার্চ করে। দুলালবাবুকে একটি মসার পিস্তল মেরামত করতে দেওয়া হয়েছিল। এইটি দিতে গিয়েছিলেন বসন্তবাবু ও আশুবাবু। এরা পিস্তলটি পেয়েছিলেন কলকাতার মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখার্জীর কাছ থেকে। কিন্তু পুলিশ দুলালবাবুর বাড়ী থেকে কিছুই পায় না। কারণ, তার আগেই বসন্তবাবু পিস্তলটি নিয়ে এসেছিলেন।[৬]

সূত্র

---

(১) বিপ্লবীর সাধনা — (১ম খন্ড) ঃ হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃঃ ৯০-৯১)।
(২) বিপ্লবী বসন্ত ঢেঁকির কথিত বিবরণ।
(৩) বিপ্লবীর সাধনা — (১ম খন্ড) ঃ হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃঃ- ৯১)।
(৪) কাটলিয়ার ডাঃ সন্তোষকুমার দাস প্রদত্ত বিবরণ।
(৫) বিপ্লবী বসন্ত ঢেঁকি মহাশয় প্রদত্ত তথ্য।
(৬) বিপ্লবী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ও বিপ্লবী উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য।

— o —

বিপ্লব-আন্দোলনে আন্দুল-মৌড়ী

সাইমন আসার সংবাদে সারা দেশময় বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ঝোড়হাটের তুলসী ঘোষকে ডেকে আন্দুল-মৌড়ীর ছাত্ররা একটা ছোট ঘরের মধ্যে সভা করে। 'গ্রাম্য ছাত্র সংঘ' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ওখানে চরকা কাটা হোত, কলকাতা থেকে এই সময় গরম গরম কাগজ বের হোত—সেই সব কাগজ আনিয়ে পড়া হোত। ঝোড়হাটের অধ্যাপক বিপিন ঘোষ, মৌড়ীর তারাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি এক একজন মহাপুরুষের জীবনী বিষয়ে ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রাখতেন। এতে ছাত্র-যুবকরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। মৌড়ীর পঞ্চু চক্রবর্তীর কাছ থেকে একটা ছোট জমি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে চাষ হোত।

১৯২৮ সালের ২১ শে জুলাই উত্তর মৌড়ীর খটি অঞ্চলে 'আন্দুল মৌড়ী যুব সংঘ' স্থাপিত হয়। সেইসময় সন্ত্রাস মুলক বিপ্লববাদীরা বিভিন্ন জায়গায় যুব সংঘ তৈরী করতেন। এই যুব সংঘ স্থাপন উপলক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম খটিতে আসেন। এরপর তিনি বহুবার এ অঞ্চলে এসেছেন এবং কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

এখানকার যুবকদের সঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীরও যোগাযোগ ছিল। 'আন্দুল-মৌড়ী যুব সংঘে'র সভাপতি হয়েছিলেন বিপ্রন্নপাড়া গ্রামের বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক হন উত্তর মৌড়ীর ডাঃ ললিত মোহন চক্রবর্তী। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্বকথিত দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী উনসানি গ্রামের নারায়ণদাস দে। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মন্মথ নাথ হালদার, ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ পাল, ক্ষেত্রমোহন পাল, হরেকৃষ্ণ দাস ঘোষ, দুইল্যা গ্রামের ব্যবসায়ী দাশরথি মান্না প্রভৃতি। তরুণদের মধ্য থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তুলসীচরণ ঘোষ, নীরদবরণ ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী, হরিগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, পাঁচুগোপাল তরফদার, রেবতীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার ইন্দুভূষণ দাস, দেবীপদ চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রসাদচন্দ্র ঘোষ, জয়কেশ মুখার্জী প্রভৃতি।

পরবর্তী কালের প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আব্দুল মোমিন এবং শালকিয়া নিবাসী প্রখ্যাত ফ্রেসকো চিত্রশিল্পী দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় জড়িত সুধাংশু চৌধুরীও এই যুব সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'আন্দুল-মৌড়ী যুব সংঘে'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন ভবদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

জগদীশ চক্রবর্তী ছিলেন দুইল্যা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর সঙ্গে হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির যোগ ছিল। এই সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের সংগঠক ছিলেন হাওড়ার শিবপুরের জীবন মাইতি। জীবনবাবু প্রায়ই দুইল্যা গ্রামে আসতেন। সেই সুযোগে জগদীশবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং জগদীশ বাবু ঐ সংগঠনে যুক্ত থেকে স্থানীয় যুবকদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজনে 'আন্দুল মৌড়ী যুব সংঘ'-এর সঙ্গে যোগ রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট হন ও দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মনোনীত গ্রাম প্রধান হন।

দক্ষিণ ঝাঁপড়দার বিপ্লবী ধীরেন মুখার্জীর আত্মগোপন করে থাকার সময়ে যখন লিভার পাকে (Liver abcess) তখন তিনি চিকিৎসার জন্য মৌড়ীর ডাক্তার ললিত চক্রবর্তীর বাড়ী এসে থাকেন। তাঁর চিকিৎসা করেন ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ এবং তিনি আরোগ্য লাভ করে অন্যত্র চলে যান। এই চিকিৎসা উপলক্ষেই জয়কেশ মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে উভয়ের এই পরিচয় নিবিড় আত্মীয়তাসুলভ সম্পর্কে পরিণত হয়।

ডাক্তার তিনকড়ি ঘোষ অতিগোপনে ধীরেন বাবুর চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি এতদঞ্চলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তিনিই পরে ঝোড়হাটে প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিপ্রন্নপাড়ার বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় চাকরী করতেন। তখন উনসানী নামে স্টেশন ছিল। তিনি সকালে উনসানি স্টেশনে যাবার পথে ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর ডিসপেনসারি হয়ে যেতেন। ওখানেই হ্যারিকেন রেখে যেতেন, রাত্রে আবার ডিসপেনসারিতে বসে গল্প গুজব সেরে হ্যারিকেন জ্বেলে বাড়ী ফিরতেন। আন্দুল-মৌড়ী যুব সংঙ্ঘের অন্যতম উদ্যোক্তা মন্মথ হালদারের বাড়ী ছিল প্রশস্থ গ্রামে। তিনিও ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর ডিসপেনসারিতে চাকরীতে যাওয়া আসার পথে বিপিনবাবুর মত বসতেন। এঁদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে এঁরা সাহায্যও করেছেন যথেষ্ট। উভয়েই বিপ্লবীদের বোমা ও বোমার সরঞ্জামাদি লুকিয়ে রাখতেন। দুইল্যা গ্রামের ব্যবসায়ী ছিলেন দাশরথি মান্না। তিনি সন্ত্রাসমূলক বিপ্লববাদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অকাতরে অর্থ দান করতেন। কামরাঙ্গু গ্রামের (ঝোড়হাট) আর একজন ব্যবসায়ী দুর্লভ মালও অবিশ্বাস্যভাবে অর্থদান করতেন। সাধারণে সে সব কথা জানতো না আর জানলেও কেউ একথা বিশ্বাসও করতে পারত না। ডাক্তার ললিত মোহন চক্রবর্তী ছিলেন ঐ অঞ্চলের বিপ্লবী যুবকদের দাদা। ১৯২০ খ্রীঃ থেকেই তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনের সংযোগ স্থাপিত হয়। তাঁর ডিসপেনসারিতেই কর্মীরা অবাধে যোগাযোগ রাখতে পারতেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি সর্বদাই কর্মীদের উদারভাবে

দেখাশুনা করতেন। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে দক্ষিণ ঝাঁপড়দার বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর তিনমাস ধরে অমন কঠিন ব্যাধির চিকিৎসাও হতে পারত না।

ললিতবাবুর একটা সুবিধা ছিল— খুবই নিরিবিলি জায়গায় তাঁর ডাক্তারখানা ছিল। তিনি ছেলেদের সব সময়ই প্রেরণা দিতেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপে ছেলেদের আকৃষ্ট করতে গেলে যা যা দরকার, তা তিনি দিতেন। আত্মরক্ষার জন্য এবং শরীর ভাল করার জন্য লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, স্কিপিং প্রভৃতিতে তিনি উৎসাহ দিতেন। ছেলেরাও শরীর চর্চায় মনোযোগ দিতে লাগলো।

এই প্রসঙ্গে একজনের কথা বলা দরকার। তাঁর নাম মিহিরলাল। তিনি ছিলেন জাতিতে ডোম। 'আন্দুল মৌড়ী যুব সঙ্ঘ' গঠন ও তার স্থায়িত্ব রক্ষায় মিহিরলালের অবদান অসামান্য। চাবুকের মত শরীর ছিল তাঁর। তিনি নিরলসভাবে ডাক্তার ললিত চক্রবর্তীর সেবা করতেন। প্রয়োজনের সময় ছায়ার মত তাঁর পিছে পিছে ঘুরতেন। এই মিহিরলাল ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাতেন। এঁর কাছে আন্দুল পূর্বপাড়ার ইন্দুভূষণ দাশ, মৌড়ী চক্রবর্তী পাড়ার পাঁচুগোপাল তরফদার, মৌড়ী মজুমদারপাড়ার প্রসাদ ঘোষ, মৌড়ী রায় পাড়ার গোপাল চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্লববাদী যুবকরা দক্ষতার সঙ্গে লাঠিখেলা আয়ত্ত করেন, লাঠিখেলার সময় ললিতবাবু নিজে উপস্থিত থাকতেন।

খটির মোড়ে ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর ডিসপেনসারির সামনে 'আন্দুল-মৌড়ী যুবক সঙ্ঘ'—এর উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রীঃ একবার ভারত মাতার পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে চণ্ডী থেকে উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতটি গাওয়া হয়। গানটি নীচে তুলে দিলাম ঃ

"মা যায় যেন জীবন চলে
তোমার কাজে তোমার মাঝে
বন্দেমাতরম্ বলে।
লাল টুপি কি কালো কোর্তা
জুজুর ভয় কি আর চলে
মোরা মায়ের সেবায় রইবো রত
পাশব বলের দীপ জ্বেলে।"

'ভারতমাতা' পূজার দিনে সারা সময়টা ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এবং ডাঃ ললিত মোহন চক্রবর্তী ওখানে উপস্থিত ছিলেন। 'আন্দুল-মৌড়ী যুব সংঘের' কিছু কর্মীর সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা 'শ্রী সংঘের' কর্মীদের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগ স্থাপন করেন নিউ আন্দুল এইচ সি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিগোপাল

ভট্টাচার্য্য মশাই। তাঁর সঙ্গে 'আন্দুল-মৌড়ী যুব সংঘ'-এর যোগ ছিল। তিনি আন্দুল পূর্ব পাড়ায় থাকতেন। 'শ্রী সংঘ'-এর সঙ্গে মৌড়ীর রায়পাড়ার গোপাল চক্রবর্তী, মৌড়ী চক্রবর্তী পাড়ার পাঁচুগোপাল তরফদার প্রভৃতি কর্মীর যোগাযোগ ঘটে। গোপালবাবু ও পাঁচুগোপালবাবু অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। ঢাকার শ্রীসংঘ এবং বি ভি (বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার) এক সঙ্গেই কাজ করত। শ্রীসংঘের লীলা নাগ (রায়), ডঃ ভূপেন দত্ত তখন প্রায়ই এখানে আসতেন। তাঁর সঙ্গে শ্রী সংঘ-এর যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু দাদা হিসাবে তিনি সব দলেই থাকতেন। তিনি গোপাল চক্রবর্তীর রায়পাড়ার বাড়ীতে (বাড়িটি ১৯৪২ খ্রীঃ জুন মাসে করুণা তরফদার কিনে নেন) আসতেন।

আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার ধোঁকা ঃ

এই সময় কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য এখানকার কর্মীরা চেষ্টা করতে থাকেন। ফুলেশ্বর স্টেশনের কাছে কালসাপা ব্রিজের পাশে টেরোরিস্টদের একটা আড্ডা ছিল। ওখানে আজাদ নামে এক যুবক ছিলেন। তাঁব সঙ্গে মৌড়ী মজুমদারপাড়ার প্রসাদ ঘোষের যোগাযোগ হয়। প্রসাদবাবু লাঠি খেলতেন (আগেই বলেছি) এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। আজাদ প্রসাদবাবুকে রিভলবার সরবরাহ করবে বলে কথা দেয়। আন্দুল স্টেশনের পাশে নির্দিষ্ট দিন গোপাল চক্রবর্তী উপস্থিত হন। গোপালবাবুও খুবই বলশালী এবং দারুণ সাহসী ছিলেন। একটি যুবক একটি প্যাকেট হাতে নিয়ে গোপালবাবুর কাছে আসে। পূর্ব কথামত গোপালবাবুকে দেয়। শীতের সন্ধ্যা, যুবকটি গোপালবাবুকে বলে যে, তার খুবই শীত করছে। প্যাকেটটি পেয়ে গোপালবাবু স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত হন এবং নিজের গায়ের শালটি তাকে দিয়ে দেন। শালটি ছিল গোপালবাবুর মায়ের। বাড়ী এসে গোপালবাবু প্যাকেট খুলে দেখেন তাতে রয়েছে একটি থান ইঁট। অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে এই প্রতারণার কথা তিনি বললেন। সকলেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ঠিক হোল ছদ্মবেশে ওদের দুজনকে পাকড়াও করতে হবে। তারপর গোপালবাবু চাপদাড়ী পরে দিনের পর দিন ঐ দুজন প্রতারকের সন্ধানে ঘুরেছেন। কিন্তু কোনদিনই ওদের কাউকে দেখতে পাননি। দলের প্রসাদবাবুও আজাদকে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। এই ভাবে প্রতারিত হবার জন্য এই কর্মীদের মনস্তাপের অন্ত ছিল না।

আব্দুল মোমিন সাঁতরাগাছিতে স্কাউট মাস্টার ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল নদীয়ায়। তাঁর বাবা রাজমিস্ত্রী ছিলেন। মোমিন ব্রজেন পাল (বি.এন.পাল)—এর সান্নিধ্যে এসে লেখাপড়া শেখেন। এককথায় ব্রজেন পালই তাঁকে মানুষ করেন। ব্রজেন পাল কাঠের কারবারী ছিলেন। শালকিয়ায় তাঁর গোলা ছিল। কাঠের কারবারের জন্য তিনি আন্দুল-মৌড়ীতে প্রায়ই আসতেন। তিনি খুব উদার চেতা ছিলেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শে

বিশ্বাসী ছিলেন।

ময়ূরভঞ্জে ব্রজেনবাবুর জমিজমা ছিল এবং সেখান থেকে কাঠ এনে শালকিয়া, আন্দুল-মৌড়ী প্রভৃতি স্থানে বিক্রি করতেন। আব্দুল মোমিনকে তিনিই সাঁতরাগাছিতে একটা স্কুল মাস্টারী দেন। মোমিন নন্‌ম্যাট্রিক হওয়া সত্ত্বেও মাস্টারি পান।

তিনি সাঁতরাগাছিতে স্কাউট দল গড়েন এবং ব্রজেন পালের সঙ্গে যাওয়া আসা করায় আন্দুলেও পরিচিত হন এবং এখানে 'তরুণ সংঘ' নামে একটি ক্লাব খোলেন। এতে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক যোগ দেন। সেখানে তিনি ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, প্যারেড- করা প্রভৃতি শেখাতেন। এইভাবে যুবকদের একটা অংশ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। আন্দুলের অধ্যাপক বিপিন ঘোষও স্কাউট মাষ্টার ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও মোমিনের যোগাযোগ হয়। ঝোড়হাটের তুলসী ঘোষও 'তরুণ সঙ্ঘে' যোগ দেন। জয়কেশ মুখার্জী স্কাউট দলে থাকায় আব্দুল মোমিন ও অধ্যাপক বিপিন ঘোষের সঙ্গেও তাঁর আলাপ পরিচয় হয়।

আব্দুল মোমিনের সঙ্গে গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মীদেরও ঘনিষ্ঠতা হয়। এতদঞ্চলে বিশেষতঃ উনসানি গ্রামের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে যুব কর্মীদের টানা যাচ্ছে না—এই বিষয়ে আব্দুল মোমিন, গোপাল চক্রবর্তী, প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির মধ্যে একটা আলোচনা হয়। স্থির হয়, কাজী নজরুল ইসলামকে এনে মুসলমান এলাকায় একটি সভা করা হবে।

মৌলবাদের আঘাতে নজরুল ঃ

মোমিন কাজী নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সভার দিন ঠিক করলেন। এটা ১৯২৯ সালের ঘটনা। সভাস্থলে আগে থেকেই উদ্যোগী বিপ্লবী কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে বেলাবেলি আব্দুল মোমিন কাজী নজরুল ইসলামকে উনসানি (বর্তমান মৌড়ীগ্রাম) পর্যন্ত ট্রেনে এনে বাকীটা পাল্কীতে চাপিয়ে নিয়ে এলেন। নজরুলকে দেখার জন্য ভীড় উপচে পড়লো। উদ্বোধনী সঙ্গীত, মাল্যদান, সভাপতি বরণ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হয়ে যাবার পর মোমিন অল্প কথায় কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয় দিলেন। কাজী সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠলেন। দুচার কথা বলার পর তিনি বললেন, "বড় জটা, রুদ্রাক্ষ রাখলে যেমন সত্যকার সাধু হওয়া যায় না, তেমনই মুসলমানদের নূর রাখলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না।"

—একথা শুনেই ওখানে সমবেত হাজী সাহেবরা হৈ হৈ করে উঠলেন তাঁদের অনুগামী জোয়ান যারা তারাও রুখে এল। তুমুল হট্টগোল বেধে গেল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রসাদ ঘোষ ছিলেন খুব শক্তিশালী লোক। তিনি একাই ১০/২০ জনের মহড়া নিতে পারতেন; গোপাল চক্রবর্তীও খুব তেজী লোক ছিলেন। এঁদের পক্ষে ওখানকার কিছু মুসলমানও ছিলেন। তাঁরা নজরুলের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালে, সভা ভন্ডুল হয়ে গেল। রবিয়াল মল্লিক ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী। তিনি এবং তাঁর কিছু অনুগামী বিপ্লবী যুবকদের পক্ষে ছিলেন।

তাঁরা কবিকে সভাস্থল থেকে সরিয়ে এনে রবিয়াল মল্লিকের বাড়ীতে তুললেন।

রবিয়াল সাহেবের বাড়ীর দোতলায় 'রক্তকমল' নাটকের উদ্বোধনী রিহার্সলি হবার কথা ছিল। কবি সেটা উদ্বোধন করবেন কথা ছিল, কিন্তু উনি রবিয়াল সাহেবের নীচের তলার ঘরেই বসে রইলেন। উপরে গেলেন না। লোকের অনুরোধে তিনি এখানে বসেই গান গাইতে লাগলেন। এখানে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি

'কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী, এ কোন্ সোনার গাঁয়।'

সেদিন কথা ছিল কবি এসে গোপাল চক্রবর্তীর বাড়ী খাবেন।

গোপাল বাবুর মা বারবার ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু কবি নজরুল এলেন না, খেলেন না। গোপালবাবুর সেজ কাকা ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। তিনি প্রায়ই কবির সম্বন্ধে বলতেন, 'ফকির আমার ইয়ার।' তিনিও কবিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কবি এলেন না। গান সমাপ্ত হতেই তিনি পাল্কীতে গিয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর কর্মীরা নিরুপায় হয়ে কবিকে স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। সেদিন অভুক্ত অবস্থায় কবির চলে যাওয়ায় গোপালবাবুর মা থেকে পরিবারস্থ সকলে এবং কর্মীদের সকলে নিদারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। *

* মৌড়ীর গোপাল চক্রবর্তী ও ডোমজুড়ের জযকেশ মুখার্জীর কাছ থেকে শোনা ঘটনা।

দায়িত্ব বহনে নির্ভীকতা

১৯২৪ সালের জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটে শিশির ঘোষের কাপড়ের দোকানে বোমা ফেলার উদ্দেশ্যই ছিল শিশির ঘোষকে শেষ করা। স্বদেশী কাপড় বেচাব অছিলায় সে বিপ্লবীদের কাছ থেকে খবর বের করে পুলিশকে দিত। স্বদেশী কাপড়ের দোকানদার হিসাবে বিপ্লবীরা তাকে নিজের লোক বলে মনে করত। তার এই গুপ্তচর বৃত্তির সংবাদ বিপ্লবী কর্মীরা অল্পদিনেই জানতে পারলেন। বোমা মেরে তাকে শেষ করবার দায়িত্ব পড়লো পার্বতীপুরের বসন্ত ঢেঁকি ও কলকাতার শান্তি চক্রবর্ত্তীর উপর। এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

ঘটনার দিন বিকালে বসন্তবাবু হাওড়ার রামকেষ্টপুরের ৩২ নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেনে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে বেশ খোলা মনেই তাস খেললেন। কেউ ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনের খবর টের পেলেন না। বাসাটি ছিল পার্বতীপুরেরই অন্যতম বিপ্লবী কর্মী উমাপ্রসাদ (বলাই) চট্টোপাধ্যায়ের। উমাপ্রসাদবাবুও কিছু বুঝতে পারেন নি।

নির্ধারিত সময়ে বসন্তবাবু ও শান্তিবাবু বোমা ফেললেন। বোমাটি দিয়েছিলেন অংশু ব্যানার্জী। দোকানের কর্মচারী প্রকাশ বণিক নিহত হোল, শিশির ঘোষ দ্রুত পালিয়ে প্রাণে বাঁচলো। বোমা ছুঁড়ে বসন্তবাবুরা পালাতে পারলেন না, লোকে ধরে ফেললো। পরে মুচিপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করে আনলো এবং খুনের মামলা রুজু করে দিল।

পরের দিন সকালের খবরের কাগজে সংবাদটি বেরুল। যাঁরা বসন্তবাবুকে চিনতেন তাঁরা তো খবর পড়ে অবাক। একি কান্ড! কিন্তু যাঁরা বিপ্লবীদের চিনতেন তাঁদের বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। এঁরা যে কত সাহসী, কতখানি ঝুঁকি যে এঁরা নিতে পারতেন, দু-একটা ঘটনা বললেই বোঝা যাবে,—

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে একদিন সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জী ও বসন্তবাবু কলকাতা থেকে কয়েকটি তাজাবোমা নিয়ে বউবাজার স্ট্রীট (বর্তমানের বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) ধরে লালবাজার থানার সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। উদ্দেশ্য, হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের তেলকলঘাট স্টেশনে (তখন বার্ণ কোম্পানীর পাশে তেলকলঘাট রেল স্টেশন ছিল— বঙ্গবাসী সিনেমার সামনে দিয়ে লাইন পাতা ছিল) ট্রেন ধরবেন। দুজনে লালবাজার থানার সামনে আসতেই একটু থমকে দাঁড়িয়ে বসন্তবাবু ধীরেনবাবুকে বললেন, "দাদা এইখানে দিয়ে যাই একটা ফেলে!" — কথাটা শুনে বিপ্লবী ভাইয়ের অসীম সাহসে মুগ্ধ হয়ে আনন্দে ধীরেনবাবু

তাঁকে, "বললি কিরে ভাই!" বলেই জড়িয়ে ধরলেন। একে লালবাজার থানা, সারা বাংলার ত্রাস পুলিশ কমিশনার টেগার্টের হেড্কোয়ার্টার, নিঃসন্দেহে সন্ধ্যাবেলা চারিদিকে গোয়েন্দা গুপ্তচর গিজগিজ্ করছে, সেইখানেই থলে ভর্তি বোমা নিয়ে বোমা ফেলার প্রস্তাব। এ প্রস্তাব যিনি করেন, তাঁর যেমন সাহসের তুলনা হয় না, তেমনই যিনি সে প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে না গিয়ে আনন্দে প্রস্তাবককে জড়িয়ে ধরেন — তাঁরও সাহসের তুলনা হয় না। আজ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে দিনের বিপ্লবীপন্থায় বিশ্বাসী যুবকদের অন্তরে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে, পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে সুতীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চিত হয়েছিল, তাই তাদের জাগিয়েছিল অপরিমেয় সাহস ও মানসিক শক্তি। সেই কারণেই, লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে বোমা নিক্ষেপের মত দুঃসাহসিক প্রস্তাবের বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই যে কোন সম্ভাব্য পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

যাই হোক, দুজনেই হেসে চলতে শুরু করলেন, অঘটন কিছু ঘটল না। সেই রাত্রে হেঁটে হেঁটে তাঁরা বড়বাজারে দক্ষিণ ঝাপড়দহের ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (পিতা বিরাজ মোহন ঘোষ)-এর দোকানে এলেন। ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের ৫২নং রাজাকাটরায় দোকান ছিল এবং স্ট্র্যান্ড রোডে বাসা ছিল। ডোমজুড়ের বিপ্লবী কর্মীরা কলকাতায় গিয়ে রাত্রিবাসের সাময়িক আশ্রয় হিসাবে এই বাসায় থাকতেন। ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের বদান্যতায় আহারও সেখানে পাওয়া যেত। এঁরা দুজনে অতরাত্রে ট্রেনে করে আসবেন, আবার সঙ্গে বোমা আছে শুনে— ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ তাঁদের আসতে নিষেধ করলেন। কারণ,পথে পুলিশের ঝামেলা হতে পারে। অগত্যা ওঁরা ওখানে রয়ে গেলেন।

রাত্রে শোবার সময় ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ বোমার পুঁটলিটা নিজের মাথার কাছে নিয়ে শুলেন। বলা যায় না—রাতে পুলিশ আসতে পারে। এঁরা দুজন যেহেতু পালাবার মত পথঘাট জানেন না বা বোমাগুলি কোথায় লুকোতে হবে তাও বুঝবেননা—সুতরাং নিজের কাছে বোমাগুলি রাখা সুবিবেচনার কাজ বলে তিনি মনে করলেন। ভাবতে অবাক লাগে, তেজস্ক্রিয় বোমার ব্যাগটি মাথার কাছে নিয়ে সেদিন শুয়ে ছিলেন যিনি, তিনি কিন্তু প্রকাশ্য বিপ্লবীকর্মী নন। তিনি গৃহী এবং ব্যবসায়ী। একজন গৃহী ও ব্যবসায়ী হিসাবে বিরাট দায়িত্ব তিনি সেদিন বহন করেছিলেন। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়— বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি টান, কতখানি স্বদেশপ্রেম থাকলে তবে একজন সংসারী এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এমন ঝুঁকি নিতে পারেন।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মীদের সাহায্যে যারাই এসেছেন এমন কত ঝুঁকি, কত দায়িত্বই না তাঁদের বহন করতে হয়েছে। প্রকাশ্য কর্মী নন্, অথচ গোপনে দায়িত্ব বহনে পিছপাও হচ্ছেন না এরকম আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ-

১৯২৪ সালের শেষের দিকে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন

'রেড বেঙ্গল লিফ্‌লেট' প্রকাশ করেন। তখন বসন্তবাবু গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। কিন্তু ডোমজুড়ের কর্মীরা পিছিয়ে ছিলেন না। এই 'লিফ্‌লেট' কোনও প্রেসে ছাপানো হোতনা, জার্মানী থেকে আনা হ্যাণ্ড মেশিনে টাইপ করা হোত। স্বাভাবিকভাবে তার ভাষা হোত ইংরাজী। সেই লিফ্‌লেটে বক্তব্য থাকত যে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের ক্ষমা করা হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পুলিশের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। হ্যাণ্ডবিলগুলো ডোমজুড়ে নিয়ে আসতেন দক্ষিণ ঝাঁপড়দহের আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (মহেশ্বর বাবু)। তিনি ও পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (বলাই) দুজনে মিলে ব্যাঁটরার সুবোধ মুখার্জীর বাড়ীতে বসে ঠিকানা লিখে কলকাতায় জেনারেল পোস্টাপিস থেকে ডাক মারফৎ বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। এই সুবোধবাবু ছিলেন সরকারী চাকুরে, তিনি নিজেই তাঁর বাড়ীতে বিপ্লবী কর্মীদের একটি কেন্দ্র খুলতে দিয়েছিলেন। গোটা পরিবারটিই ছিলেন বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ। কতখানি স্বাধীনতাপ্রেমী হলে তবে এ রকম ঝুঁকি নিয়ে নিজের বাড়ীতে কর্মীদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া যায়।

ডাক মারফৎ যে সব ঠিকানায় চিঠি দেওয়া হোত, তা দলের ছেলেরা আগেই সংগ্রহ করে আনতেন। কে কোথা থেকে দিচ্ছে, এসব বোঝবার উপায় থাকতো না। যে সব বাড়ীতে 'লিফলেট' গুলি পৌঁছালে দলের উপকার হবে, কর্মী ও সমর্থক সংগৃহীত হবে, আশ্রয়হিসাবে ভবিষ্যতে বাড়ীটি পাওয়া যাবে সেই সব বাড়িতে 'লিফলেট' দেওয়া হোত। আবার বিপরীতভাবে— ভয় পাবে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে না— এরকম ঠিকানাতেও 'লিফলেট' পাঠানো হোত। দলের অন্যতম নেতৃস্থানীয় কর্মী কলকাতার ৬০ নং মলঙ্গা লেনের অনুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বড় বড় অফিস বাড়ীর উপর থেকে এইগুলি বিলি করার প্রস্তাব দেন। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ই,আই, আর বিল্ডিং থেকে ডালহৌসীর দিকে এবং এলবার্ট হল থেকে কলেজস্ট্রীটের দিকে বিলি করেন দক্ষিণ ঝাপড়দহের আশুতোষ ভট্টাচার্য (মহেশ্বরবাবু) এবং বিভিন্ন কলেজে কলেজে দেওয়ালে সেঁটে দেবার ব্যবস্থা করেন পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (বলাইবাবু)। [১]

হাওড়ায় হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের যে ইউনিট ছিল তার সদস্যারা (বলাই সিংহ প্রমুখ) একাজে সাহায্য করতেন। [২]

সূত্রঃ

(১) পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।

(২) দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য কথিত বিবরণ।

—— ০

ডিউকস্কুলের সনৎবাবু

ডোমজুড়ের বিপ্লব আন্দোলনের অকুতোভয় প্রেরণাদাতা ও সংগঠক ছিলেন ঝাপড়দহ ডিউক স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক সনৎকুমার সিংহ এবং গোষ্ঠবিহারী মুখার্জী। গোষ্ঠবাবু ছিলেন পার্বতীপুরের অধিবাসী কিন্তু সনৎবাবু যে প্রকৃত কোথাকার লোক ছিলেন তা কেউ জানতেন না, তিনি জানাতেন ও না। ১৯২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস (সম্রাট পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র) কলকাতায় আসেন। ব্রিটিশ রাজের প্রতি বিক্ষোভ দেখাবার জন্য কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হলো। ঝাপড়দা ডিউক স্কুলেও সেদিন ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটের পিছনে সংগ্রামী শিক্ষকদের সমর্থন ছিল। [১]

মির্জাপুর স্ট্রীট বোমার মামলায় ঝাপড়দা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র বসন্ত ঢেঁকি আসামী হওয়াতেই পুলিশের নজর বিপ্লবান্দোলনের সংগঠকদের উপর পড়ে। নানারকম খোঁজ খবর নেবার জন্য ডোমজুড় স্টেশনের (পূর্বতন মার্টিন রেলস্টেশনের) প্রায় সামনাসামনি, একটু পশ্চিমদিকে একটি আই.বি.ক্যাম্প বসে। পুলিশ যতই গোপন করুক, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। ডোমজুড় বাজারে অধরচন্দ্র আশের বাড়িতে (এখন যে বাড়িতে আফিংয়ের দোকান) ডাঃ নলিনীমোহন চ্যাটার্জীর ডিসপেনসারি ছিল। তিনি বিপ্লবান্দ্যোলনকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করতেন। তাঁর ডিসপেনসারিতে ওষুধ যেমন থাকতো তেমনই ওষুধ আনার অছিলায় বোমা তৈরীর কেমিক্যালসও আসতো। ডাক্তারবাবুর জ্ঞাতসারেই এসব ঘটতো এবং তাঁর কম্পাউণ্ডার দক্ষিণঝাপড়দার কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সে সব নিরাপদ গোপনস্থানে রেখে দিতেন। আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নলিনীবাবু এখানে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন তেমন সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন।

নলিনীবাবুর ডিসপেনসারিতে প্রায়ই সন্ধ্যায় তাসের আড্ডা বসতো। তাস খেলতে আসতেন সাব-রেজিস্ট্রার শৈলেনবাবু, আবগারী ইনস্‌পেকটর কিরণবাবু, ঝাপড়দা স্কুলের সনৎবাবু প্রভৃতি। একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারিতে উদয় হলো একজন আই.বি-র। তাঁর গালে ছিল একটা কাটা দাগ। তিনি সনৎবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য সনৎবাবু সবেমাত্র ঘরে ঢুকে তক্তাপোশে উঠে দাঁড়ানোমাত্রই যেই বলেছেন, 'কি মাস্টারমশাই, তাস খেলতে এসেছেন?' সঙ্গে সঙ্গে আই.বি.পুঙ্গবটির গালে সপাটে একটি চড় কষালেন সনৎবাবু। তৎক্ষণাৎ তার চোঁ-চাঁ দৌড়।

আই.বি.র নজর এইবার পড়ল ঐ ডিসপেনসারির উপর। হঠাৎ একদিন বিকালে ডাক্তার বাবুর দাদা উপেনবাবু খবর পাঠালেন ডিসপেনসারিতে সার্চ হবে। উপেনবাবুর

সঙ্গে লালবাজারের এক উর্ধতন-কর্তার আলাপ ছিল, সেই সূত্রেই এই সংবাদ প্রাপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে কর্মীদের কাছে সংবাদ দেওয়া হোল। কিন্তু রাশিকৃত বোমার খোল আর গাদাগাদা কেমিক্যালস্ বাইরে পাঠানো তখন যায় না। বাইরে গুপ্তচর গোয়েন্দার ছড়াছড়ি। স্বাভাবিক ধারণা, পুলিশ নিশ্চয়ই গভীর রাত্রে আসবে। তাই ব্যস্ত না হয়ে রোগী দেখা, তাস খেলা যথারীতি সমাপ্ত করে সকলে চলে গেলেন। কম্পাউণ্ডার কালীকৃষ্ণবাবু বারুইপাড়ার দুখীরামকে নিয়ে সমস্ত মাল দুটো বাক্সয় পুরে সরিয়ে রাখলেন অধরবাবুর বাড়ীর পিছনে পাহাড় প্রমাণ নারকেল ছোবার গাদার ভিতরে। দু-ঘন্টা ধরে দুজন লোকের পরিশ্রমের ফলে জিনিসগুলো লুকোনো হোল। আশেপাশের কেউ কিছু টের পেলেন না। প্রতিদিনের মত কালীকৃষ্ণবাবু খেয়ে-দেয়ে ডিসপেনসারিতে শুলেন। দুখীরাম শুতে গেল তার নিজের ডেরায় আর এক দোকানে। ভোর চারটা নাগাদ অধরবাবু এসে কালীকৃষ্ণবাবুকে ডেকে বললেন, 'কি ব্যাপার বলো দেখি, চারদিক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ!' সত্যিই তাই। সারা বাড়ীটা ঘিরেছে পুলিশ। যথারীতি তল্লাসী চলল। কিন্তু তারা কিছুইপেল না। পরে বোমা তৈরীর ঐ সমস্ত মাল মশলা নিরাপদে অন্যান্য গুপ্তস্থানে পাচার হয়ে যায়। [২]

বসন্তবাবুর কার্যকলাপের পশ্চাতে যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সনৎকুমার সিংহ এবং গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় মশাইদের প্রেরণা আছে, এটা পুলিশ সহজেই বুঝতে পারে এবং প্রধান শিক্ষক সতীশচন্দ্র ঘোষ মশাইয়ের উপর চাপ পড়তে থাকে। ফলে, প্রধান শিক্ষক মশাইকে বাধ্য হয়েই সনৎবাবু ও গোষ্ঠবাবুকে বিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাতে হয় এবং বিদ্যালয়ের স্বার্থে চাকুরী ত্যাগের প্রস্তাব আসামাত্রই কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সনৎবাবু ও গোষ্ঠবাবু চাকুরী ত্যাগে সম্মত হন। তাঁরা এমন সহজভাবে জিনিষটি নিলেন যে, যেন এমনটি হবে বলেই তারা জানতেন এবং এর জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আদর্শ সেদিন তাঁদের কাছে প্রধান বিষয় ছিল, অর্থোপার্জন নয়। দেশপ্রেমের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য চাকুরী ত্যাগের আহ্বানকে তাঁরা কত সহজ ভাবেই না নিতে পেরেছিলেন।

— আজ স্বাধীনোত্তর দেশে এরকম দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে কি? বিদ্যালয় থেকে সনৎবাবু যেদিন চলে যান— স্কুলের ফটক পর্যন্ত সতীশবাবু ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ আসেন এগিয়ে। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে এই স্বার্থত্যাগী চলমান বিপ্লবী শিক্ষকের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন সনৎবাবুকে আর দেখা গেল না, তখন সখেদে সতীশবাবু বললেন, 'The School looks poor to-day.' [৩]

স্থানীয় অধিবাসীগণ ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ সনৎবাবুর বিদায়সভার আয়োজন করেছিলেন। ইংরাজশাসকের রোষের ভয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় ভবনে

সভানুষ্ঠান হতে দেননি। ঝাপড়দহ বাজারে সেই সভা হয়েছিল। জনসমাগম হয়েছিল প্রচুর। সেই সভায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবেগদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন সনৎবাবু। শ্রোতৃবৃন্দও সেদিন সেই ভাষণ শুনে অশ্রুমোচন না করে পারেন নি! পরাধীন ভারতের একজন স্বাধীনতাকামী শিক্ষকযোদ্ধার প্রতি ডোমজুড়বাসী সেদিন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্পণ করেছিলেন। সেই সভায় দক্ষিণ ঝাঁপড়দহের অরবিন্দ কর্মকার (দে) একটি স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন! ডাঃ নলিনী চট্টোপাধ্যায় সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বসু এবং স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক গার্ডেনার সেই সভার বক্তা ছিলেন।[৪]

অরবিন্দবাবু কৃতী ছাত্র ছিলেন। রাজরোষে পড়লে তাঁর ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারতো। কিন্তু সেদিন এইসব অসমসাহসী কিশোররা সেকথা ভাবতেনই না। সেদিন তাঁরা নেতাদেব কাছ থেকে যে উপদেশ পেতেন তা অরবিন্দবাবুর কথাতেই বলছি — "Don't be nervous Keep your countenance normal. So that nobody can ascertain that something is going in your mind."

বিদ্যালয়ের চাকুরীত্যাগের পর গোষ্ঠবাবু হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে তাঁব দাদা অটলবাবুর বাসায় থাকতেন। ঐখানেই ১৪নং ঈশ্বর দত্ত লেনে বিপ্লবান্দোলনের অন্যতম কর্মী পার্বতীপুরের সন্তোষ মুখার্জী ও রামকেষ্টপুরের ৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেনে পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় থাকতেন। উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় ওঁরা, দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিবপুরের জীবন মাইতি, তাঁর এক সঙ্গী পাচা (ভাল নাম নির্মল), অগম দত্ত, অমৃতলাল পাইন লেনের গণেশ মিত্র প্রভৃতির নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে।[৫]

সনৎবাবু বিদ্যালয়ের চাকুরী ছেড়ে কলকাতার বাগবাজারে 'কাশিমবাজার পলিটেকনিক হাইস্কুলে' শিক্ষকতা করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ডোমজুড়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে চাকুরী গ্রহণের সূত্রে অনেকের ধারণা জন্মায় যে তিনি মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজাদের দানেই ঐ বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। সনৎবাবুর অন্যতম প্রিয় ও কৃতীছাত্র (উল্লিখিত অরবিন্দবাবুর সহপাঠী) মাকড়দার ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন যে, সনৎবাবু আসলে ছিলেন বর্ধমানের লোক। যেখানকারই তিনি অধিবাসী হোন, ছাত্র ও বিপ্লবী যুবকদের চিত্তে তিনি চিরশ্রদ্ধার আসনেই অধিষ্ঠিত রয়ে গেলেন। বিদ্যা ও বিক্রমের সার্থক সমন্বয়ে গঠিত যথার্থ শিক্ষক ছিলেন সনৎবাবু।

সূত্র ঃ

(১) তদানীন্তন কালে ঝাপড়দা স্কুলের অন্যতম সেরা ছাত্র মাকড়দা'র ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ।

(২) দক্ষিণ ঝাপড়দার কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।
(৩) ঝাপড়দহ স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সাতকড়ি ভট্টাচার্য কথিত বিবরণ।
(৪) কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কথিত।
(৫) পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথিত বিবরণ।

—— o ——

বিপ্লবী কর্মোদ্যোগে শালকিয়া

১৯১৫-র ৪ঠা আগষ্ট শালকিয়ার ডোমপাড়াতে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র অতুল ঘোষ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা আত্মগোপন ক'রে থাকা কালে পুলিশ একদিন রাতে বাড়ী ঘেরাও ক'রে তল্লাসী করতে শুরু করে। অতুল ঘোষ সেখানে তখন ছিলেন না। অন্য একজন ফেরারী ধরা পড়েন। হেড কনস্টেবলকে গুলি করে তিনি পালাচ্ছিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর অতুল ঘোষের এক আত্মীয়ের মৃতদেহ একটি ট্রাঙ্কে পাওয়া যায়। সে পুলিশকে খবর দিত ব'লে সন্দেহ করা হ'ত। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে এটা আছে। ['বাংলার বিপ্লব সাধনা'- পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ ১৯১)]।

হাওড়ায় অগ্নিযুগের গোড়ার দিনগুলিতে বিপ্লবীদের যাঁরা সংগঠিত করে ছিলেন বিজন ব্যানার্জী (পিতা -হেরম্ব ব্যানার্জী) ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। হেরম্ববাবু হাওড়া কোর্টের উকিল ছিলেন। ওনাদের বাড়ী ছিল বাবুডাঙ্গায়। বাবার মৃত্যুর পর বিজনবাবু বালিতে বাড়ী করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে বিজনবাবু ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। কলকাতার বউবাজারে এঁদের একটা ছোট ছাপাখানা ছিল, বাবার আর্থিক অবস্থাও খুব ভাল ছিল। তাই ওনাকে বেশি কিছু করতে হতোনা। একসময় ওঁরা কলকাতায় থাকতেন। তখনই বিজনবাবুর সঙ্গে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পবিচয় হয়।

বিজনবাবু প্রত্যহ গঙ্গায় বাঁডুজ্যে ঘাটে স্নান করতে যেতেন। পাড়ার বহু ছেলেই স্নান করতে যায়, সাঁতার দেয়, খেলা করে। একদিন বিজনবাবু ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'কি করো তুমি?' ছেলেটি উত্তর দিল 'Short hand শিখি'। 'আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' 'কেন?' 'কথা আছে, যেওনা!' — এই কথা বলে ঠিকানা দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে চললো নিয়মিত যোগাযোগ, নিয়মিত আলোচনা। গঙ্গার ঘাটে যে ছেলেটিকে সেদিন বিজনবাবু সংগ্রহ করলেন--- সেই ছেলেটিই অগ্নিযুগে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বিখ্যাত আসামী বীরেন ব্যানার্জী। পরবর্তী কালে ইনি বিধানসভার কমিউনিস্ট দলের ডেপুটি লীডারও হয়েছিলেন। বীরেনবাবু যখন

বিজনবাবুর সান্নিধ্যে আসেন তখন তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সর্টহ্যাণ্ড শিখছেন।

বিজনবাবু একে একে সংগঠিত করতে থাকেন শালকিয়ার তেজস্বী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ যুবকদের। ওনার সান্নিধ্যে আসেন সুধাংশু চৌধুরী (পিতা নিকুঞ্জ চৌধুরী), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (পিতা সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য), সন্তোষ গাঙ্গুলী, সতীশ ঢ্যাং, গৌর দাস, লক্ষ্মী ঘোষ প্রভৃতি এবং এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যথাসাধ্য এবং যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

সুধাংশু চৌধুরী ছিলেন আর্টিস্ট। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনি খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সুধাংশুবাবুদের বাড়ীটায় আগ্নেয়াস্ত্র জমা রাখা হোত। ওনাদের বাড়িতে ঐসব রাখার সুবিধাও ছিল খুব। গলি দিয়ে ঢুকে মুহূর্তে বাড়ীর মধ্যে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া যেত। ওনার বাড়ীর সকলেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। বাবা নিকুঞ্জবাবু নির্বিবাদী লোক ছিলেন। কে এলো, কে গেলো খবরই রাখতেন না। মা এবং বিলা ও নীলা নামের দুই বোন ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীলা, অস্ত্রাদি যেমন রাখতেন, তেমনই খবরাখবর দেওয়া নেওয়াতেও সাহায্য করতেন। বিজনবাবু উত্তরপাড়ার অধিবাসী বিশিষ্ট শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়কেও অগ্নিযুগের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। বেঙ্গল ক্রিমিনাল এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টে তিনিও বেশ কিছুদিন জেলে ছিলেন।[১]

শালকিয়ার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলের ডোমপাড়া লেনে (বর্তমানে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেনে) তারিণী ঘোষের বাড়িটি ছিল বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র। এই বাড়িটিতে বাঘাযতীন, বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীরা আসতেন এবং থাকতেন। এই বাড়িটি ছিল একতলা। এই বাড়িটির পাশেই ছিল অধর কুণ্ডুর দোতলা বাড়ি। ১৯১৬ সালের এক রাতে পুলিশ বাবুডাঙ্গা রোড, বাঁড়ুজ্যে ঘাট ও হালদার পার্কের (তখন হালদার পুকুর) কাছে এসে এমন ভাবে ব্যূহ রচনা করে যাতে কেউ পালাতে না পারে। কুণ্ডুবাড়ির দরজা ভেঙে পুলিশ ঢোকে। অধরবাবু ও তার শ্যালককে প্রহার করতে থাকে এবং বিপ্লবীরা কোথায় জিজ্ঞাসা করতে থাকে। পাশের তারিণী ঘোষের বাড়িতে বিপ্লবীরা ছিলেন। তাঁরা সতর্ক হয়ে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় করতে থাকেন। এখান থেকে কয়েকজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন।

ফরিদপুরের বিপ্লবী নরেন সাহা নস্করপাড়া রোডের একটি দেয়াশলাই কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ বিজনবাবুর বিপ্লবী কার্যকলাপ টের পায় ও অনুসন্ধানে আসে। বিজনবাবু আত্মগোপন করে বালিতে ধোপা পাড়ায় দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। পরে গ্রেপ্তার হন ও দু বছরের সাজা হয়। এ সব ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা।

বিপিন গাঙ্গুলীর 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শাখা শালকিয়ায় স্থাপিত হয়। ১৯২১-২২ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাবুডাঙ্গার অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তাতে যুক্ত ছিলেন উপেন চৌধুরী, সতীশ ঢ্যাং, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, সুধাংশু চৌধুরী, গৌর দাস, জীতেন চ্যাটার্জী, ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা। আসলে এটি ছিল একটি বিপ্লবী যোগাযোগের কেন্দ্র। অচিরে এই শালকিয়া 'আত্মোন্নতি সমিতি'র কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে বালি, উত্তরপাড়া, ডোমজুড়, জনাই, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবী যুবকদের। যুক্ত হন শালকিয়ার লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, ডোমজুড়ের গোষ্ঠ মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধীরেন মুখার্জী, বসন্ত ঢেঁকি, বালি-উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবীরা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরে স্টলকার্ট লেনে উঠে আসে। পরিচালনার দায়িত্ব নেন ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী, ডাঃ জীবানন্দ মুখার্জী ও বিজয় মুখার্জী।

শালকিয়ার 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শাখার উপর এক হাজার বোমার খোল তৈরী করার দায়িত্ব পড়ে। চুঁচুড়ার বিপ্লবী কর্মী হরিনারায়ণ চন্দ্র বোমা তৈরীর ফরমূলা দেন। তাঁর আবিষ্কৃত টি. এন. টি. (Tri-Nitro-Toluene) ফরমুলাটি খুবই কার্যকরী ছিল। সেই অনুযায়ী বোমা তৈরী হবে স্থির হয়। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শালকিয়া শাখার সদস্য লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় কাজ করতেন। তাঁরা দায়িত্ব নিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ বিশিষ্ট 'টার্ণার' ছিলেন। জি. টি. রোডের সত্য কুণ্ডুর Salkia Industrial Co. কারখানাতেও কিছু কাজ হয়। বোমা তৈরী হলে সেগুলি গুপ্তভাবে রাখার দায়িত্ব নেন সতীশচন্দ্র ঢ্যাং ও গৌরচন্দ্র দাস। সেগুলি রাখা হয় শালকিয়ার হাজরা বাড়িতে ও জগবন্ধু ঘোষের বাড়িতে। খোলগুলির কিছু কিছু ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, কলকাতা, মধ্য হাওড়াতে বিপ্লবী কর্মীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকিগুলি শালকিয়ায় থাকে। পরে মির্জাপুর বোমার মামলায় শালকিয়ায় তৈরী বোমা ব্যবহার করা হয়। এই বোমা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের সময়ও ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ শালকিয়া বোমার মামলা রুজু করে। সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, গৌরচন্দ্র দাস গ্রেপ্তার হন ও পাঁচবছর করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিজন ব্যানার্জী আত্মগোপন করে থাকেন।

পার্বতীপুরের বিপ্লবীকর্মী উমাপ্রসাদ চ্যাটার্জী (বলাইবাবু)-র মামা সন্তোষ মুখার্জীর বাড়ি পার্বতীপুরে। তিনিও বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, থাকতেন হাওড়ার ১৪নং ঈশ্বরদত্ত লেনে। উমাপ্রসাদবাবু থাকতেন রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেনে। পার্বতীপুরের অন্যতম বিপ্লবী কর্মী ঝাপড়দার ডিউক স্কুলের পদত্যাগী শিক্ষক

গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় থাকতেন বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে। এঁদের যোগাযোগ খুব নিবিড় ছিল।

১৯২৭ সালে সন্তোষ বাবুর বাড়ি সার্চ করে পুলিশ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের দাবী' উপন্যাসখানি পায়। 'পথেরদাবী' তখন ব্রিটিশ রাজরোষে নিষিদ্ধ পুস্তক রূপে গণ্য। পুলিশ সন্তোষবাবুকে গ্রেপ্তার করে এবং শালকিয়া বোমার মামলায় জড়িয়ে দিতে চায়। আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে তিনি ছাড়া পান। সন্তোষবাবু হাওড়া মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

'বিজন ব্যানার্জী পালিয়ে থাকায় লক্ষ্মী ঘোষের নেতৃত্বে সালকিয়া গোষ্ঠী, সন্তোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে ডোমজুড় গোষ্ঠীও কিছু কম যায় নি। ১৯২৭-এর ১৩ই জানুয়ারী বিজন ব্যানার্জী ধরা পড়ে যান, সঙ্গে পাওয়া যায় অতুল দত্ত ও প্রসাদ চ্যাটার্জীকে.....। বিজন ব্যানার্জী ধরা পড়ায় বারানসীর ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ভার নিয়ে বাঙলায় আসেন এবং ছিন্ন সূত্রগুলি জোড়া লাগাবার চেষ্টা করেন।' [বাংলার বিপ্লবসাধনা ঃ পুলকেশ দেসরকার (পৃ ঃ১৪৮)]

শালকিয়ার বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে উত্তরপাড়ার চ্যাটার্জী পরিবারের বিপ্লবী যুবকদের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রধানত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন শালকিয়ার সুধাংশু চৌধুরী এবং উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী। উভয়েই একদিকে যেমন বিজন ব্যানার্জীর কাছ থেকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে আর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল উত্তরপাড়ার বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল শালকিয়ার বাবুডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখার্জী পরিবারের যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে। সেই সূত্রেও উত্তরপাড়ার ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, অঙ্কুর মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে শালকিয়ার বিপ্লবী যুবকদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। [২]

সূত্র ঃ

(১) বিপ্লবী বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী কথিত বিবরণ।

(২) শালকিয়ার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ ঃ ৭০-৭৩); পাঁচশো বছরের হাওড়া —হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ ঃ ১০১-১০৬): 'লোকমুখ' পত্রিকা (১ম বর্ষ, ২য় সংকলন) ঃ ধ্রুব মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ —'বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও হাওড়া জেলা' (পৃ ঃ ১৪-১৫)।

— o —

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে একটা যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা চলতে থাকে। বারানসীর কেশব চক্রবর্তী মস্কোয় এম.এন রায়ের সঙ্গে যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপে যান। সুকিয়া স্ট্রীট বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী জাপানে যান রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসে। চীনে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হতে থাকে। [১]

যুগান্তর ও অনুশীলনের নেতারা পাটি পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ বন্ধ রাখতে চান। [২] বেনারসের শচীন সান্যাল দ্রুত আঘাত হানার প্রয়োজনে "চট্টগ্রামের সূর্যসেন ও চারুবিকাশের দল, ঢাকার নলিনী দত্তের দল ও নিজের বারানসী দল মিলিয়ে গড়লেন 'ভায়োলেন্স দল।" শচীন সান্যাল যেসব পুলিশ অফিসার ও পুলিশ ব্যারাককে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হবার সময় সে তালিকা পুলিশ হস্তগত করে নেয়। ফলে, তাঁর পরিকল্পনা সাময়িকভবে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁরই আদর্শে অবিলম্বে আঘাত হানার চিন্তা থেকেই বাংলায় গড়ে ওঠে 'নিউ ভায়োলেন্স পার্টি'। ১৯২৫-এর ৭ই আগস্ট প্রত্যেক পার্টি থেকে একজন করে নিয়ে তৈরী হয় সেন্ট্রাল বোর্ড বা কেন্দ্রীয় পর্যদ। তাতে থাকেন উত্তরপাড়া গোষ্ঠীর হরিনারায়ণ চন্দ্র, নদীয়া গোষ্ঠীর অনন্তহরি মিত্র, ঢাকা গোষ্ঠীর সুধীর বসু, চট্টগ্রাম গোষ্ঠীর চারুবিকাশ দত্ত, কলকাতা গোষ্ঠীর দেবেন্দ্র দে ওরফে খোকা, শালকিয়া গোষ্ঠীর বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী। [৩] এই কেন্দ্রীয় পর্যদের অধীনে একত্রিত হয় ঃ-

(১) হাওড়ায়, বীরেন্দ্র ব্যানার্জীর অধীনে (যুগান্তর); (২) হুগলী, হরিনারায়ণ চন্দ্রের অধীনে (যুগান্তর); (৩) নদীয়া, অনন্তহরি মিত্রের অধীনে (যুগান্তর); (৪) বানী সেবক সঙঘ, সুধীর বসুর অধীনে (অনুশীলন); (৫) শচীন সান্যালেব গ্রুপ, বিনয়েন্দ্র রায় চৌধুরীর অধীনে (অনুশীলন); (৬) মাদারিপুর, পঞ্চানন চক্রবর্তীর অধীনে (যুগান্তর); (৭) চট্টগ্রাম, সূর্যসেনের অধীনে (যুগান্তর); (৮) চট্টগ্রাম, চারুবিকাশ দত্তের অধীনে (অনুশীলন); (৯) ঢাকা, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের অধীনে (যুগান্তর); (১০) আসাম গ্রুপ, উপেন্দ্র ধরের অধীনে (যুগান্তর)।

এন. ভি. পি বা নিউভায়োলেন্স পার্টি দু'টি গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। একটি দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায়, অন্যটি কলকাতার ৪নং শোভাবাজার স্ট্রীটে। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী দেবী প্রসাদ চ্যাটার্জীর যোগাযোগেই তাঁর এক বন্ধুর দোতলা বাড়িতে বসলো দক্ষিণেশ্বর কেন্দ্র। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের

গোপন আশ্রয়ে একত্রিত করে রাখা, তৈরি অস্ত্রাদি এনে রাখা বা এখানেই প্রস্তুত করা ইত্যাদি চিন্তাধারা থেকেই এই কেন্দ্র দু'টির সৃষ্টি।

"পার্টির অফিসিয়াল প্রোগ্রাম পাওয়া গিয়াছে কলিকাতায় ৪নং শোভাবাজার স্ট্রীটে--

'Actions are the book of the masses—ideas open quickly by the blood of the martyrs'--Mazsini.

"ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে বিপ্লব সংঘটিত হইবে--

(ক) ব্যক্তিগত বিভীষিকা সৃষ্টি--অফিসারদের হত্যা, ট্রেন ধ্বংস, গুপ্তচর এবং গুপ্ত সংবাদদাতাদের হত্যা, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ অধিকার ইত্যাদি...।

(খ) সমবেত সশস্ত্র আক্রমণ।

(গ) ক্ষমতা অধিকার।

(ঘ) বিপ্লব।" [৪]

এঁরা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের পথ গ্রহণ না ক'রে নিজেদের বাড়ি থেকে টাকা আনাই শ্রেয় বলে মনে করতেন। কারণ ডাকাতি করে ধরা পড়লে আদালতে মামলা লড়তে খরচ হতো প্রচুর। সেই হিসাবে উত্তর পাড়ায় ধ্রুবেশ চ্যাটার্জীর নামে আঠারো হাজার টাকার ডিবেঞ্চার ছিল। তিনি নাবালক থাকায় তাঁর অভিভাবক ছিলেন তাঁর ইঞ্জিনীয়ার জ্যাঠামশাই পরেশ চ্যাটার্জী। ইতোমধ্যে ধ্রুবেশ সাবালক হয়ে যেতেই সেই ডিবেঞ্চার ভাঙিয়ে পুরো আঠারো হাজার টাকাই তিনি পার্টিকে দিয়ে দেন। অন্যান্যরা বাড়ি থেকে মা-বৌদির গয়না এনে দিতেন, টাকাও আনতেন। রামু মুখার্জী ও শ্যামু মুখার্জী দুই যমজ ভাই ছিলেন। তাঁদের বাবা ছিলেন ডি.এস.পি। তাঁদের মা মারা যাবার পর তাঁরাও মা'র গয়না এনে দিয়েছিলেন। এঁরা দুভাই পরে কলকাতার ভবানীপুরে চলে যান। এইসব টাকা দিয়ে বোমা প্রস্তুত ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ হতো।

হরিনারায়ণ চন্দ্র বোমা তৈরী শেখাতেন। বিপ্লবীরা ডিজাইন দিতেন, সেই অনুযায়ী বোমার খোল তৈরী হতো ব্যাতোড়ে। পরে শালকিয়ার লক্ষী ঘোষ 'টার্ন' করতেন। বোমাগুলি তৈরি হতো শালকিয়ার ডোমপাড়া লেন (বর্তমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেন)-এর একটি বাড়িতে। রিভলবার চোরাপথে সংগ্রহ হতো। কলকাতার ৮নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে বিপ্লবী কর্মীদের একটি মেস ছিল। বৈপ্লবিক কাজকর্মের খবর দিতে ও নিতে নেতা ও কর্মীরা এখানে আসতেন। যতীন দাস (পরবর্তীকালে অনশনব্রতে মৃত্যুবরণকারী), শচীন সান্যাল (রাসবিহারী বসুর সহকারী ও বিখ্যাত বিপ্লবী) প্রভৃতিরা ওখানে যোগাযোগ রাখতেন। হাওড়া ও চন্দনগরের গ্রুপ ওখানে যেতেন। একদিন হরিনারায়ণ চন্দ্র যেতেই শচীন সান্যাল বললেন, 'রাজেন পলাতক, ওকে রাখতে পারবেন? ওকে

বোমা তৈরিটাও শেখাতে হবে।' দ্বিধাহীন চিত্তে হরিনারায়ণ বাবু বললেন, 'কেন পারবো না? ব্যস, কথা ঐ পর্যন্তই, কেন পলাতক, কি ঘটেছে— শচীনবাবুও বললেন না, হরিনারায়ণ বাবুও জানতে চাইলেন না। সেইদিনই নির্দেশমত স্থানে রাজেন লাহিড়ী এলেন। গুরুত্ব দেওয়া হলো বোমা তৈরী শেখানোর ওপর। তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ার গোপন আশ্রয়ে নিয়ে আসা হলো।

আসলে রাজেন লাহিড়ীর পলাতক হবার পিছনে কি ঘটনা ছিল?

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট সাজাহানপুর থেকে যাত্রীবাহী ৮নং ডাউন ট্রেন কাকোরী স্টেশনে আসে সন্ধ্যা ৭টায়। ট্রেনটি আলমনগরের দিকে মাইলখানেক যাবার পরই ট্রেনের ভিতর থেকে চেন টানা হয়, ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেন থেমে যায়। ট্রেন থামান রাজেন লাহিড়ী। উদ্দেশ্য, মেল ভ্যানের টাকা লুট করা। ট্রেনটি থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন তরুণ যুবক গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়েই ট্রেনের গার্ড ও ড্রাইভারকে উদ্যত রিভলবার দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে রাখেন এবং মেলভ্যানের সিন্দুকের তালা লোহার রডে চাড় দিয়ে ভেঙে ভেতর থেকে টাকা বের করে নিয়ে উধাও হয়ে যান। বাইরে তখন জল ঝড়, প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দীর্ঘ একমাস ধরে সর্বত্র অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের পর ধরপাকড় শুরু করা হয়। যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) বিভিন্ন স্থান থেকে যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, আসফাকউল্লা প্রমুখ চুয়াল্লিশজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করে। কিন্তু পুলিশ রাজেন লাহিড়ীকে ধরতে পারেনা। সেই রাজেন লাহিড়ী বোমা তৈরি শেখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বর গ্রুপের আশ্রয়ে চলে আসেন।[৫] কিন্তু তিনি যে এরকম একটা গুরুতব মামলার আসামী তা দক্ষিণেশ্বর গ্রুপের কেউ জানতেন না। হরিনারায়ণ চন্দ্রের ভাষায়, 'শচীনবাবু (শচীন্দ্র সান্যাল) রাজেন লাহিড়ীকে আমাদের সহিত থাকিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজেনের সম্বন্ধে তিনি আমাদের কিছু বলেন নাই এবং আমরাও অহেতুক কৌতূহল বশে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার অতদূর দায়িত্বের কথা জানিলে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে পুলিশের হাতে তিনি কোনদিন ধরা পড়িতেন না।'[৬]

কাকোরি রেল ডাকাতির দুমাস পরে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ভোরে দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতিপাড়ার বাড়িতে পুলিশ আসে। দেবী প্রসাদ চ্যাটার্জী এসেছিলেন ভাড়া চাইতে। ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী অসুস্থ হয়ে ৪নং শোভাবাজারের বাড়িতে ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন নিখিলবন্ধু ব্যানার্জী, শিবরাম চ্যাটার্জী ও হরিনারায়ণ চন্দ্র। বীরেন ব্যানার্জীও ম্যালেরিয়ায় অসুস্থ ছিলেন। তিনি ছিলেন বেহালার বাড়িতে। সেখান থেকে তিনিও দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে আসছিলেন। ধ্রুবেশকেও গাড়িতে

তুলে নিলেন ৪নং শোভাবাজার বাড়ি থেকে। সব অসুস্থরা এক বাড়িতে থাকলে চিকিৎসার সুবিধা হয়। ৯ই নভেম্বর বীরেন বাবু, ধ্রুবেশকে নিয়ে এবং রোগীদের পরিচর্যার জন্য অনন্তহরি মিত্রকে নিয়ে ৪নং শোভাবাজার থেকে ট্যাক্সিতে আসার পথে পুলিশের গুপ্তচর ধ্রুবেশের মুখের দাগ দেখে চিনতে পারে এবং ট্যাক্সির নম্বর টুকে রাখে। ওঁরা কাশীপুরে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেন। ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠেন। এই সময় বীরেনবাবুর প্রবল জ্বর ওঠে। দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি এসে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়েন। নির্দিষ্ট বাসার কাছে গাড়ীকে আনেন না। হেঁটে বাসায় আসেন। পুলিশ ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞাসা ক'রে, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দক্ষিণেশ্বরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত ঠিকমত আসে। কিন্তু বাড়ি ঠিক করতে না পারায় পুকুরের অপর পারে একটি বাড়িতে ভোরের সময় (১০ই নভেম্বর) আসে। সে বাড়ির লোক এই বাড়ি দেখিয়ে দেয়। পুলিশ এসে দরজার কড়া নাড়ে। ভোরে দুধওয়ালা এসেছে মনে করে রাখালচন্দ্র দে দরজা খুলে দেন। ২৪পরগণার পুলিশ সুপার তৎক্ষণাৎ তাঁকে বন্দী করে। পুলিশ দেবেন দে (খোকা)-কে চট্টগ্রামের এ.বি. রেলওয়ে ডাকাতির অভিযোগে খুঁজছিল। পুলিশ সুপার রাখালকে দেবেন মনে করে চীৎকার করে আনন্দ করতে থাকে। রাখালও নিজেকে 'খোকা নয়' বলতে থাকেন। সবাই জেগে ওঠেন। পুলিশ এখান থেকে বীরেন ব্যানার্জী (শালকিয়া), হরিনারায়ণ চন্দ্র (হুগলী), রাজেন লাহিড়ী (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী), ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (উত্তরপাড়া), নিখিলবন্ধু ব্যানার্জী (যশোর, থাকতেন কলকাতায়), শিবরাম চ্যাটার্জী (মুর্শিদাবাদ), অনন্তহরি মিত্র (নদীয়া), রাখালচন্দ্র দে (চট্টগ্রাম) ও দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে (বালি) গ্রেপ্তার করে।

দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বিজন ব্যানার্জী ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ৪নং শোভাবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে এই গ্রেপ্তারের খবর পাঠিয়ে দেন। শোভাবাজারের বাড়িতে তখন চট্টগ্রামের সূর্যসেন ও প্রমোদ চৌধুরী এবং বরিশালের অনন্তকুমার চক্রবর্তী ছিলেন। শালকিয়ার বিজন ব্যানার্জীর প্রেরিত সংবাদে তাঁরা মনে করেন পুলিশ যদি দু'টি কেন্দ্রেরই সংবাদ পেত, তবে একইসময়ে যুগপৎ হানা দিত। তাই তাঁরা সরলেন না। বিকালেই পুলিশ গেল। 'আমি এ ঘরের নই' বলে সূর্য সেন বারান্দায় বেরিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে খোলার চালে লাফিয়ে পায়ে আঘাত পেলেন। সেই অবস্থায় এলেন বড়বাজারে হরিনারায়ণ চন্দ্রের মামার তেলের দোকানে। সেখানে দোকানের কর্মচারীরা সব শুনে ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও গোপন স্থানে রেখে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেন। পুলিশ সূর্য সেনকে অন্য লোক ভেবে ছেড়ে দেয়। কিন্তু অনন্ত চক্রবর্তী ও প্রমোদ চৌধুরী বলশালী যুবক হওয়ায় এঁদেরই গ্রেপ্তার করে। উভয় জায়গা থেকেই পুলিশ বোমার মাল-মশলা ও অস্ত্রাদি পায়।

দক্ষিণেশ্বর থেকে আনা অসুস্থ বন্দীরা চিকিৎসায় সুস্থ হলে তিন জন বিচারককে নিয়ে স্পেসাল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি একজন ইংরেজ, সুরেশ সিংহ ও একজন মুসলমান ছিলেন বিচারক। এই মামলায় আসামী পক্ষে আইনজীবী ছিলেন মন্মথ সরকার, সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, অচিন্ত্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের পরিচালনা করতেন ব্যারিস্টার নিশীথ সেন।

শোভাবাজারের বাড়ির একজন বাসিন্দা হরিনারায়ণ চন্দ্রকে ঐ বাড়িতে দেখেছেন বলে সনাক্ত কবায় পুলিশ দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারের 'কেস' এক বলে দেখাবার সুযোগ পায়। ১৯২৬-এর ৯ই জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার রায়ে হরিনারায়ণ চন্দ্র, অনন্তহরি মিত্র ও রাজেন লাহিড়ীর দশ বছরের সশ্রম নির্বাসন, প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র দে'র পাঁচবছর সশ্রম কারাদণ্ড, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শিবরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই সংগঠনের অন্যতম কর্মী চিত্রশিল্পী সুধাংশু চৌধুরী ও বিপ্লবী দেবেন দে-কে জাপানে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বার্মায় পাঠানো হয়। সুধাংশু চৌধুরী রেঙ্গুনে ধরা পড়েন। তাঁর দেড় বছরের সাজা হয় এবং দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের সঙ্গে একসঙ্গেই তাঁকে রাখা হয়। দেবেন দে ধরা পড়েন না। [৭]

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার যেদিন রায় বেরোয় সেইদিনই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। বন্দীরা স্বীকারোক্তিতে রাজেন লাহিড়ীর নাম বলায় তাঁকে যুক্তপ্রদেশে নিয়ে যায় ও ঐ মামলায় তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

"১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় শালিখার সন্তোষ গাঙ্গুলী ও উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী আত্মগোপন করে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এই কারখানাটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই সুরেশ বসু মশায়ের। সেখানে ঐ যুবকদ্বয় অমল সাহা (চৈতন্যদেব) ও বিমল সাহা (সন্তোষ গাঙ্গুলী) নাম নিয়ে কাজ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়। ঐ কারখানার চীফ কেমিষ্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারিশ্রমিকের কথা তোলেন তখন তাঁরা শিক্ষানবীশ কালে বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, বসুজায়া এই সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রতিদিন ঐ যুবকদ্বয়ের জন্য দুপুরের খাবার কারখানায় পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশী দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না। নেতা বিজনবাবুর নির্দেশে আবার তাঁদেরকে শালিখায় ফিরে আসতে হয়। শালিখায় ফিরে আসার পরই সন্তোষ গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হন। সন্তোষ গাঙ্গুলী ও তারকেশ্বরের শচীন ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন।" [৮]

সূত্র ঃ
(১) বাঙলার বিপ্লব সাধনা— পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ ১১৮)।
(২) অনন্ত সিং-রচিত 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' গ্রন্থে বেঙ্গল পুলিশের গোপন রিপোর্টের উদ্ধৃত সারাংশ (পৃঃ ২১৯)।
(৩) বাঙলার বিপ্লব সাধনা— পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ ১১৭)
(৪) বেঙ্গল পুলিশের (ইনটেলিজেন্স) গোপন রিপোর্টের সারাংশ অনন্ত সিং রচিত 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' গ্রন্থের (পৃঃ ২২০) থেকে উদ্ধৃত।
(৫) দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বিখ্যাত আসামী বীরেন ব্যানার্জীর দেওয়া বিবরণ।
(৬) বিপ্লবীর সাধনা (১ম) — হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃঃ ১১৯)।
(৭) বিপ্লবীর সাধনা (২য়) — হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃঃ ১-৮)।
(৮) পাঁচশো বছরের হাওড়া — হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১০৬-১০৭)

— o —

জেলে ভূপেন চ্যাটার্জী হত্যা

গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী আলিপুর জেলের সিগ্রিগেসন ওয়ার্ডে মাঝে মাঝে আসতেন এবং কমবয়সী রাজবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। রাজনৈতিকবন্দী যুবকরা তাঁর কথা শুনলে তাদের কিছু সুখ সুবিধা করে দেবেন বলতেন। একটু কথা বললেই তিনি মনোভাব বুঝে নিতেন। গান বাজনা ধর্ম সিনেমা সব বিষয়ের আলোচনাতেই তিনি পারঙ্গম ছিলেন। কাউকে ফটো দেখালে সে চেনে কি-না, হাবভাব দেখে বুঝে নিতেন। দুপুরে এসে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত থাকতেন। বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাঁরা দরখাস্ত করতেন তাদের ব্যাপারটি ত্বরান্বিত করার আশ্বাসও দিতেন। অল্পবয়সী বন্দীদের সঙ্গে খুবই সহানুভূতিসূচক কথাবার্তা বলতেন। কৌশলে গোপন তথ্য বের করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। বহু বন্দী তাঁর প্রসাদ লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তবে, তিনি যুবকদের বলতেন যেন এসব কথা বাইরে না বেরোয়। কিন্তু কালক্রমে বিষয়টা চাপা রইল না। তিনি কাকে কি আশ্বাস দেন শোনার জন্য বিপ্লবী যুবকদের কেউ তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি প্যান্টের দুটো পকেট চাপড়ে দিয়ে শোনাতেন যে তাঁর বডিগার্ডরা ঐ পকেট দু'টিতেই আছে। অর্থাৎ, তিনি রিভালবার থাকার ইঙ্গিত দিতেন। তাঁর এই ঘন ঘন যাতায়াতে জেলের ওয়ার্ডার থেকে সাধারণ কয়েদিরা পর্যন্ত 'মামা' বললে ওঁকেই বুঝে নিত।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা তাঁকে ওয়ার্ডের মধ্যে আসবার জন্য রাজবন্দী মারফৎ টোপ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেছেন।[১] 'সেই সময়ে অমরেন্দ্রনাথও সেই জেলে আবদ্ধ ছিলেন। হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আছে শুনিয়া ভূপেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে স্বীয় হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে বলেন। রেখা পরীক্ষার পর অমরেন্দ্রনাথকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বিচার ফল জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে অমরেন্দ্রনাথ বলেন যে, তাঁহার পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।'[২]

ভূপেন চ্যাটার্জীর ফিরে যাবার সময় চিত্রশিল্পী সুধাংশু চৌধুরী (যিনি পরে ইণ্ডিয়া হাউসে ছবি এঁকে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন) রাজেন লাহিড়ীর শেখানো একটি গান গেয়ে উঠতেন—

"তোমায় নেয়না কেন যম!
এত লোকের গরু মরে তোমার বেলায় একি ভ্রম।
শীতলার বাহন তুমি ধোপার প্রিয় ধন,
তোমায় নেয়না কেন যম!"

এসব থেকেই বোঝা যায় বিপ্লবীদের তাঁর উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। ওয়ার্ড পরিষ্কার করার সময় একটি শাবল প্রাপ্তি এবং প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর শাবলটি লুকিয়ে রাখার বিষয়টিই বিপ্লবীদের চরম লক্ষ্য সাধনের দিকে ঠেলে দিল। ২৮-৫-১৯২৬ তারিখে সন্ধ্যায় 'মামা'কে আসতে দেখেই প্রমোদ ও নিখিল নেমে আসেন। কাপড় পড়ে গেছে বলে ওয়ার্ডারকে দিয়ে গেটের তালা খোলান। সামনেই 'মামা'। প্রমোদ তাঁকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। নিখিল নমস্কার করলে 'মামা'ও প্রতি নমস্কার করেন। সেই সুযোগে নিখিল তাঁর জামার কলার ও টাই ধরে মুখে সজোরে এক ঘুসি মারেন, প্রমোদ সেই সুযোগে শাবলটা নিয়ে এসেই মাথায় প্রবল আঘাত দেন। 'মামা' পড়ে যান, তার উপর আরো আঘাত, মাথা চূর্ণ হয়ে যায়, একটা চোখ ঠিকরে কোথায় চলে যায়। ওয়ার্ডার রামরাজ প্রমোদকে নিবৃত্ত করতে এসেছিল, তার দিকে শাবল নিয়ে ধাইতেই তৎক্ষণাৎ সে ভয়ে পালায়। প্রমোদরঞ্জন শাবলটাকে কুস্তীর আখড়ায় লম্বালম্বি পুঁতে দেন—তারপর ভদ্রলোকের মত ওয়ার্ডে এসে হাতের রক্ত ভালভাবে ধুয়ে খেয়ে ফেললেন। নিখিল হাতে পায়ে লাগা রক্ত চেটে খেয়ে নিলেন। হত্যাকাণ্ড যেখানে ঘটল বা লাস পড়ে রইল সেটা এমনই জায়গা যে কোন ওয়ার্ড থেকে তা নজরে আসে না। তবু ওয়ার্ডার দেখেছে। হুইসেল বাজল, পাগলাঘণ্টি বাজল, জেল সুপার বি.জি. মালয়া এলেন, কিন্তু তিনি সশস্ত্র পুলিশকে নিরস্ত্র করিয়ে প্রবেশ করান। মিঃ রে, লোম্যান, লাহিড়ী সাহেব, নলিনী মজুমদার প্রমুখ পুলিশ অফিসার, গোয়েন্দা অফিসার তাঁদের

দেহরক্ষীসহ আসেন, টর্চ ফেলে কারোর দেহে রক্তের দাগ আছে কি-না দেখেন, বীরেন ব্যানার্জীর সাবান মাখানো গেঞ্জি জাঙ্গিয়া —সেদিন সকালে মোরগের লড়াই হওয়ায় সেই রক্ত লাগা নিখিল ব্যানার্জীর পোষাক, একটা বেডসীট প্রভৃতি কেমিক্যাল পরীক্ষায় গেল—কিন্তু দোষের কিছুই মিলল না।

যে ওয়ার্ডার (রামরাজ) তালা খুলে দিয়েছিল সে কাঁদতে থাকে। তার কান্না দেখে শুকুর খাঁ নামের এক জমাদার তাকে বলে, 'তু তো বুদ্ধু হ্যায়' —বলে তার হাতে ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়ে বলে, 'বলবি আমায় মেরে চাবি নিয়ে খুলেছে।'

লাফ্রে (Lafray) নামে এক সার্জেণ্ট সব ঘটনা জেনেও নীরব হয়ে গেলেন। দুজন কয়েদী হ্যাফাইট ও ক্যাম্বেল রোজার্স সাক্ষ্য দিয়েছিল। অথচ দুজনের কেউই তখন সেখানে ছিল না, চার্চে ছিল। হ্যাফাইট (অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান) মুক্তি পাবার শর্তে সাক্ষ্য দিল আর রোজার্স সাক্ষ্য দিল অনন্তহরি মিত্র লাইব্রেরিয়ান হিসাবে তাকে বেআইনীভাবে কিছু বই আত্মসাৎ করার সুযোগ দেননি বলে। এ ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষী ছিল । এই মামলার অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় ছিল ওয়ার্ডারদের সিদ্ধান্ত। তাঁরা পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন যে, সবাইকে জড়িয়ে দিলে কারোর ফাঁসী হবে না। কিন্তু পুলিশ ও শ্বেতাঙ্গদের অন্য অভিপ্রায় এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। স্পেশাল ট্রাইবুনাল ৯-৬-২৬ তারিখে তিনজনের ফাঁসী ও সাতজনের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দেন। বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী (শালকিয়া), অনন্তহরি মিত্র (নদীয়া) ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (চট্টগ্রাম) ফাঁসী, হরিনারায়ণ চন্দ্র, নিখিলবন্ধু ব্যানার্জী, দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, রাখাল দে, সুধাংশুশেখর চৌধুরী ও ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী—এই সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের হুকুম হয়। এই মামলার আপীলে বীরেন্দ্রকুমার, নিখিলবন্ধু, দেবীপ্রসাদ, সুধাংশুশেখর ও হরিনারায়ণের বেকসুর খালাসের আদেশ হয়। প্রমোদরঞ্জনের দণ্ড নিয়ে দুই বিচারপতির মতদ্বৈধতা ছিল। তাই তা বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে যায়। তিনি মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখেন (৯/৮/২৬)।

১৯২৬-এর ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরির ফাঁসি হয়। উভয়কে যখন ফাঁসীর মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁরা উভয়েই প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন—কে আগে ছুটে গিয়ে ফাঁসীকাঠে ঝুলবেন। উভয়েই হাসতে হাসতে ফাঁসীকাঠে গিয়ে উঠেছেন। ফাঁসীর পূর্বদিন তাঁরা সাররাত্রি স্বদেশীগান গেয়ে কাটান।[৩]

কী নির্ভীক বীর্যবত্তা! কী অকুতোভয় হৃদয়!!

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর বীরেন বাবুকে মৈমনসিং জেলায় অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়। গারো পাহাড়ের লাগোয়া কলমা কাঁদা নামক একটা অজ পাড়াগাঁয় এক বছরের বেশী তাঁকে থাকতে হয়। ঐখানে থাকার সময়েই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। চারদিনের

ছুটিতে বাড়ী আসেন। তারপর বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকেন। পরে সে আদেশ তুলে নেওয়া হয়।

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ডাঃ রণেন সেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রণেন বাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই টেরোরিস্ট পার্টিতে ছিলেন। রণেনবাবু ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট হয়েছেন। বীরেনবাবুও জেলখানায় জামালুদ্দিন বুখারি ও করম ইলাহী কুরবানের কাছ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাঠ নিয়েছিলেন। এখন রণেনবাবুর সান্নিধ্যে তা আরও পোক্ত হোল। বীরেনবাবু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। [৪]

সূত্র ঃ

(১) বিপ্লবীর সাধনা— হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃঃ১৫-১৬)

(২) রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়— নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ ঃ ১৩৫)

(৩) স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২য়)— গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (পৃঃ ৩৩-৩৪); বাংলার বিপ্লব সাধনা — পুলকেশ দে সরকার (পৃঃ১১২); বিপ্লবীর সাধনা (২য়) — হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃ ঃ১৭-২৫); বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী (শালকিয়া)-র কথিত বিবরণ; বিপ্লবের পথে — সুবোধ কুমার লাহিড়ী (পৃঃ ৬৯)।

(৪) বীরেন ব্যানার্জীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য।

বসন্ত ঢেঁকির গ্রেপ্তারের পর নানাস্থানে তল্লাসী, বিনা বিচারে আটক ও কারাদণ্ড ঃ

বসন্ত ঢেঁকির গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরেই পার্বতীপুরের কর্মীদের উপর পুলিশের নজর পড়ে। সেন্ট্রাল পুলিশের ভুজেন সরকার সদলবলে উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (বলাই)-এর সন্ধানে তাঁর বাড়িতে আসেন। বাড়িতে ছিলেন উমাপ্রসাদবাবুর দিদিমা জ্ঞানদাময়ী। তিনি বেরিয়ে এসে বলেন, 'উমাপ্রসাদ বাড়িতে নেই।' ভুজেন সরকার জেদাজেদি করতে থাকেন, বাড়ি সার্চ করতে চান। কিন্তু জ্ঞানদাময়ী বাড়িতে ঢুকতে দেন না। ভুজেন সরকার কোনমতেই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পাননা এবং ঢুকতেও পারেন না, তাঁকে ফিরে যেতে হয়। সেদিন উমাপ্রসাদবাবু বাড়িতেই ছিলেন। কিছুদিন পরে উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে হাওড়ায় ভুজেনবাবুর দেখা হতে তিনি বললেন, 'আমি আর

তোমাদের বাড়ি যাবনা।' উমাপ্রসাদবাবুর নামে ওয়ারেন্ট ছিল না। [১]

পুলিশ এবার ওয়ারেন্ট-সহ কাজে নামে। দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাড়ি এর কয়েকদিন পর এক ভোরে পুলিশ হানা দেয়। উনি অবস্থা বুঝে আর স্বগৃহে শুতেন না, থাকতেন প্রতিবেশী গোবর্ধন দে'র বাড়ি। খানাতল্লাসীর দিন উনি ও শিবপ্রসাদ মুখার্জী দুজনে ওখানে শুয়ে ছিলেন। গোবধনবাবুর বাড়ি থেকে ওনার বাড়ি দেখা যায়। দেখেন পুলিশ ঘিরেছে। ওখানে ওঁদের সঙ্গে ছিল একবাক্স কার্তুজ ও একটি বে-আইনী বই। তাই নিয়ে বাড়ির ভিতর দিয়ে বাগানের পথ ঘুরে আসেন শিশির (গতি) ব্যানার্জীর বাড়ি। সেইখানে সারাদিন থেকে বিপ্রন্নপাড়ায় বিপিন চ্যাটার্জীর বাড়ি রাত কাটান। পরদিন গঙ্গাপার হয়ে মেটিয়াবুরুজ ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমতার বিনলা গ্রামের রমণী ব্যানার্জীর মেটে দোতলায় এসে শোনেন রমণীবাবু গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। সেখান থেকে ক্যালকাটা হোটেলে তারকেশ্বরের শচীন দত্তের সন্ধানে এসে শোনেন তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফল্গুদাস লেন-এ মন্মথ সরকারের কাছে আসেন। মন্মথবাবু (পরবর্তীকালের ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকীল ও সিঁ, পি, আই (এম)-এর বিশিষ্ট নেতা) নবদ্বীপের লোক। তিনি তাঁর চিঠি নিয়ে আশ্রয়ের জন্য আশুবাবুকে নবদ্বীপ যেতে বলেন। কিন্তু আশুবাবু কলকাতায় থাকতে চান। মন্মথবাবুর বাড়ী খাওয়া দাওয়া সেরে বড়বাজারে ধীরেন ঘোষের দোকানে আসেন। সেখানে দক্ষিণ ঝাপড়দার শ্যামাপদ রায় কাজ করতেন। শ্যামাপদবাবুর কাছে যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তা সাবধানে রেখে দিতে বলে উনি হাওড়ায় ১১নং নাগপাড়া লেন-এ প্রবোধ বসুর কাছে আসেন এবং তাঁর মারফৎ শরৎ চ্যাটার্জী (ঔপন্যাসিক) মশাইকে নিজের অবস্থার কথা জানান। শরৎবাবু একবার বলেছিলেন যে আত্মগোপন না করলে ভাল কাজ করা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে শরৎবাবু আর ওনাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দেন না। ধরা দিতে বলেন। এই সময় খাঁটোরা গ্রামের পুলিন পাল (চক্ষু চিকিৎসক) ওনাকে ধরা না দিতে বলেন এবং বলেন যে, যা টাকার দরকার হবে কেশবপুরের শিরীষ ঘোষ দেবে। তিনি আশুবাবুকে ওখান থেকে চলে যাবার পরামর্শ দেন। পুলিনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আশুবাবু উত্তর ঝাপড়দার কানাই বসু (ডাঃ কে.এল.বসু)-র কলকাতার হিমানী ট্রেডিং-এর অফিসে আসেন। সেখান থেকে উত্তর ঝাপড়দার ডাঃ কানাইলাল বসু ও ডাঃ পুলিন পালকে সঙ্গে করে আশুবাবু শিয়ালদহ স্টেশনে এসে মথুরা এক্সপ্রেসে করে বেনারসে চলে যান। বেনারস-এ ওনার দিদি থাকতেন। সেখানে গিয়ে শোনেন ওনারই সন্ধানে পুলিশ গিয়েছিল এবং উনি এলেই যেন পুলিশকে জানান হয় এমন কথা বলে গেছে। এরপর আসেন দিদিমার বাড়ী। সেখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। আবার ফিরে আসেন কলকাতায় মন্মথ সরকারের বাসায়। তারপর সকালে আসেন ৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক

লেন-এ রামকৃষ্ণপুর-এ উমাপ্রসাদ বাবুর কাছে। সেখানে দই চিঁড়ে খেয়ে থাকেন। জীবন মাইতির সহকর্মী পচা (নির্মল) মেটিয়াবুরুজে আশ্রয় দেবে বলে এবং বিকালেই আশ্রয় ঠিক করে আসে। আশুবাবু বিকালেই কলকাতায় জামা-কাপড় আনতে যান। উমাপ্রসাদ বাবু যেতে নিষেধও করেছিলেন। কলকাতা থেকে কাপড় চোপড় নিয়ে ধীরেন ঘোষের দোকানে দেখা করে হাওড়া রামকেষ্টপুরের ৩২ নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন-এ আসছিলেন চাঁদপাল ঘাট দিয়ে লঞ্চে করে। হঠাৎ পুলিশ ঘিরে ধরে এবং গ্রেপ্তার করে। থানায় জিজ্ঞাসা করে— 'কোথায় গিয়েছিলেন?' উনি বলেন, 'মোহনবাগান ও ক্যামেরণের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।' ওরা জিজ্ঞাসা করে— 'কারা জিতল?' আশুবাবু উত্তর দেন, ' খেলা ভাল না লাগায় ইডেনে এসে ঘুমিয়ে পড়ি'। ওনাকে ইলিসিয়ামরো-তে নিয়ে যায়। লোম্যান আসেন, হেসে কথা বলেন। আশুবাবুও হাসেন। লোম্যান বলেন, 'হাসছ কেন?' আশুবাবু বলেন 'আপনি হেসে কথা বলছেন,' লোম্যান উত্তর দেন, 'আচ্ছা দেখা যাবে।'— পুলিশ ওঁর উপর কোন অত্যাচার করে না। প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়। ১৯২৬ সালে চাঁদপাল ঘাটে গ্রেপ্তার হবার পর থেকে ১৯৩০ সালের প্রথমভাগ পর্যন্ত নানান জেলে একটানা 'ডিটেনশান' এ থাকেন। এই সময়ে তাঁকে যে সকল জেলে রাখা হয় তার ধারাবাহিক বিবরণ হোল,— প্রেসিডেন্সী জেলে (প্রায় ছমাস), বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট জেলে (প্রায় তিনমাস), যশোর ডিস্ট্রিক্ট জেলে (প্রায় দুমাস), কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট জেলে (প্রায় দুমাস), ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট জেলে (প্রায় পাঁচমাস)—এইখানে থাকার সময়ে তার দিদির মরণাপন্ন অসুখ হয়। দিদিকে দেখার জন্য মাত্র ২৪ ঘন্টা বাড়ীতে থাকার অনুমতি মেলে। বাড়ীতে দিদিকে দেখিয়ে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখে। সেখান থেকে আবার ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট জেলে নিয়ে যায়। ঢাকা থেকে বর্মায় নিয়ে যায়। রেঙ্গুন জেলে দিন পনেরোর জন্য রেখে বেসিন জেলে নিয়ে গিয়ে প্রায় ছমাস রাখে। সেখান থেকে মান্দালয় জেলে মাস তিনেকের জন্য রেখে আবার বেসিন জেলে এনে মাস দেড়েক রাখে। তারপর পাঠায় ইনসিন্ জেলে। সেখানে মাস পাঁচেক রাখার পর বহরমপুর জেলে এনে সপ্তাহখানেক রাখে। ওখান থেকে জলপাইগুড়ি বক্সা কোর্টে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। সেখানে নিয়ে যাবার আগে জলপাইগুড়িতে সুপারিন্টেন্ডন্ট অফ পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যায়।

তখনও বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্প হয়নি। বক্সা কোর্টে চার পাঁচ মাস রাখার পর মুক্তি দেয় এবং মাস পাঁচেক গৃহবন্দী (Home Intern) করে রাখে। ছাড়ার সময় মাস তিনেকের ভাতা দেয়। বাড়ীতে চল্লিশ টাকা করে দিত। পরে ১৯৩০-এর শেষের দিকে আবার গ্রেপ্তার করে এবং কিছুদিন বহরমপুরে 'ডিটেনশন'-এ রাখে।

ইতোমধ্যে হাওড়ার বঙ্কিম দত্তর বাড়ি থেকে পার্বতীপুরের গোষ্ঠবিহারী মুখার্জী গ্রেপ্তার হন ও প্রেসিডেন্সী জেলে ডিটেনশনে থাকেন। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকা কালীন আশুতোষ বাবু ও গোষ্ঠবাবু জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মেজর হানার কাছে নিজেদের ব্যবহারের জন্য দুটো 'ইংলিশ কোট' চান। ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি ইংরাজ অফিসারদের স্বাভাবিক অবজ্ঞা বশেই মেজর হানা 'ইংলিশ কোট' দিতে অস্বীকার করে বলেন, 'তোমরা, বাঙ্গালীরা ইংলিশ কোট নিয়ে কি করবে?' আশুবাবু ওগোষ্ঠবাবু এই উদ্ধত উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং তাঁকে কথাটা প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। অন্যথায় ওঁরা অনশন করবেন বলেন। চাপে পড়ে জবরদস্ত ইংরেজ জেল সুপারিন্টেডেন্ট লিখিত ক্ষমা চান্— 'I apologise to you for which I have said.'—
সেদিনের 'মরণ পণ করা' স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কত রকমে যে ইংরাজ শাসকদের গর্বোদ্ধত শির অবনত করিয়ে দিয়েছিলেন তার সীমা সংখ্যা নেই। কী অসীম সাহস, কী অপরিমেয় মনোবলের অধিকারী এঁরা ছিলেন, ইংরেজ শাসকদের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করার কী দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি যে এঁদের ছিল তার এ রকম কত টুকরো ঘটনা যে তার উজ্বল মহিমা নিয়ে ছড়িয়ে আছে স্বাধীনোত্তর এ দেশে তার কতটুকুই বা প্রকাশ হয়েছে? এমনই একটি ঘটনা হোল—

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য যখন প্রেসিডেন্সী জেলে তখন সেখানে মহান বিপ্লবী পরবর্তীকালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীরনায়ক সূর্য সেন আসেন। তাঁর সঙ্গে কারোর কথা বলা বা দেখা সাক্ষাৎ করা নিষেধ ছিল। তাঁকে রাখা হয় ঐ জেলের ৪৪ ডিগ্রীতে। তবু পাঁচিলে উঠে বিপ্লবী সৈনিকরা তাঁদের নেতার সঙ্গে দেখা করেন। গোষ্ঠবাবু, আশুবাবুও ঐভাবে সূর্যসেনের সঙ্গে দেখা করেন। আশুবাবু, গোষ্ঠবাবু, ফরিদপুরের সন্তোষ দত্ত, স্পিনোজা প্রভৃতি একসঙ্গেই মেলামেশা করতেন। সূর্য সেন যে সেল-এ থাকতেন তার পাশের সেল-এ একদিন সন্ধ্যার সময় একজন লোককে এনে ওরা তালাবন্ধ করে দেয়। লোকটির পরণে থলের পোষাক। লোকটিকে খুবই মারধোর করে নিয়ে আসে। লোকটি পরদিন সকালে মারা যায়। সূর্যসেন সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে সকালে বলেন যে, লোকটিকে মারা হয়েছে, তিনি জানেন। অন্যান্য সেলের বিপ্লবী কর্মীদের কাছে সূর্যসেন স্লিপ দিয়ে জানিয়ে দিলেন। তখনও দুপুরের খাওয়া হয়নি। স্পিনোজা, সন্তোষ দত্ত, গোষ্ঠবাবু, আশুবাবু প্রভৃতিরা জেল কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে জানালেন ঃ লোকটির মরদেহ যেন বাইরে পাঠানো না হয়, আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। চিঠি পেয়েই হানা এলেন। বললেন, 'লোকটির মস্তিস্কে ফোড়া হয়েছিল'। এঁরা বললেন, 'মারধোর হয়েছে, প্রমাণ আছে'। হানা পোষ্ট মর্টেম করার কথা বলেন।

পুলিশ হাসপাতালের সার্জন মেজর দে -কে দিয়েপোষ্ট মর্টেম করা হবে ঠিক হয়।

পোষ্ট মর্টেমের সময় হানা থাকবেন, বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে সন্তোষ দত্ত থাকবেন। পোষ্ট মর্টেম-এ দেখা যায় মস্তিস্কের স্থানে স্থানে রক্ত। তাতে মেজর দে বলেন যে, ওরকম থাকে। ওর দ্বারা মারধর প্রমাণ হয় না। মেজর দে-কে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় এটা মস্তিস্কের ফোড়া কিনা বলতে পারেন? তখন তিনি বলেন, 'That requires Microscopic investigation.'— এতে সন্দেহ দৃঢ় হয়। জেল এনকোয়ারি হল। তাতে একা সাক্ষী দিলেন সূর্য সেন। অন্যরা ভয় পেয়ে যান, সাক্ষী পাওয়া যায় না। [১] এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, প্রশাসনিক কৌশলে একটি প্রতিবাদকে সেদিন চাপা দিতে ইংরেজ সরকারের আমলারা সক্ষম হলো সত্য, কিন্তু একটি বিপ্লবী কণ্ঠের সোচ্চার প্রতিবাদ সেদিন ঐ জেলখানার প্রতিটি হৃদয়ে যে মহান আদর্শবাদের ছাপ রেখে গেল তা যে অনপনেয় সে সত্য জেল কর্তৃপক্ষের মনেও সেদিন উঁকি দিয়েছিল বৈকি! প্রতিবাদ মাত্রেই দুষ্কৃতকারীকে কাঁপায়।

চাঁদপাল ঘাট থেকে দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্যের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ই জুলাই সন্ধ্যায় দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জীর কাছে গোপন খবর আসে যে, বিপ্লবী কর্মীদের বাড়ি তল্লাসী হবে। (এরকম গোপন সংবাদ পাবার ব্যবস্থা তখন কিছু কিছু হয়েছিল।) এই সংবাদ পেয়েই তিনি জনৈক নেতৃস্থানীয় কর্মীকে বিপ্লবী কর্মীদের বাড়ি বাড়ি খবর দেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি সকলকে সাক্ষাতে সংবাদ পৌঁছে দিতে পারেন না। রাত্রে পুলিশ আসে। ধীরেনবাবুর বাড়ি তল্লাসী হয়। একই সঙ্গে দক্ষিণ ঝাপড়দাব শিবপ্রসাদ মুখার্জী, শ্যামাপদ রায়, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কাবুলবাবু), জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জী, ধীরেনবাবুর ভগিনীপতি খাঁটোরা গ্রামের অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (অমাইবাবু), প্রবোধ চ্যাটার্জী, ডাঃ পুলিনকৃষ্ণ পাল, কেশবপুর গ্রামের শিরীষ ঘোষ প্রভৃতি কর্মীদের বাড়ি সার্চ হয়। তখন কর্মীদের অনেকের বাড়িতেই বোমা, রিভলবার প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো। ধীরেনবাবুর কাছেই ছিল রডা কোম্পানীর একটি মসার পিস্তল। তিনি পিস্তলটি নিয়ে পুলিশ আসবার আগেই দক্ষিণ ঝাপড়দার শিশির (গতি) ব্যানার্জীর বাড়ি এসে চুপি চুপি গতিবাবুর স্ত্রীকে সব কথা বললেন। তিনি অভয় দিলেন এবং ওঁকে রেখে দিলেন ঘুঁটের মাচায়। রাত্রে ধীরেনবাবুর বাড়ি গিয়ে পুলিশ কিছুই পায় না। গতিবাবুর বাড়ির একদম সামনেই শিবপ্রসাদ মুখার্জীর বাড়ি। সেখানেও পুলিশ কিছু পায় না। অথচ, দেওয়াল ঠুকে ঠুকে তল্লাসী চালায়। কোনও বাড়িতেই আপত্তিকর তেমন কিছু পায়না। শুধুমাত্র শ্যামাপদ রায় যথাসময়ে সংবাদ না পাওয়ায় তাঁর বাড়িতে কিছু অস্ত্র পায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদের বাড়িতে যেমন কিছু পায়না, তেমন কেউ বাড়িতেও ছিলেন না। শুধু প্রবোধ চ্যাটার্জীর বাড়ি কয়েকটা দুমুখো ছুরি পায়।

শিশিব (গতি) ব্যানার্জীর স্ত্রীর আশ্রয়ে ঘুঁটের মাচায় ধীরেনবাবু তিনদিন ছিলেন। তারপর তিনি চলে যান দক্ষিণ ঝাপড়দার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ হরকান্ত চক্রবর্তীর ভাগনে হরিপদ কুশারীর কাছে মুন্সীর হাটে। মুন্সীর হাটে ওঁর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা ছিল। ওখানে রাঁধুনি সেজে দিন তিনেক ছিলেন। ওখান থেকে গতিবাবুর কাছে মার্টিন রেল কোয়ার্টারে জাঙ্গীপাড়ায় সপ্তাহখানেক থাকেন। কিন্তু জাঙ্গীপাড়ার হাটে ডোমজুড়ের ফোড়ে ব্যবসায়ী কাঁচা আনাজ কিনতে যায়। পাছে তারা কেউ দেখে চিনে ফেলে তাই তিনি ওখান থেকে একদিন ভোরের ট্রেনে গতিবাবুর সঙ্গেই চলে আসেন তেলকল ঘাটে। ওখান থেকে আসেন ৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন- এ উমাপ্রসাদ বাবুর কাছে।[২]

এইখানে একদিন একটা বড় মজার ঘটনা ঘটল ঃ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের ৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন ও ৩২নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড ছিল মুখোমুখী। পুলিশ সকালবেলা ৩২ নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেনে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জীর খোঁজে আসে। তিনি তখন সেখানেই ছিলেন। কিন্তু পুলিশ ভুল করে ৩২নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোডের বাড়ীতেই সার্চ চালায়। ধীরেন বাবু তার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। এদিকে উমাপ্রসাদ বাবুর ভোরে ওঠা অভ্যাস। উনি ভোরে উঠে গোষ্ঠবাবুর বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে গিয়ে দেখেন সার্চ হচ্ছে। ১৪ নং ঈশ্বর দত্ত লেনে সন্তোষ মুখার্জীর বাসার কাছে গিয়ে দেখেন সার্চ হচ্ছে। অগত্যা রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোড দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেন ৩২নং -এ সার্চ হচ্ছে। এসেই ধীরেন বাবুকে বললেন,'দাদা, পালান।' উমাপ্রসাদ বাবুর কাছ থেকে মাত্র চার আনা পয়সা নিয়ে ধীরেনবাবু পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালালেন। পুলিশ যখন ৩২নং রামকৃষ্ণপুর ঘাট রোডের বাড়ী থেকে কিছুই পেল না, তখন তাদের চটকা ভাঙলো, পড়ি মরি করে যখন ৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন-এ ঢুকলো তখন আসামী তাদের নজরের বাইরে অনেক দূর চলে গেছেন। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসা ছাড়া পুলিশের আর করার কিছুই রইল না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, এই বাসা থেকে পূর্বদিন গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় মশাই চলে যান। এর পরেই তিনি হাওড়ার বঙ্কিম দত্তের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন। তিনি ওখানে টিউশানি করতেন। প্রায় বছর খানেক তিনি ডিটেনশন-এ থাকেন। তারপর তিনি গৃহবন্দী (অন্তরীণ) হয়ে থাকেন ডোমজুড় ষষ্ঠীতলায় তাঁর শ্বশুর জ্ঞান চ্যাটার্জীর বাড়ীতে। পার্বতীপুরের সন্তোষ মুখার্জী এই সময় হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার হন। শালকিয়ার এক কর্মী (লক্ষ্মী)-র নামে একটি মামলা হয়। সেইসূত্রে সন্তোষ বাবু গ্রেপ্তার হন। আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাঁর মামলা চলে। তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়া পান যদিও তাঁর জামিন না-মঞ্জুর হয়েছিল।[৩]

৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন থেকে পালিয়ে ধীরেন মুখার্জী উত্তরপাড়ায় তাঁর আত্মীয়

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নাড়ুবাবু)-এর বাড়ী যান। প্রভাসবাবু বর্ধমানের পালসীটের গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বুদ্ধদেব)-এর বাড়ীতে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন বলেন। প্রভাসবাবুর সঙ্গে গোপাল বাবুর যোগাযোগ ছিল। উত্তরপাড়া থেকে ধীরেনবাবু সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

শরৎবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ধীরেনবাবুর কোন অসুবিধা হয়নি। শরৎবাবুর স্ত্রী ধীরেনবাবুকে পারিপাটি করে খাওয়ান। রাত্রে শরৎবাবু ধীরেনবাবুকে বলেন, 'বামুনের ছেলে একটা পৈতে সঙ্গে নে, একটা মশারী সঙ্গে নে।' তারপর প্রয়োজনে লাগবে বলে ছুঁচ সূতো ও কিছু টাকাও দিয়ে দেন। বলেন যে, মাঝে মাঝে কিছু টাকাও উনি দেবেন এবং পরেও দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে ধীরেনবাবু বর্ধমানের রায়না থানার শ্রীরামপুর গ্রামে তাঁর পিসেমশাই দক্ষিণেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের বাড়ী গিয়ে থাকেন। সেখানে ১৫ দিন ছিলেন। ঠিক পনেরো দিনের মাথায় তিনি চলে এলেন। বলেন, 'বর্ধমানে কাজ আছে, আমি আবার ফিরব পিসেমশাই।' সেইদিনই বেলা ১০ টায় রায়না থানার পুলিশ সদলবলে ধীরেনবাবুর সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর বাবুর বাড়ী যায়। পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, ধীরেন মুখার্জী এসেছিলেন কি-না! জবাবে দক্ষিণেশ্বর বাবু বললেন, 'না বাবা, তার পাত্তা পাব কোথায়। তার জন্য তো আমারই মনটা কাঁদে।'

উত্তরপাড়া থেকে প্রভাসবাবুর ব্যবস্থা মত একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে শক্তিগড় স্টেশনের সন্নিকটে একটি বিশেষ স্থানে ধীরেনবাবুর দাঁড়িয়ে থাকবার কথা থাকে। উনি সেইব্যবস্থা মতই পিসেমশাইয়ের বাড়ী থেকে চলে আসেন। কিন্তু ব্যাপারটি প্রকাশ করেননি। যথাস্থানে নির্দিষ্ট লোকের সাথে দেখা হয়। উনি গোপাল বাবুর বাড়ী আসেন এবং সেখানে একদিন থাকেন। সেখান থেকে বর্ধমানের মেমারী থানার বেগুট গ্রামে ডাঃ বাদলসামন্তের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা হয়। বাদলবাবুর ভাই দাশু বাবুর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা স্থাপিত হয়। মেমারি থানার ভইটা স্কুলের শিক্ষক শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের যোগাযোগে তিনি এ আশ্রয় পান। প্রায় তিনবছর (১৯২৫ -১৯২৭) তিনি এখানে থাকেন। স্থানীয় ছাত্রদের নিয়ে তিনি পাঠশালা খোলেন এবং টিউশানিও করতে থাকেন। তাঁর আই.এ পর্যন্ত পড়া ছিল। তাই পড়ানোর ব্যাপারে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। গ্রামের মধ্যে ছদ্ম পরিচয় নিয়ে দিব্যি শিক্ষকতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুলিশ মহল ঘুণাক্ষরেও তাঁর অবস্থান টের পেল না। কিন্তু কোন দিনের জন্যও দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। দলের রাখাল মুখার্জী ও বিভূতি চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত ভাবে কলকাতার দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ধীরেন মুখার্জীর তত্ত্বাবধানেই ঐখানে বালি বামনী নাম্নী এক মহিলার বাড়ীতে দুঃসাহসিক স্বদেশী ডাকাতি সংঘটিত

হয়। সেই ডাকাতিতে দাশুসামন্ত প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

কিন্তু তিনি পুলিশের নজর এড়াবার জন্য মেমারী স্টেশনে এসে পুলিশ সুপারকে টেলিগ্রাম করেন। পুলিশের কাছে তো এমনিতে খবর যাবেই তবু যেহেতু তিনি পুলিশকে ডাকাতির খবর জানাচ্ছেন, সেই জন্য তাঁর উপর থেকে পুলিশের সন্দেহটা কেটে যায়। ডাকাতির সঙ্গে হরেকৃষ্ণ কোঙার (পরবর্তীকালের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সুবিখ্যাত নেতা) জড়িত ছিলেন। তিনি গ্রেপ্তার হন্ ও সাজা পান। এই ডাকাতির পিছনে যে ধীরেন মুখার্জীর গোপন হস্ত আছে, পুলিশ তা কোনক্রমেই টের পায় না।

ধীরেনবাবু ওখানে থাকাকালীন গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়কে ওখানে নিয়ে যান। গ্রেপ্তার হবার পর বছর খানেক গোষ্ঠবাবু জেলে থাকেন। ছাড়া পাবার পর মাস খানেক তিনি ডোমজুড়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ী (জ্ঞান চ্যাটার্জীর বাড়ী) অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন, কিছুদিন স্বগ্রামে পার্বতীপুরে থাকেন ও তারপর ধীরেন বাবুর গোপন আহ্বানে বেগুট গ্রামে যান। ধীরেন বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন এবং স্থায়ীভাবে বর্ধমানেই থেকে যান। ছেলে পড়ানোর পয়সা থেকেই দুজনের চলে যেতে থাকে।

মাঝে মাঝে দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষও ধীরেন মুখার্জীকে টাকা পাঠাতেন। বছর তিনেক ওখানে থাকবার পর ধীরেন মুখার্জীর উপর থেকে মামলা সরকার তুলে নিলেন-এই খবর রটে। তাঁর উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে ধরে নিয়ে তিনি বাড়ী আসেন। তখন খবর আসে যে, তাঁর উপর থেকে মামলা প্রত্যাহৃত হয়নি, ও মামলা প্রত্যাহৃত হয়েছে হুগলীর ধীরেন মুখার্জীর উপর থেকে। কিছুদিন ধরেই ধীরেন বাবু অসুস্থ ছিলেন। এমতাবস্থায় স্বগৃহে থাকা আর সমীচীন নয় মনে করে মহিয়াড়ীর ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর কাছে চিকিৎসার জন্য চলে যান। স্বগৃহে থাকাকালীন তিনি দিন সাতেক বেগড়ীর হেমচন্দ্র পাল কবিরাজ মশাইয়ের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। মহিয়াড়ীতে গিয়ে ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর উনশানির ডিসপেনসারিতে লুকিয়ে চিকিৎসা করাতে থাকেন। ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ এই চিকিৎসার ভার নেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরামর্শমত এই চিকিৎসা চলতে থাকে। আই বি অফিসাররা খোঁজ পেয়ে ওঁর কাছে বিবৃতি নিতে আসে। তারা বিস্কুট, মাখন এইসব নিয়ে আসে। কিন্তু ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নেন। তিনি বলেন, 'চিকিৎসার সময় গ্রেপ্তার করা চলবে না।' আই বি অফিসাররা চলে যায়। এই সময় ধীরেন বাবুর শুশ্রূষার জন্য হাওড়ার হরেন ঘোষ, জয়কেশ মুখার্জী (পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট নেতা ও এম, এল.এ) ওখানে যেতেন। আরোগ্য লাভের পর ধীরেনবাবু দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে চলে যান।

দেওঘর থেকে ফিরে এসে তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরী নেন। তখন কার্ত্তিক দত্ত কমিশনার ছিলেন। তিনিই চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন। মাস ছয়েক চাকরী

করার পর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পরের দিনই তিনি হাওড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন থেকে গ্রেপ্তার হন। এরপর প্রেসিডেন্সী জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও বক্সা ক্যাম্পে থাকেন। বক্সা ক্যাম্প থেকে মুর্শিদাবাদের লাল গোলায় তাঁকে অন্তরীণ করে রাখে। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

ধীরেন মুখার্জীর সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের নেতাদের যোগাযোগ ছিল ব্যাপক। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আই বি অফিসে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে কিনা। ধীরেনবাবু অস্বীকার করেন। তখনই তাঁকে একটি ফোটো দেখানো হয়। তাতে মুজফ্ফর সাহেব ও কয়েকজনের সঙ্গে ধীরেনবাবুকেও দেখা যায়। তখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলছে। এ থেকে বোঝা যায় মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা (১৯২৮) শুরু হবার আগে থেকেই ধীরেনবাবুর সঙ্গে মুজফ্ফর সাহেবদের যোগাযোগ ঘটেছিল।

এই যোগাযোগের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৫৩ সালে। দক্ষিণ ঝাপড়দার জেলে পাড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির একটি সভা হয়. তাতে মুজফ্ফর আহমেদ আসেন। রাত্রে ধীরেন বাবুর বাড়ীতেই থাকেন। তখন ধীরেন বাবু মারা গেছেন। কিন্তু যখন শোনেন এই বাড়ী ধীরেন মুখার্জীর তখন তিনি অস্ফুটে বলে ওঠেন—'ও ধীরেনের বাড়ী!' এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে. এক কালের নিবিড় নৈকট্য না থাকলে এমন আত্মীয়তা-সুলভ স্বগতোক্তি এই মহান বিপ্লবীর মুখ দিয়ে বের হোত না। প্রশ্ন করা সত্ত্বেও মুজফ্ফর সাহেব আর এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি।

বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ছাড়াও ভূপতি মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গেও ধীরেন মুখার্জীর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবান্দোলনের প্রয়োজনে ভূপতিবাবু ডোমজুড়ে এসেছেন। এমন কি মন্ত্রী হবার পরেও বেলভেডিয়ারে তার ভাইয়ের বাড়ীতে ধীরেন বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক জ্যোতিন ঘোষ দক্ষিণ ঝাপড়দায় ধীরেনবাবুর বাড়ি এসে প্রায় একমাস ছিলেন। তার আগেও তিনি ডোমজুড়ে এসেছেন।[৫]

সূত্রঃ

(১) বিপ্লবী আশুতোষ ভট্টাচার্য কথিত বিবরণ।

(২) ধীরেনবাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পঞ্চুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া বিবরণ।

(৩) পার্বতীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া বিবরণ।

(৫) দক্ষিণ ঝাঁপড়দায় ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. পঞ্চুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথিত বিবরণ অনুযায়ী লিখিত।

ডোমজুড় ষড়যন্ত্র মামলার প্রয়াস

দক্ষিণ ঝাপড়দার শ্যামাপদ রায়ের বাড়ি তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ বোমা, বোমা তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশ, একটি ৪৫০ নলের ওয়েবলী রিভলবার, কার্তুজ প্রভৃতি পায়। পরদিন সকালে শ্যামাপদ বাবুকে গ্রেপ্তার করে। শ্যামাপদবাবুর বাড়ি এতগুলি জিনিস পাবার পর শ্যামাপদবাবুর বন্ধু ঐ গ্রামেরই সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের নলিনাক্ষ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি পুলিশ তল্লাসী করে। কিন্তু সেখানেও কিছু পায়না। সরাসরি বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল গঠন করে এবং ঐ বছরের ১২ই আগস্ট শ্যামাপদবাবুর তিনবছরের জেল হয়।

শ্যামাপদ বাবুর বাড়ী থেকে বোমা রিভলবার প্রভৃতি পেয়ে পুলিশের মনোবল অনেকখানি বেড়ে গেল। হাতে চাঁদ পাবার মত ওরা মনে করতে লাগল কিনা কি করে ফেলবে।

আগেই দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হয়েছেন, ধরা পড়েছেন শিবপুর থেকে পার্বতীপুরের গোষ্ঠ বিহারী মুখার্জী, পার্বতীপুরের বসন্ত টেঁকির নামে মির্জাপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত মামলা শেষ হয়ে গেছে—তখন তিনি গৃহবন্দী। সুতরাং এধার-ওধার থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আরও কিছু মাল মসলা যোগাড় করে একটা ষড়যন্ত্র মামলা ঠুকে দিতে পারলে আবার দ্বিতীয় দফায় এদের জব্দে ফেলা যায়।

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডি. এস. পি ব্রজবিহারী বর্মন এই ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন। প্রেসিডেন্সী জেলে আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কাছে প্রায়ই ইনি যেতে লাগলেন এবং জেরার পর জেরা করতে থাকলেন। গোষ্ঠ বাবুকেও এখানে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে লাগলো, বন্দীরাও জেনে ফেললেন যে, এসবই হোল ষড়যন্ত্র মামলার প্রস্তুতি।

এই সময়ে বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত একজন ইঞ্জিনিয়ারও একটি খুনের মামলায় আসামী হয়ে ঐ জেলে বন্দী হিসাবে ছিলেন। তিনি আশুবাবু ও গোষ্ঠবাবুর কাছ থেকে পুলিশের ষড়যন্ত্র মামলা রজু করার পরিকল্পনার কথা শুনে ভরসা দেন যে, ইংরেজ যদি ঐ রকম একটা মামলা আদৌ আনে তবে উকিল নিয়োগের সমস্ত ব্যয় তিনি বহন করবেন। তাঁর কাছ থেকে এরকম ভরসা পেয়ে বন্দীরা খুবই আশ্বস্ত হন। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল ডোমজুড় ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি মামলা করবে। পুলিশ বুঝতে পারে যে, ডোমজুড়ের প্রায় প্রতি পাড়ায় বিপ্লব আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থক গজিয়ে উঠেছে। তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য ওরা উঠে পড়ে লাগে।

আগেই লিখেছি, দফরপুরের দুলাল কর্মকার ছিলেন একজন দক্ষ কারিকর। বিপ্লবীদের রিভলবার খারাপ হয়ে গেলে তিনি মেরামত করে দিতেন। শালকিয়া,

দক্ষিণেশ্বর, কলকাতার বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রায়ই তাঁর কাছে আসতো মেরামতির জন্যে। পার্বতীপুরের বসন্ত ঢেঁকির মারফৎ প্রথম প্রথম আসতো, তারপর শহরের অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্মীরা নিয়ে আসতেন। বসন্তবাবুই এসব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

দুলাল বাবুর নিজের কাছেও রুপার বাঁটওয়ালা ওয়েবলী রিভলবারের মত একটা রিভলবার ছিল। তাতে ছটা চেম্বার ছিল। দুলাল বাবুর খুব ঘনিষ্ঠ দু একজন সেটা জানতেন। ভাস্কুড়ের কেষ্ট চৌধুরী সেটা দেখেছিলেন। কেষ্টবাবু ছিলেন দুলাল বাবুর সমবয়সী বন্ধু। ঐ বাড়ীর চুনী কর্মকার তখন বালক মাত্র তবু দুলাল বাবুর গৃহসংলগ্ন কারখানাঘরে অন্যদের সঙ্গে চুনীবাবুও যেতেন, দুলাল বাবুর কাজকর্ম দেখতেন। বাইরের গোপন যোগসূত্রের কেউ এলে দুলাল বাবু ছোট ছেলেদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন। দুলালবাবুর কাছে প্রথম দিন রিভলবারটা দেখার পরই কেষ্ট চৌধুরী মশাইয়ের ইচ্ছা জাগে রিভলবারটা দুলালবাবু কোথায় রেখেছেন তা জানার। কেষ্টবাবু প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু দুলালবাবু বলতেন না। একদিন দুলাল বাবু ও তাঁর বড় ছেলে রাত্রে বারান্দার রোয়াকে ঘুমিয়ে আছেন। রাত তখন দুটো আড়াইটে। পাশেই গোয়ালের গরুগুলি ছট্ ফট্ করে ওঠে। গরুর পায়ের দাপাদাপিতে ঘুম ভেঙে যায় দুলাল বাবুর। উঠে গোয়াল ঘরের পাশে কিছুই দেখতে পান না। পাশে ছিল একটা আমগাছ তার পাশেই প্রস্রাব খানা। সেখানে গিয়ে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হয়। দেখেন রাইফেল নিয়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। ততক্ষণে পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে দুলাল বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। সারা বাড়ী কারখানা তোলপাড় করে তল্লাসী চলে। কিন্তু পুলিশ সামান্য কিছুও পায় না। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের ধরণ দেখে অনুমান হয় যে, দুলালবাবুর জ্ঞাতি দফরপুর গ্রামেরই রাজকৃষ্ণ কর্মকার ছিলেন নেপালের রাজার সৈন্যবাহিনীর প্রধান। তাঁর মারফৎ এখানকার বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আসতে পারে--এরকম সন্দেহই পুলিশের ছিল। বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে দুলালবাবুর যে যোগাযোগ ছিল, পুলিশের কাছে সে সংবাদ থাকা অসম্ভব ছিল না। দুতিনবার তাঁর বাড়ী এই সময়ে সার্চ হয়েছে। মাঝে মাঝে দুলালবাবুর কাছে বাইরের লোকজন আসতেন। প্রতিবেশী কেউ তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে দুলালবাবু তাঁদের সত্য পরিচয় কখনো দিতেন না। একবার তিনজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে এলেন। কারখানা ঘরে তখন পাড়ার চুনীলাল কর্মকার প্রভৃতি কয়েকটি বালক বসে ছিল। উনি তখনই পাড়ার ছেলেদের সরে যেতে বললেন। এবার গোপনে সবার আড়ালে এঁদের মধ্যে কিছু কথা হয়ে গেল। ভদ্রলোকেরা দুলাল বাবুকে একশো টাকার ৭/৮ খানা নোট দিলেন। ঠিক সেই সময়ে প্রতিবেশী সত্যচরণ কর্মকার ওখানে এসে পড়েন। তিনি দুলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এঁরা কোথা থেকে এসেছেন?'

দুলালবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'এঁরা ম্যাজিক শিখতে এসেছেন।'—ভদ্রলোকেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন।

হ্যাঁ, দুলালবাবু সত্য সত্যই ম্যাজিক জানতেন এবং শেখাতেন। নানাভাবে চেষ্টা করেও উপযুক্ত মালমশলা এবং সাক্ষীর অভাবে ডোমজুড় ষড়যন্ত্র মামলা করার স্বপ্ন ইংরাজ সরকারের ভেস্তে যায়।

সূত্রঃ দক্ষিণ ঝাপড়দার শ্যামাপদ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও দফরপুরের চুনীলাল কর্মকার কথিত বিবরণ।

—— ০ ——

নানা বিপ্লবী সংগঠন ও নেতাদের প্রভাব

"শরৎচন্দ্রের আগে হাওড়ায় মুক্তি আন্দোলনের দুটি ধারার হদিশ মেলে। এক বিপ্লব আন্দোলন; দুই কংগ্রেস আন্দোলন। শরৎচন্দ্রের মাতুল বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গেও জেলার কর্মীদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগ। এ জেলায় যাঁরা বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা তাঁরই অনুগামী বলা চলে। ডোমজুড়, ধুলোগোড়, মাজু প্রভৃতি অঞ্চলে বিপিন গাঙ্গুলীর কাজকর্ম বিস্তৃত ছিল। আর একজন বিপ্লবী ড. ভুপেন দত্তেরও হাওড়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁর যাতায়াত ছিল শিবপুরে। ওখানকার একটি যুবগোষ্ঠী তাঁর কথা শুনতো। বিপ্লব আন্দোলনে বিশ্বাসী যুবকদের নিয়ে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একটা যুবসম্মেলনও হয়। ভূপেন দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ এতে উপস্থিত ছিলেন। শিবপুর ছাড়া সুরেন ঘোষের (হরেন ঘোষের দাদা) মধ্য হাওড়ার মোজা কারখানাতেও ছিল বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি।

অনুশীলন, যুগান্তর, বিভি, হিন্দুস্থান রিপাবলিক পার্টি—এই ক'টি গোষ্ঠীর সঙ্গেই হাওড়ার যোগ ছিল এবং এখানে যাঁরা বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এই ক'টি গোষ্ঠীরই অনুগামী। তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী বিভূতি মুখোপাধ্যায় ছিলেন বার্ড মার্ডার কেসের আসামী। জীবন মাইতি, গণেশ মিত্র, অগম দত্ত প্রভৃতি ছিলেন হিন্দুস্থান রিপাবলিক দলের অনুগামী। এ ছাড়া বীরেন ব্যানার্জী, সুরেন ঘোষ, বগলাগুহ, বৃন্দাবন বসু, পুলিন রায় প্রভৃতিও বিপ্লব আন্দোলনে ছিলেন।" [১]

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী

বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অসামান্য প্রভাব পড়ে হাওড়া জেলার নানাস্থানের যুবকদের উপর। শালকিয়া, শিবপুর, মাজু, মধ্যহাওড়া, ডোমজুড়, বলুহাটি প্রভৃতি নানা এলাকায় গ্রুপ গড়ে ওঠে।

তাঁরই নির্দেশে ডোমজুড়ের উত্তর ঝাপড়দার মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর পুত্র নিরাপদ গাঙ্গুলী মেদিনীপুরের খড়গপুর স্টেশনে সংকেতমত এক যুবককে একটি রিভলবার দিয়ে এলেন। মার্টিন ট্রেনের সেলুনকারে হাওড়ার জেলাশাসকের আমতা যাবার পথে রাজাপুর ১নং ব্রিজের কাছে বোমা ছুঁড়লেন নিরাপদ গাঙ্গুলী ও কালীপদ দে। কলকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় দলে দলে হাওড়ার যুবকরা সেখানে যান এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সব রকম দায়িত্ব পালন করেন। ফেরার অবস্থায় তাঁকে বলুহাটি হয়ে জনাইয়ের পথে পৌঁছে দিয়েছেন খাটোরার অমরেন্দ্র ব্যানার্জী, দক্ষিণ ঝাপড়দার দীনেশ চ্যাটার্জী ও ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য। তারকেশ্বরে সঙ্গী হিসাবে গেছেন উত্তর ঝাপডদার নিরাপদ গাঙ্গুলী। বলুহাটির উপেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁরই নির্দেশমত অস্ত্র এনেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন বলুহাটির শ্মশানের বটগাছের কোটরে। প্রয়োজনমত অন্য গুপ্তস্থানে রাখা অস্ত্র বের করেও দিয়েছেন। [২]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মাজু গ্রামে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর প্রভাবে একটি গ্রুপ গড়ে ওঠে। ঐ গ্রামের ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। [২ক]

বিপ্লবী ভগৎসিং

হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের শাখা হাওড়াতেও গড়ে ওঠে। যাঁরা এই শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন--কালী সেন, গণেশ মিত্র, বলাই সিংহ, জীবন মাইতি, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অগম দত্ত, বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), ইন্দুভূষণ ব্যানার্জী (পিতা-সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জী) বিজয় পাল প্রভৃতি। বিভিন্ন আন্দোলনে এঁরা অংশ নিয়েছিলেন।

খুরুট রোডে (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) হরিবিরাজ আশ্রম হোটেলের উপরতলায় বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন। বর্ধমান থেকে এসে শালকিয়ায় বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ঘোষ লেনে (ডাঃ প্রকাশ চন্দ্র আঢ্যের পুরাতন বাড়ির পিছনে) তাঁর পিতৃব্য বঙ্কুদত্তের বাড়িতে তিনি কিছুদিন ছিলেন। [২খ] পরে হরি বিরাজ আশ্রমে আসেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় মেথর ধর্মঘটের সমর্থনে তিনি কয়েকদিন বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। [২গ] এই হোটেল থেকে তিনি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠে কানপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসেন হাওড়ার অমৃত পাইন লেনের গণেশ মিত্র

ও ডোমজুড়ের পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'ট্রেড ডিসপিউট বিলে'র আলোচনার সময় ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করেন। [৩]

'হাওড়া জেলার ইতিহাস' গ্রন্থের ২১১পৃষ্ঠায় হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"জ্ঞানী জৈল সিং ঐ দলের একজন সদস্য ছিলেন। ভগৎ সিং-এর ফাঁসির পর পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। সেই সময় মধ্য হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনের ৪৩/১নং বাড়িতে তাঁকে গোপনে রাখার ভার পড়েছিল বিপ্লবী কানাইলাল ব্যানার্জীর উপর।" উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে, জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপতি থাকাকালে কানাইবাবু তাঁর সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে হাওড়ার বিভিন্ন যুব সংগঠনের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯২৮ সালের ২১শে জুলাই উত্তর মৌড়ীর খটি অঞ্চলে 'আন্দুল-মৌড়ী যুব সঙ্ঘ' স্থাপিত হয়। এই সংঘ স্থাপন উপলক্ষে ড. দত্ত প্রথম খটিতে আসেন। পরে প্রায়ই আসতেন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য যুবকদের উৎসাহিত করতেন। শিবপুরের বিপ্লবী যুবকদের উপরও তাঁর প্রভাব ছিল। [৪]

সূত্র : (১) এস. টি.ই,এ-র ত্রয়োদশ সম্মেলনের স্মরনিকা গ্রন্থ: প্রবন্ধ 'হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা'--শিশির কর। (২) নিরাপদ গাঙ্গুলী, ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রদত্ত তথ্য। (২ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ-প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)। (২খ) হাওড়া জেলার ইতিহাস-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২০৯)। (২গ) আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মজফ্‌ফর আহ্‌মেদ।(পৃঃ ৪৮১)।(৩) উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত ও ইতিহাস গ্রন্থ অনুসারে লিখিত। (৪) মৌড়ীর গোপাল চক্রবর্তী কথিত।

—— o ——

দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা

বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতের বিপ্লবীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাসাজসে কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। যতীন দাশ (যিনি পরে লাহোর জেলে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন তিনি) বোমা প্রস্তুতকারী কর্মীদের অনুরোধ জানান দেওঘরের বিপ্লবান্দোলনের কর্মীদের বোমা বানানো শিখিয়ে আসতে হবে। সেই অনুযায়ী তিনি,

তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীবন্ধু বিশ্বনাথ মুখার্জী, রাজেন লাহিড়ী (পাবনার লোক কিন্তু বেনারসের বাসিন্দা এবং পরবর্তীকালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত), বোমা বিশারদ হরিনারায়ণ চন্দ্র, শালকিয়ার বীরেন ব্যানার্জী, উত্তরপাড়ার ভূমেশ চ্যাটার্জী (ধ্রুবেশের ভাই) প্রভৃতি দেওঘরে যান। সেখানে কয়েকদিন থেকে বোমার ফরমূলা সহ এঁরা বোমা বানানো শেখান এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আশানুরূপ হয়েছে কি-না পরীক্ষা করে দেখান। সেখানকার কর্মীরা সবটা বুঝে নেবার পর এঁরা চলে আসেন। আসার সময় প্রচুর মশলাপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র এঁরা নিয়ে ফেরেন। পাছে রেলের যাত্রীদের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাই যতীন দাশ ও তার সহকর্মীরা স্ফূর্তিবাজ ছেলেদের মত গান গেয়ে হুল্লোড় করতে করতে সহযাত্রীদের মাতিয়ে দিতে দিতে চলে আসে। কেউ কোন রকম সন্দেহ করেনি।

এই বোমা-তৈরী প্রণালী উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ভগৎ সিং প্রভৃতির কাছে ছড়িয়ে যায়। এমন কি পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ও টাইপ করা ফরমুলার এক কপি চেয়ে পাঠান।

১৯২৭ সালের অক্টোবরে দুমকার কাছে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। দেওঘরের তেজেশ ঘোষের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যোগাযোগ ছিল। তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির জনৈক চা-বাগান মালিকের পুত্র। পুলিশ কিছুদিন ধরে তাকে সন্দেহ করে আসছিল। দুমকার বোমা বিস্ফোরণের সূত্রে তাঁর বাড়ি খানাতল্লাসী হয় এবং পুলিশ কিছু অস্ত্র পায় ও একটা ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁদে দেবার মতলব ভাঁজে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহবশত: কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে। শালকিয়ার বিজন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (পিতা সতীশ), লক্ষীকান্ত ঘোষ (যিনি বোমা টার্ন করে দিতেন)। এ ছাড়া বিভিন্নস্থানের সুরেন ভট্টাচার্য, ও বীরেন ভট্টাচায (দুভাই), শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্র চন্দ্র ধর, সুখেন্দু বিকাশ দত্ত, প্রসাদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার সেন, অতুলকৃষ্ণ দত্ত, বিশ্বমোহন সান্যাল, উনসানির নারায়ণ দাস দে প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। নারায়ণ বাবুর ভগিনীপতির ওখানে মিষ্টির দোকান ছিল। নারায়ণবাবু ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ওঁর ভগিনীপতি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, নারায়ণবাবুও গ্রেপ্তার হন। নারায়ণবাবুর সঙ্গে বিপ্লবীদলের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। ফলে, নারায়ণবাবুকে পেয়ে পুলিশ তাঁর ভগিনীপতিকে ছেড়ে দেয়। কিছুদিন পর নারায়ণবাবুও অজ্ঞাতকারণে মুক্ত হয়ে যান। ১৯২৮-এর জানুয়ারীতে দেওঘর কোর্টে মামলা শুরু হয়। ১লা জুলাই ১৯২৮ রায় বের হয়। তাতে দণ্ড হয়ঃ শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রচন্দ্র ধর-প্রত্যেকের ৭ বছর, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য. সুখেন্দুবিকাশ দত্ত, বিজন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রসাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার সেন--প্রত্যেকের পাঁচবছর, অতুলকৃষ্ণ দত্ত, লক্ষীকান্ত ঘোষ, বিশ্বমোহন সান্যাল প্রত্যেকের তিনবছর।

সূত্র : বিপ্লবীর সাধনা (১মখন্ড)-হরিনারায়ণ চন্দ্র (পৃ: ১১৬-১১৭); বাঙলার বিপ্লব সাধনা— পুলকেশ দে সরকার (পৃ. ১১২); ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুপূর্বিক সর্বতথ্য সার সংগ্রহ— জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (পৃ: ১০১১); পাঁচশো বছরের হাওড়া— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃ:১০৬), মৌড়ীর গোপাল চক্রবর্তীর দেওয়া বিবরণ।

—— ০

হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৩০ সালের ১৬ই মে ভোর অনুমান ৩টে ৪৫ মিনিটের সময় ৫১নং বাজে শিবপুর রোডে শিবপুর থানার সাব-ইনস্পেকটর ফণীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বোমা নিক্ষেপের ঘটনা নিয়ে ১৬ই মে শিবপুর থানায় ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৩/৪-বি/৬ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়।

১৭ই মে সকালে হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেন থেকে ভবানন্দ ব্যানার্জীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শচীন্দ্রনাথ খাঁ সমেত আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। ১৮ই মে সকাল দশটায় অভিযুক্তদের হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। শচীন্দ্রনাথ খাঁকে পুলিশ হেফাজতে রেখে বাকি অভিযুক্তদের হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে গ্রেপ্তার হন মনোমোহন অধিকারী ওরফে নব।

পুলিশের প্রার্থনা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ২১শে মে ভবানন্দ ব্যানার্জীকে জেল হাজত থেকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় এবং ২২শে মে আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দেয়।

মূল আসামীদ্বয় ভবানন্দ ও মনোমোহন আদালতে অভিযোগ অস্বীকার করায় ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত হন ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুদ নেওয়া হয়। শচীন্দ্রনাথ খাঁ আসামী হিসাবে গ্রেপ্তার হলেও পরে সে ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষের ১৪নং সাক্ষী হয়।

ট্রাইবুনাল সিদ্ধান্তে আসেন যে, মনোমোহন (নব) অধিকারী পুলিশ ইনস্পেকটরের ঘরে বোমা ছুঁড়েছিলেন। ভবানন্দ বোমা তৈরির মালমশলা যোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই মোকদ্দমায় সন্দেহবশে আরও যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাইবুনালে মনোমোহন ওরফে নব অধিকারীরকে বিস্ফোরক আইনের ৩ ও ৪

(বি) ধারায় এবং ভবানন্দ ব্যানার্জীকে বিস্ফোরক আইনের ছ ধারায় পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

আসামীরা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি র‍্যানকিনস্, বিচারপতি সি.সি.ঘোষ ও বিচারপতি বাকল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চে আপীল মামলার শুনানী হয়। দণ্ডিত আসামীদের হাইকোর্টে পক্ষ সমর্থন করেন তদানীন্তন কালের প্রখ্যাত আইনজীবী সন্তোষ কুমার বাসু।

হাইকোর্টে আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবী এই মর্মে সওয়াল করেন যে, আসামীরা পুলিশের প্ররোচনায় ও অত্যাচারে বাধ্য হয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আসামীপক্ষের এই বক্তব্য আদালত গ্রাহ্য করেন নি। কারণ, স্বীকারোক্তি গ্রহণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট এঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ওঁরা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য নন, ওঁরা স্বীকারোক্তি না-ও দিতে পারেন। পুলিশের প্ররোচনায় বা অত্যাচারের ভয়ে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, না স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন--ম্যাজিস্ট্রেটের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে উভয় আসামীই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন বলে জানিয়েছিলেন।

হাইকোর্ট মনোমোহন অধিকারী (নব)-র স্বীকারোক্তি পর্যালোচনা করে দেখেছিলেন। তাঁর স্বীকারোক্তিতে দেখা গেল যে, তিনি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে লবণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলনে এবং পিকেটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। হৃষীকেশ দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে হাওড়া ময়দানে পুলিশের কাজকর্মের বিরুদ্ধে একাধিকবার যুক্তি পরামর্শ হয়েছে এবং তিনিই তাঁকে তৈরী করা ঐ বোমাটি দিয়েছিলেন। বোমাটি আকারে একটি টেনিস বলের মত ছিল। ওটি তিনি যতীন দত্তর বাড়ির পিছনে ইটের গাদায় লুকিয়ে রেখে রাত্রে ঐ বাড়িতেই শুয়েছিলেন। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বোমাসহ বাজে শিবপুরে আসেন এবং পুলিশ ইনস্পেকটরের ঘরের জানালা দিয়ে বোমাটি ছুঁড়ে দিয়েই সবার অলক্ষ্যে যতীন দত্তর বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে। শুক্রবার সারা দিনরাত তিনি নিজের বাড়িতেই থাকেন। ব্যাপারটি নিয়ে খুবই হৈ চৈ হওয়ায় মনোমোহন চন্দননগরে এক সহপাঠীর বাড়ি যান, সহপাঠীকে না পেয়ে ফিরে আসার পথে নিজেদের পাড়ার এক চেনা বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ওঁর আশ্রয়হীনতার কথা শুনে তাঁর জামাইবাড়ি নিয়ে যান। সেখানেও আশ্রয় না মেলায় হাওড়াতেই ওঁকে ফিরে আসতে হয়। তারপর পুলিশ তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ও পরের দিন তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়।

সরকারপক্ষের সাক্ষী মহেশমোহন চন্দ্র ট্রাইবুনালের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে নবকে

সনাক্ত করে বলেছিলেন যে ওঁর সাথে ১৭ইমে বিকেল অনুমান ৪টার সময় তাঁর বৃদ্ধা দিদিমাকে নিয়ে হাওড়ায় ফেরার জন্য চন্দননগর স্টেশনে যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল। সরকার পক্ষের অপর সাক্ষী চন্দননগর নিবাসী বারীন্দ্র অধিকারী বলেছিলেন যে, ১৭ই মে বিকালে একটি যুবক তাঁদের বাড়ি আশ্রয় নেবার জন্য গিয়েছিলেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন যে, লবণ-আইন ভাঙার আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। বারীন্দ্র তাঁকে বাড়ি ফিরে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্টেশনের পথে দেখা হওয়া মনোমোহনের পাড়ার বৃদ্ধার জামাতা হলেন বারীন্দ্রের বাবা যতীন্দ্র অধিকারী। বারীন্দ্র অবশ্য কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো মনোমোহনকে চিনতে পারেন নি।

গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জেনেছিল যে, মনোমোহন যতীন দত্তের বাড়িতে ছিলেন। তাই যতীনদত্তের বাড়ি তল্লাসী হয় এবং পুলিশ সেখানে মনোমোহনের কিছু বই ও কাগজপত্র পায়। মনোমোহনের স্বীকারোক্তিতে বলা বোমার আকৃতির সঙ্গে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের অভিমতের মিল ছিল।

হাইকোর্টে মনোমোহনের আপীল খারিজ হয়ে যায় ও ট্রাইবুনালের রায় বহাল থাকে।

ভবানন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, তিনি হৃষীকেশ দত্তকে কিছু রেড আর্সেনিক ও বুলেট সংগ্রহ করে গণেশ নামক এক যুবকের মারফৎ দিয়েছিলেন। তাই দিয়েই বোমা নির্মিত হয়েছিল।

ভবানন্দের আপীলও খারিজ হয়ে যায়।

উভয়ের আপীল খারিজের তারিখ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩১।

সূত্র : চিন্ময় চৌধুরী প্রণীত 'আদালতের আঙিনায়' গ্রন্থের 'হাওড়া বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' নিবন্ধ।

— o —

চিকিৎসকের সহায়তায় জীবনরক্ষা

শালকিয়ার বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য কলকাতার শাঁখারিটোলা পোস্টমাস্টার মার্ডার কেসে গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকাকালীন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ফাঁসী দেওয়া আইনত নিষিদ্ধ। গলা দিয়ে রক্ত ওঠায় তাঁকে পুলিশ প্রহরায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। তাঁকে কেবিনে রাখা হয়েছিল। বিপিনবাবুর কাছে ডাক্তারবাবুরা তাঁর জীবনকাহিনী শোনেন। বিপিনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র—ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ ও বি-এ পরীক্ষায় তাঁর রেজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়; কিন্তু এম-এ পরীক্ষায় তাঁর ফল আশানুরূপ হয় না। তিনি মনস্থ করেন জীবন রাখবেন না, মহৎ কাজে জীবন দেবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পোস্টমাস্টারকে গুলী করেন অন্য লোক; কিন্তু দলে ছিলেন এবং পালাতে না পারার জন্য গ্রেপ্তার হন। নিজের মৃত্যু যেহেতু নিজেই আকাঙ্ক্ষা করছিলেন তাই ফাঁসীর আদেশে তিনি বিচলিত হননি। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁর অমূল্য জীবনটি বাঁচাতে সচেষ্ট হন। এই ডাক্তারবাবুদের মধ্যে হাওড়া জেলার কাটলিয়ার ডাঃ সন্তোষকুমার দাসও ছিলেন। ফুসফুসে টিউবারকুলোসিসের কোন লক্ষণ না দেখে ডাক্তারবাবুরা বুকে একটা 'স্ট্রাইকার' লাগিয়ে এক্স-রে তোলেন। যথারীতি বিপিনবাবু টি.বি.রোগী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান। টিউবারকুলোসিসের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডাঃ এ.সি. উকীল। তিনি ঐ রোগীর বিষয় জানতে চাইলেন। ডাক্তারবাবুরা রোগীর এক্স-রে প্লেট হাজির করতে ডাঃ উকীল তাঁর অভিজ্ঞ চোখে দেখেই বললেন— 'এটা কিরকম হলো বলত?' ডাঃ সন্তোষ দাস তখন হাতজোড় করে ডাঃ উকীলকে বললেন, 'স্যার, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট—বরাবর ফার্স্ট হয়েছে, এম.এ-তে সেকেণ্ড হয়েছে, সেই অভিমানে ফাঁসীতে যেতে চাইছে। আপনিও তো বিপ্লবী দলে ছিলেন, ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে M.S.P.E (প্যারিস) পাশ করলেন। আপনি এটা পাশ করিয়ে দিন স্যার।'

ডাঃ উকীল জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি সই করেছ?'

ডাঃ দাস—'হ্যাঁ, স্যার।'

ডাঃ উকীল কাউন্টার সাইন করে দিলেন।

রোগীর ব্যাপার জানবার জন্য সি.আই. ডি থেকে লোক আসে। ডাঃ উকীলকে জিজ্ঞাসা করে—Do you think, it is a case of tuberculosis?

—-Why think? It is a clear case of tuberculosis.

—How long it will take for the treatment?

—At least three years.

বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের ফাঁসী স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারতশাসন আইন বলে দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বহু বন্দী মুক্ত হন। সেই সঙ্গে বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যও মুক্ত হন। মুক্তিলাভের পর তিনি হোর মিলার এণ্ড কোং-এর বাঁধাঘাট-নিমতলা রুটে বন্ধ হয়ে যাওয়া ফেরী স্টীমার আবার চালু করেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে স্টীমার মেরামতির কারখানা করেন। জানা যায়, তিনি একটি জাহাজও তৈরি করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি জাহাজ তৈরি করেছিলেন।

সূত্র ঃ কাটলিয়া নিবাসী বিখ্যাত বক্ষ-চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার দাস কথিত। তাঁর বয়স এখন (১৭.২.৯৯) তিরানব্বই বৎসর।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 'পথের দাবী'

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভাবা যায়না। এক দশকের অধিককাল ধরে হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে তিনি অবস্থান করছিলেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সারা হাওড়া জেলাতেই শরৎবাবুর চেয়ে অধিকতর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ কেউ ছিলেন না। হাওড়ার বাজে শিবপুরে তিনি বাস করেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। প্রথমে তিনি ওঠেন ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে, তার পরে আসেন ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে। তারপর তিনি পানিত্রাসের সামতাবেড়ে বাড়ি তৈরি করে বাস করতে থাকেন।

রাজনৈতিক কর্মধারায় জেলা কংগ্রেস সভাপতিরূপে একদিকে তিনি যেমন ছিলেন অহিংস অসহযোগের অন্যতম সংগঠক—আবার, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী থেকে নায়ক পর্যন্ত সবাইকেই তিনি অর্থ সাহায্য থেকে শুরু করে যুক্তি পরামর্শ সবই দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির প্রার্থীদের তিনিই ঠিক করে দিতেন, কংগ্রেসের থেকে কে কে চেয়ারম্যান ভাইস-চেয়ারম্যান হবেন তা-ও ঠিক করে দিতেন, আবার মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিক কর্মচারীদের নেতারা যখন শ্রমিকদের দুঃখবেদনার কথা জানিয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রস্তাব দিতেন, শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করতেন। শ্রমিক ধর্মঘট যখন দীর্ঘদিন ধরে চলতো, কর্তৃপক্ষকোন সমাধানে আসতেন না, শ্রমিক নেতারা অনন্যোপায় হয়ে শরৎবাবুকে গিয়ে ধরতেন। শরৎবাবু ছুটতেন চেয়ারম্যানের কাছে, দাবি

তুলতেন শ্রমিকদের দাবি মিটিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত শরৎবাবুর জেদাজেদিতে শ্রমিকদের দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষ মীমাংসায় বসতে বাধ্য হতেন।

শরৎচন্দ্রের উদার রাজনৈতিক মানসিকতা তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস রচনায়ও প্রতিফলিত। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা থেকে ১৩৩২ বৈশাখ পর্যন্ত 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রচিত হচ্ছিল 'জাগরণ' উপন্যাস। এটি অসমাপ্ত উপন্যাস হিসাবেই রয়ে গেছে। এই সময়েই ১৩২৯-১৩৩২ বঙ্গাব্দের সময়কালের মধ্যেই 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত 'পথের দাবী' উপন্যাস। এই সময়ে তিনি হাওড়া জেলার কংগ্রেস আন্দোলনের অন্যতম নায়ক কিন্তু দুটি ভিন্ন ধারার আন্দোলনেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক। যদিও দুটি ধারা ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একমুখী। একদিকে বিদ্রোহহীন আত্মশক্তিতে বলীয়ান অহিংস অসহযোগ, অন্যদিকে সহিংস সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন—এই দুই ধারার সমর্থনের মধ্য দিয়েই আমরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ মহান দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'পথের দাবী' ইংরাজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। প্রথমে বাংলা সরকার পরে মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। পুলিশ বহু স্থানে এই পুস্তকের কপি পাবার জন্য সার্চ করে। শিবপুরে হরিহর শেঠের জিমনাস্টিক ক্লাব, রামকৃষ্ণপুরের অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি সার্চ হয়।[১]

'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হবার পর অনেকেই আশঙ্কা করতে থাকেন যে গ্রন্থের লেখক শরৎচন্দ্র এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন পুলিশকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর স্যার তারকনাথ সাধু সরকারকে জানালেন যে এই দুই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে গ্রেপ্তার করলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সেই কারণেই সরকার এ ব্যাপারে নিরস্ত হন।[২]

'হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের 'শরৎচন্দ্রও বাজে শিবপুর' নিবন্ধে ডাঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীদের যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ করে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' থেকে 'পথের দাবী' রচনার চারিত্রিক উপাদান কোন কোন বিপ্লবীদের জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে সেই উদ্ধৃতিটি দিয়েছেনঃ

"দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহপ্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা—এইগুলি নিয়েছেন ঁযতীন মুখার্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, নানাদেশ ঘুরে বেড়ানো ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠনের দিকটা নিয়েছেন ঁরাসবিহারী বসু ও ঁনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম.এন.রায়)-এর জীবন থেকে, নানা দেশের

ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাসের জীবন থেকে। দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলবার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনের ছাপ আছে।"

একদিন দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র যথাক্রমে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নির্বাচিত হওয়ায় তাঁদের অভিনন্দন জানাতে শরৎচন্দ্র কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে 'পথের দাবী'-র কথা প্রসঙ্গে বললেন, "আমার 'পথের দাবী'র নায়কের চরিত্রে বিপিন মামা, মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং রাসবিহারী বসুর ছাপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম এই ঘরের মধ্যেই রয়েছে আমার নায়কের ছবি।"

সুভাষচন্দ্রকেই সব্যসাচীরূপে ইঙ্গিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র।[৩]✓

'পথের দাবী' ব্রিটিশ রাজ বাজেয়াপ্ত করলেও গোপনে ছাপা এবং বিক্রি হতে থাকে।

শরৎচন্দ্রের কোল্ট রিভলবারটি পুলিশ নিয়ে নেয় এবং স্বয়ং চার্লস টেগার্ট শরৎচন্দ্রকে জেরা করেন। পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট কলসন শরৎবাবুকে বলেন যে যেখানেই বিপ্লবীরা ধরা পড়ছে, সেখানেই একখানি করে গীতা ও একখানি করে 'পথের দাবী' পাচ্ছে।[৪]

✓"পথের দাবীতে আমরা দেখতে পাই কর্তব্য নিষ্ঠার (duty) প্রতীক টেলিগ্রাফের পিওন হীরা সিং। আন্তর্জাতিক সাহিত্যে একমাত্র ★ সার্জেন্ট জাভার্টের সাথে তুলনা চলে— যে জাভার্ট, তাঁর কর্তব্য করতে না পেরে, জীন ভালজাঁকে বন্দী করতে তার বিবেক চাইল না, সে সীন নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করল। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে—ঘরে বাইরে যেন প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে, সব্যসাচী বিদায় নিচ্ছেন—বর্মায় তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, বিপ্লব প্রচেষ্টায় দেখা দিয়েছে ভাঙন-- ব্যর্থতার প্রচ্ছন্নরূপে, হীরা সিং দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছেন তাঁর সন্ধানী কাজে সৈনিকের Sentry duty-তে, ডাক্তার তাঁর কীট ঘাড়ে করে সেই প্রলয় ঝঞ্ঝার মধ্যে চললেন— যে পথের কোনদিন শেষ নেই।

অনাগত ঘটনাকে এমন বাস্তব রূপ দিতে সাহিত্যে আর কোন শিল্পীই পারেন নি। আমরা দেখতে পাই ১৯৪৫-এর এপ্রিলে নেতাজী বেতার রেঙ্গুন হতে তাঁর বিদায় বাণী দিচ্ছেন এমনি দুর্দিনে, তখন বৃটিশ সৈন্য রেঙ্গুনে প্রবেশ করেছে—তিনি বলছেন বর্মায় আমাদের কাজ শেষ হয়েছে—তবে এ সংগ্রামের শেষ নেই, আমরা দক্ষিণ এশিয়া হতে, আমাদের সব বল একত্রিত করে, ব্রিটিশকে আঘাত হানবো।

আরো দেখতে পাই, যখন ইমফাল হতে তাঁর দুর্মদ রণক্লান্ত সৈন্যরা ফিরছে, উত্তর বর্মায় কী দারুণ বৃষ্টি নেমেছে, তারই মধ্যে সব্যসাচীর মত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি নিজের কীট ঘাড়ে করে এসে আশ্রয় নিলেন টিমুতে, এক ভাঙা টিনের চালায়।

সুমিত্রা, ভারতী এঁদের রূপান্তর আমরা দেখতে পাই—মেজর লক্ষ্মী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অসংখ্য নারীবাহিনী ইরা, সিপ্রা, রেবা প্রভৃতির মধ্যে।........

এইখানে তিনি ঋষি, তাঁর দেখা কত সত্য। সত্যই তিনি অনাগত ঘটনাকে দেখতে পেয়েছিলেন; এমন দেখা আর কেউ দেখেনি। আমরা দেখতে পাই, সব্যসাচীরই মত, ১৯৪৫-এর ১৮ই আগস্ট ব্যাঙ্কক হতে নেতাজী প্লেনে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে—চলেছেন একা মানুষের সর্ববিধ অধিকার স্বীকারের দাবী নিয়ে অনিশ্চিতের যাত্রাপথে, কেউ জানেনা কোথায়?" ★ভিকটর হিউগোর লা মিজারেবল।

[উদ্ধৃতি—'বিপ্লবী শরতের জীবন প্রশ্ন'—শৈলেশ বিশী (পৃঃ ১১০-১১২)]

সূত্র ঃ

১) বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্র—বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র-সম্পাদক ঃ নির্মলকুমার খাঁ (পৃঃ ৮৯)]

২) শরৎস্মৃতি—ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত (পৃঃ ২০)

৩) ঐ (পৃঃ ২৫)

৪) শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা-অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (পৃঃ ২৮)

কয়েকটি আক্রমণ

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাওড়া-আমতা রেললাইনে অবস্থিত পাতিহাল রেল-স্টেশন সংলগ্ন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এতে তিনজন কনস্টেবল আহত হয়।[১]

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল হাওড়া জেলার আমতা থানার বড় দারোগার বাসায় একটি বোমা পড়ে। তার ফলে একজন কনস্টেবল আহত হয়।[২]

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের একটি ঘটনা,—

"৬ই মার্চ হাওড়ার কয়েকজন বিপ্লবী যুবক সশস্ত্র হইয়া একটি থানা আক্রমণ করে। যুবকেরা প্রথমে থানার মধ্যে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে এবং বোমার আঘাতে কয়েকজন কনেস্টবল ও একজন দারোগা আহত হয়। তারপর বিপ্লবীরা থানার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে দুইজন কনেস্টবল থানার অফিস হইতে বন্দুক লইয়া আক্রমণকারীদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। আক্রমণকারীরা অবশেষে পলাইয়া যায়। তাহাদের দুইজন ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় এবং আরও কয়েকজন পরে ধরা পড়ে—" ৩

'খিলার হিরালাল দোয়ারি ও কল্যাণচক পুরের নবেন ও সুফল অধিকারী আমতার বড়ময়রার কাছে ৬ হাজার টাকা ডাক লুট করেন। ঐ টাকাটা যাচ্ছিল হরিশপুর পোস্ট

অফিসে। ঐ টাকা বিপিন গাঙ্গুলীর হাতে দেওয়া হয়।' [৪]

সূত্র ঃ (১) (২) (৩) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস—সুপ্রকাশ রায় (পৃঃ ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯৯)

৪) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়-অমিয় ঘোষ।

সুদূর আন্দামানে

শিবপুর থানা আক্রমণ ও বোমা ফেলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৩৪ সালে শিবপুরের বিপ্লবী অবনী মুখার্জী দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে প্রেরিত হন। আন্দামান সেলুলার জেলেই অবনী মুখার্জী কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং বেরিয়ে এসে তিরিশের দশকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[১]

রামকৃষ্ণপুরের গোপীনাথ চোংদার লেনের সতীশচন্দ্র ব্যানার্জীর পুত্র, 'হাওড়া ভলান্টিয়ার্স' ও সেবাসঙ্ঘ ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য সুশীল ব্যানার্জী (সোনা) বৈপ্লবিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং কলকাতায় রিভলবার সহ ধরা পড়ে তাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।[২] প্রথমে তিনি শিবগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ বুলেটিন প্রচারকালে ও বে-আইনী জনসভা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। জেলখানায় বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের দিকে ঝোঁকেন ও ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে রিভলবার ও কার্তুজ সমেত ধরা পড়েন ও ৫ বছরের সশ্রম দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। বাইরের বন্দীমুক্তি আন্দোলন ও আন্দামানে বন্দীদের অনশন সত্যাগ্রহ তীব্র হওয়ার পর ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আন্দামান থেকে কলকাতার (দমদম) জেলে বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হয়। পরে মুক্তি দিয়ে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়।[২ক]

কালীচরণ ঘোষ লিখিত 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' গ্রন্থের ৬৩৬ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"কলিকাতাঃ আড়পুলি লেন—বহিরাগত জাহাজের কর্মচারীদের কাছ থেকে আগ্নেয়য়াস্ত্র সংগ্রহ হয় বলে পোর্ট পুলিশ এ সময়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। সন্ধান পেয়ে আড়পুলি লেনে হানা দিয়ে, ১৯৩৪ জানুয়ারী ২৫-এ, পুলিশ ১৪ টা কার্তুজ পায়, এবং এ সম্পর্কে রাখাল দাস মল্লিক ও কমলাকান্ত শ্রীমানীকে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থ চালান দেয়। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩৪ মার্চ ১৬-ই প্রত্যেককে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।"

ডোমজুড় থানার মাকড়দহ শ্রীমানীপাড়ার কমলাকান্ত শ্রীমানী ১৯৩২ সালে

গান্ধীবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়ে মাকড়দায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন, সঙ্গে থাকেন জুজারসাহার দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, মাকড়দার গোপীকান্ত শ্রীমানী (পিতা বিশ্বনাথ) ও লক্ষণ ব্যানার্জী। কমলাকান্ত বাবুর ৬ মাস জেল ও ৫০ টাকা ফাইন হয়। পুলিশ ওঁর বাবার কাছ থেকে এসে জরিমানার টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। হিজলী জেলে বন্দীজীবন যাপন করার সময় প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মুক্তির পর শিবপুরে ডাঃ বেনী দত্তের বাড়ীতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)-র ক্লাসে যোগ দিতে থাকেন এবং ওখানেই শিবপুরের বিজয় পাল, অগম দত্ত, জীবন মাইতি, পান্নালাল দত্ত, আহিরীটোলার রাখাল মল্লিক, জোড়াবাগানের অর্ধেন্দু মিত্র প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শিবপুরে অগম দত্তের ওযুধের দোকানে সকলে সম্মিলিত হতেন। সেখানে রিভলবার সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হবার বিষয় আলোচনা হয়। বিজয়পাল রিভলবার সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে যান। (পরে তিনি আসানসোল অঞ্চলের শ্রমিক নেতা হন এবং সি পি আই ও সি.পি.আই (এম) প্রার্থীরূপে কয়েকবার এম.এল.এ-ও হন।') আহিরীটোলার রাখাল দাস মল্লিক রিভলবার পাবার হদিস দেন। ইয়াসিন নামে পোর্টপুলিশের একজন স্পেশাল স্টাফ (S.S.P.P) রিভলবার দেবে কথা দেয়। মেডিকেল কলেজের সামনে সে টাকা নেবে এবং আড়পুলি লেনে রিভলবার দেবে। রাখাল মল্লিক এইসব যোগাযোগ করেন। ইয়াসিন কয়েকদিন যাবৎ ঘোরায়। তার উপর টাকা নেবে এক জায়গায়, রিভলবার দেবে আর এক জায়গায়—সব ব্যাপারটাই কমলাকান্ত বাবুর সন্দেহের সৃষ্টি করে, কিন্তু রিভলবার পাবার আনন্দে সব সন্দেহ চাপা পড়ে যায়। নির্ধারিত দিনে আড়পুলি লেনে ঢুকেই কমলাকান্তবাবু কয়েকজন সাদা পোষাকের পুলিশ দেখতে পান। কিছুটা যাবার পরই পুলিশ ঘিরে ধরে। কমলাকান্তবাবু 'পকেটমার' 'পকেটমার' বলে চেঁচাতে থাকেন। একজন পুলিশ ওঁর পকেটে একটা রিভলবার ঢুকিয়ে দিয়েই মারতে থাকে, এদিকে ট্রাম ভর্তি পুলিশ এসে নামে। ওঁকে টানতে টানতে বউবাজার থানায় নিয়ে যায়। তখন ওঁর সারা দেহ পুলিশের মার খেয়ে রক্তাক্ত। রাখালদাস মল্লিককে আগেই বউবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। ঐ ভাবেই রাখালবাবুর পকেটে পুলিশ কিছু কার্তুজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর ১৫ দিন লালবাজার লক আপে রাখে। প্রতিদিন সকাল ১০ টায় ইলিসিয়াম রো'তে নিয়ে যেত, বেলা ৪টা পর্যন্ত চলত জিজ্ঞাসাবাদ। পনের দিন পর পাঠিয়ে দেয় প্রেসিডেন্সী জেলে।

কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুশীল সিনহার এজলাসে বিচার হয়। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার জে.সি.গুপ্ত। উভয়ের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড হয়।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে হাসপাতাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের ওষুধ পাচারের প্রতিবাদ করায় অতিরিক্ত ৯ মাসের সাজা হয়। এই জেলে কিছুদিন থাকার পর আন্দামানে প্রেরিত হন। আন্দামানে বছর দুয়েক থাকার পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আবার প্রেরিত হন। মেয়াদ শেষ হবার ৯ মাস আগেই সেখান থেকে ছাড়া পান। বাড়িতে অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে থাকার আদেশ আসে। জেলে থাকাকালেই ওঁর মা মারা যান। বাবা তাঁর ভাগ্নের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, দাদাও বৌদিকে নিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা আন্দামানে থাকার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দিলেন। একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে তখন দিন যাপন করতে হয়। প্রতিবেশীদের সহায়তা প্রায় ছিলই না বলা চলে। তখন নানা জায়গার বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের অর্থ সাহায্যই ওঁর একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে। সংসারের দারিদ্র্যের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ডোমজুড়ের একমাত্র আন্দামান ফেরত স্বাধীনতাযোদ্ধার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যায়।[৩]

সূত্র ঃ (১) বারোমাস (শারদীয় ১৯৯০) ঃ কমিউনিস্ট আত্মসমালোচনার একটি দলিল ১৯৫০—সংগ্রাহক অমিতাভ চন্দ্র (১০৩ পৃঃ)

(২) 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' প্রবন্ধ—অমিয় ঘোষ।

(২ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত (পৃঃ ?৬-৫৭)

(৩) কমলাকান্ত বাবুর কাছ থেকে শোনা ঘটনা।

বিপ্লবপন্থীদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও গোপন আশ্রয়

৮নং ফারশোর রোড (পরবর্তীকালের স্ট্র্যাণ্ড রোড তথা কার্তিক দত্ত রোড)-এর শ্রীরামচন্দ্র বসুর বাড়িতে একরাতে বটুকেশ্বর দত্ত, বিপিন গাঙ্গুলী ও সন্তোষ মিত্র ছিলেন। ৯৬, রাজবল্লভ সাহা লেনের বাড়িটিও শ্রীরাম বসুর ছিল। ওখানে গোপনে ছাপাখানা রাখা হয়েছিল। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক বই রাখা হতো। ৬/৮ জন কর্মী মিলে দ্রুত টাইপ সাজাবার ব্যবস্থা করতেন।[১]

শালকিয়ার বাবুডাঙ্গায় মনা খাঁর বাড়িতে এবং বাগনানের মুগকল্যাণে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা সূর্য সেন [১ক] ও তাঁর সহযোদ্ধা গণেশ ঘোষ উত্তর ঝাপড়দার শিবু মাষ্টার মশাইয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন।[১খ]

দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দুজনেই টাইপ করা ফরমূলা সরবরাহ করতেন। ঐ গ্রামের দীনেশ চট্টোপাধ্যায় ঐ সব ফরমুলা চালের

বাতায় গুঁজে রাখতেন, আবার নির্দেশমত নির্দিষ্ট লোকের হাতে তুলে দিতেন। দীনেশবাবুর একজন কলেজের বন্ধু হৃষীকেশ পাল (রাজাবাগান) তাঁর কাছে কাগজ পত্র নিয়ে এসে কিছুদিন গোপনে বাস করেছেন। সেটা ১৯৩১-৩২ সালের ঘটনা।[২]

বালির রতনমণি চট্টোপাধ্যায়দের পুরাতন বাড়িতে ৬নং কৈলাস ব্যানার্জী লেন-এ 'যুগান্তর দল'-এর সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (পূর্ববঙ্গ) এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আগে শালকিয়ার একটি গোপন আশ্রয়ে ছিলেন কিন্তু পুলিশ সেখানকার সন্ধান পেয়ে হানা দেওয়ায় বালির আশ্রয়ে আসেন।[৩]

ডোমজুড়ের অস্ত্র শস্ত্র রাখা, আত্মগোপনকারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, বোমা প্রস্তুতের স্থান নির্বাচন প্রভৃতি কাজের দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য। এই সময়ে বহু রকমের বোমা তৈরীর নির্দেশিকা (ফরমূলা)-ও পাওয়া গিয়েছিল। এক একটি নির্দেশিকার কয়েকটি করে কপি তৈরি করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখবার ব্যবস্থা হতো। আশুতোষ বাবু প্রাইভেট টিউশানি করতেন। উত্তর ঝাপড়দার শ্রীনিবাস ঘোষালের পুত্র তারাপদ ঘোষাল (গন্ধী) ছিলেন তাঁর এক ছাত্র। তারাপদ ঘোষাল তাঁর বন্ধু (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও এম.এল.এ) তারাপদ দে-কে বিপ্লব আন্দোলনের দিকে টানেন। তারাপদ দে-র মেজোভাই নিরাপদ এবং ছোট ভাই কালীপদও বিপ্লব আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। এঁদের সঙ্গে যোগ হয় নিরাপদ গাঙ্গুলীর। এঁরা সবাই মিলে ঐ গ্রামের দ্বারিক ঘোষালের বাড়ির পিছনের বাগানে মাটির নীচে সিমেন্ট বাঁধানো একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে ফেলেন। সেই ঘরের মধ্যে অস্ত্রাদি রাখা হতো। দ্বারিক ঘোষালের সঙ্গে সরকারী লোকেদের খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। ফলে, সন্দেহ উদ্রেকের কোন সম্ভাবনাই ছিলনা। অস্ত্রাগার সম্বন্ধে কর্মীরা ছাড়া দ্বারিক ঘোষাল বা অন্য কেউ কিছুই জানতেন না। এই অস্ত্রাগারটি তারাপদ দে-র বাড়ির পাশেই এবং তারাপদ ঘোষালের বাড়ির সন্নিকটেই ছিল। অস্ত্র রাখা বা বের করার পক্ষে কোন অসুবিধাই হতো না। এ ছাড়াও তারাপদ ঘোষালের বাড়ির পশ্চিম দিকে গেটের পাশে গোয়ালঘরের পিছন দিকে মাটির নীচে একটি ঘর করা হয়। এই ঘর করেন ঐ সকল কর্মীরাই।[৪]

খাঁটোরার পুলিনকৃষ্ণ পাল, (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক), প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ঝাপড়দার শ্যামাপদ রায় প্রভৃতির বাড়িতেও অস্ত্র থাকতো।[৫]

বোমা তৈরির ফরমূলা ডোমজুড়ের ফটিকচন্দ্র ভট্টাচার্য মারফৎ রাখা হতো ঐ গ্রামেরই ভোলানাথ সানির কাছে।[৬]

একবার একটা তাজা বোমা রাখার ব্যাপারে বসন্ত ঢেঁকি পড়লেন ফ্যাসাদে। তখন হামেশাই বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাতায়াত করতে হয় দক্ষিণেশ্বর, শালকিয়া,

ডোমজুড়ে। হঠাৎ-ই ওঁর মনে পড়ে যায় শালকিয়ার এক বন্ধু (পুলু চ্যাটার্জী)-র মা'র কথা। গিয়ে প্রার্থনা জানাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি। রেখে দিলেন পুকুরে, জলের ভিতরে। কয়েকদিন পরেই পুলিশ টের পেল, ও বাড়িতে অস্ত্রাদি যাওয়া-আসা করে। একদিন তল্লাসী হলো। কিন্তু তারা পেল না কিছুই। পুলিশের আনাগোনা হুজ্জতের মধ্যে গৃহকর্ত্রী জননী নির্বিকারে সংসারের প্রাত্যহিক কাজকর্ম দেখাশুনা করে চললেন।[৭]

দফরপুরে 'প্রবর্তক আশ্রম' গড়ে ওঠার মূল ভিত্তিই ছিল দেশপ্রেমিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করা। (পরে তা ধর্মীয় আশ্রমে রূপান্তরিত হয়।) দিকে দিকে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ডোমজুড়ের বন্দরপল্লীর হৃষীকেশ দাস প্রবর্তক আশ্রমে যাওয়া আসা করতেন। তাঁর মেজদা পঞ্চানন দাসও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সহায়ক হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর বাড়ির চৌকাঠের নীচে গর্ত করে রিভলবার লুকিয়ে রাখতেন। এছাড়াও দফরপুর কটা পাড়ায় গোপালচন্দ্র দাসের সঙ্গে বিবাহিতা তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরস্বতীর কাছে এবং অপর ভগিনী হুগলীর কোতরং-এ তারিণীচরণ মণ্ডলের সঙ্গে বিবাহিতা ঘৃতকুমারীর কাছে সাইকেলে চেপে গিয়ে অস্ত্রাদি রেখে আসতেন এবং নিয়েও আসতেন।[৮] দক্ষিণ কলকাতায় বিবাহিতা উত্তর ঝাপড়দার জনৈকা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর শ্বশুরালয়ে অস্ত্র রাখার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।[৯] দক্ষিণ ঝাপড়দার সৌরীন্দ্র ব্যানার্জীর স্ত্রী বিভাবতী দেবী ও যতীন্দ্র ব্যানার্জীর স্ত্রী রাণীবালা এসিড, নিষিদ্ধ পুস্তক রিভলবার প্রভৃতি লুকিয়ে রাখতেন।[১০] হাওড়ার ৩২ নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন নিবাসী পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ খানাতল্লাসী হওয়ার আশঙ্কায় পাশের বস্তীর মেয়ে সিন্ধুবালার কাছে তিনি অস্ত্রাদি রেখে দিতেন। সিন্ধুবালা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সেসব অস্ত্রাদি রেখে দিতেন। তিনি খুবই তেজী বালিকা ছিলেন।[১১]

কলকাতা থেকে যাঁরা অস্ত্র নিয়ে আসতেন, নির্ধারিত সময়ে ডোমজুড়ের হড়ের পুলের কাছে অপেক্ষারত কর্মীরা তাঁদের চোখ বেঁধে কিছুটা ঘুরিয়ে কাছাকাছি জায়গায় এনে চোখ খুলে অস্ত্রাদি নেওয়া হতো। তারপর তার চোখ বেঁধে আবার পূর্বস্থানে রেখে দিয়ে আসা হতো। তারাপদ দে-র নরসিংহ দত্ত কলেজের সহপাঠী বৃন্দাবন বসু (পরবর্তীকালের এম.এল.এ ও হাওড়া জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী চিকিৎসক) কলেজে অস্ত্রাদি দিতেন সংরক্ষণের জন্য।[১২]

আন্দুল-মৌড়ীতে বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দু একজন ছাড়া বড় বেশি কেউই লবণ-সত্যাগ্রহে অংশ নেন নি। এই সময় মৌড়ীতে 'শ্রী সংঘ' স্থাপিত হয়। তার নেত্রী ছিলেন লীলা নাগ (রায়)। অনিল রায়ও নেতৃত্ব দিতেন। ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের অনেক বিপ্লবী তখন এখানে যাতায়াত করতেন। তাঁদের অনেকের নামেই তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে তখন কালী চক্রবর্তী নামে এক বিপ্লবী এসে এখানে ছিলেন। পরে তিনি ধরা পড়েন ও তাঁর ফাঁসী হয়ে যায়।

মৌড়ীর রায় পাড়ার গোপাল চক্রবর্তী 'শ্রী সংঘ'-এ যুক্ত হন। পাঁচুগোপাল তরফদার, নরেন চক্রবর্তী, রেবতী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঐ এলাকার কর্মীরা 'শ্রী সংঘ'-এর ভাল কর্মী ছিলেন। মৌড়ীর ডাঃ ইন্দুভূষণ দাসের কাছে অনেক নিষিদ্ধ পুস্তক রাখা হতো।[১৩]

সূত্র ঃ

(১) হাওড়ার বিপিনবিহারী বসু কথিত;

(১ক) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১০৮) ; মুক্তি পথের সন্ধানে—অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি সম্পাদিত (পৃঃ ২৭)।

(১খ) উত্তর ঝাপড়দার নিরাপদ গাঙ্গুলী,

(২) দক্ষিণ ঝাপড়দার দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

(৩) বালির শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

(৪), (৯), (১২) উত্তর ঝাপড়দার তারাপদ দে,

(৫) দক্ষিণ ঝাপড়দার শ্যামাপদ রায়,

(৬) দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য,

(৭) পার্বতীপুরের বসন্তকুমার ঢেঁকি,

(৮) ডোমজুড় বন্দরপল্লীর হৃষীকেশ দাস,

(১০) দক্ষিণ ঝাপড়দার জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জী,

(১১) পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

(১৩) ডোমজুড়ের জয়কেশ মুখার্জী ও মৌড়ীর ডাঃ ইন্দুভূষণ দাস মহাশয়গণের কাছ থেকে শোনা।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়

আমতা থানার বাণেশ্বরপুর গ্রামের বিপিনবিহারী সেনাপতি ছিলেন কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের কন্ট্রাকটর। পুত্র কার্তিকচন্দ্রকে কলকাতায় নিজের কাছে নিয়ে যান ভাল পরিবেশে লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কার্তিকচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ক্রমে অন্য ছেলেদের সঙ্গে নিকটবর্তী দর্জিপাড়ায় কমলগুপ্তের কাছে লাঠিখেলা শিখতে যেতে থাকেন। সেখানেই হুগলীর দীপে গ্রামের শ্যামাপদ মোদকের সঙ্গে আলাপ হয়। শ্যামাপদ ছিলেন অনুশীলন সমিতির লোক। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় আলোচনা হতো। গ্রীষ্মের ছুটি পূজার ছুটিতে গ্রামে এসে কার্তিকচন্দ্র স্থানীয় কংগ্রেস নেতা হরনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কাজেও অংশ নিতেন। শ্যামাপদবাবু ওঁকে

নিয়ে যান যতীন চক্রবর্তীর কাছে। যতীনবাবু বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ধৈর্য, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার বিষয় বলতেন। ক্রমে কার্তিকবাবু পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে কাজ করতে লাগলেন।

১৯৩৪ খ্রীঃ কার্তিকবাবু স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।ঐ বছরই ৩১শে আগস্ট পূর্ণানন্দবাবু আলিপুর জেল থেকে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে আসেন ও টিটাগড়ে আশ্রয় নেন। কার্তিকবাবু পুরোপুরি দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী বাড়ি থেকে ২২ ভরি সোনার গয়না নিয়ে গিয়ে পার্টিকে দান করেন।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী টিটাগড়ের বাসা থেকে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, পারুল মুখার্জী ও শ্যামবিনোদ পাল গ্রেপ্তার হন। পুলিশ সেখানে বোমার মালমশলা, নিষিদ্ধ বইপত্র পায় এবং ঐ বাড়ীর অদূরে কুড়িয়ে পায় একটি রিভলবার। পুলিশ দলের অন্যান্যদের অনুসন্ধান করতে থাকে। আসামের শিলেটের দেবব্রত রায়, ফরিদপুরের অজিত মজুমদার এবং হাওড়ার কার্তিক সেনাপতি খিদিরপুরের বাবুবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে একটি ঘরে আত্মগোপন করে থাকেন।

ঐ বছরের ১৩ই এপ্রিল রাত্রে শিলেটের দেবব্রত রায় রাস্তায় গ্রেপ্তার হয়ে যান। ভোরে পুলিশবাহিনী অজিত মজুমদার ও কার্তিক সেনাপতিকে গ্রেপ্তার ক'রে টালিগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ১৪ দিন পুলিশ হেপাজতে রাখে। দলের গোপন খবর জানার জন্য, সদস্যদের নাম জানার জন্য প্রথম সপ্তাহ খুবই শারীরিক নির্যাতন করে। কিন্তু কোন কথা বের করতে পারে না। তারপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে পাঠায়। মামলার নাম হয় 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা'। আসামীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ জন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম ও ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা ছিল মামলার মুখ্য বিষয়। টিটাগড় ষড়যন্ত্রের ব্যাপ্তিকাল ছিল ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫-এর ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত। অর্থাৎ, এই চারমাসের মধ্যেই ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছিল।

স্পেশাল ট্রাইবুনালে তিনজন বিচারক ছিলেন। মিঃ বিভার আই. সি. এস (সভাপতি), মিঃ কে.সি. দাশগুপ্ত আই.সি.এস এবং এন.কে.বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

সরকার পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটার জে.সি.মুখার্জী, বি.সি.নাগ প্রভৃতি এবং আসামী পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার জে.সি.গুপ্ত, শেখর বসু, এডভোকেট মন্মথনাথ দাস (ইনি কংগ্রেস নেতা হওয়ায় এঁকে মেদিনীপুর থেকে বহিষ্কার করেছিল), পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, সুকুমার দাশগুপ্ত ও শিশির মৈত্র।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করার সময় একজন মহিলা ও একজন পুরুষ সহকর্মী গ্রেপ্তার হন এবং বাড়ির অদূরে পাওয়া যায় একটি রিভলবার। ঐ কুড়িয়ে

পাওয়া জিনিসটি সঠিক কার হেফাজতে ছিল ট্রাইবুনাল পুলিশের কাছে জানতে চাইলে পুলিশের পক্ষে সুবিধা হয় পূর্ণানন্দ বাবুর উপর দোষটা চাপালে। পুলিশ তাই করল। কিন্তু তাতে বিচারকদের সন্তুষ্ট করা গেল না।

আসামী পক্ষের আইনজীবীরা এই সুযোগে সবটাই পুলিশের তৈরি একটা মিথ্যা মামলা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বিচার চললো প্রায় দু বছর ধরে। রায় হলো ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল। এতে ১৭ জনের দণ্ড হয়, ১২ জন মুক্তি পান এবং ৩ জন রাজসাক্ষী হয়। কার্তিক সেনাপতির ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রায়দানের পর কার্তিক সেনাপতি, ধীরেন মুখার্জী ও হরেন মুন্সীকে ঢাকা জেলে পাঠায়। জেলের নিয়ম—'সরকার সেলাম' দিতে হবে। কার্তিকবাবুরা এই সেলাম দিতে অস্বীকার করেন। সুতরাং কঠোর সাজা। মাথায় কালো ফেট্টি দেওয়া টুপি পরতে হলো। জেলখানায় সরকারের আইন-কানুন ঠিক ঠিক মেনে চললে সাজা কম হবার (remission-এর) যে ব্যবস্থা আছে এঁদের বেলা তা বন্ধ হলো, ডাণ্ডাবেড়ী পরতে হলো, ডাল-চাক্কির মেহনতের কাজে যেতে হলো এবং নিঃসঙ্গ সেল (Condemned Cell)-এ থাকতে হলো।

এই সকল পীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা জেলের বন্দীরা অনশন করেন। তখন কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করে। বুকের উপর বসে নাসারন্ধ্র দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর সময় পাকস্থলীর পরিবর্তে ফুসফুসে নল চলে যাওয়ায় রাজসাহী কলেজের ছাত্র হরেন মুন্সীর মৃত্যু হয় (৩০-১-১৯৩৮)। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার তিনিও অন্যতম আসামী ছিলেন এবং তাঁরও ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুসংবাদ বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় ঢাকা শহর গণবিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ঢাকা জেল থেকে কার্তিকবাবু সহ অন্যান্য বন্দীদের তখন দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে এল।

এই সময় আন্দামান বন্দীরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে থাকেন। ডাঃ নারায়ণ রায় জেলখানায় মার্কসবাদের ওপর ক্লাস নেওয়া আরম্ভ করেন। কার্তিক সেনাপতি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সরকারের উপর জোর চাপ পড়তে থাকে।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কার্তিকবাবু কারামুক্ত হন এবং হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জেলার বিপ্লবী আন্দোলনের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

সূত্র ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী কার্তিক সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

শ্রমিক আন্দোলনে

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করা আবশ্যিক বলে মনে করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীও ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে এবং বৃটিশ ও ভারতীয় মালিকানাধীন শোষণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম করেছেন। ঔপনিবেশিক শোষণের অধীনে শ্রমিকশ্রেণীসহ সমগ্র ভারতবাসীকেই থাকতে হয়েছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাম্র্যজ্যবাদী শোষণ ছাড়াও বৃটিশ ও ভারতীয় মালিকপক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হয়েছে। আমাদের জেলায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আহ্বানে বারে বারে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট হরতালে সামিল হয়েছেন, সে সব হরতাল ধর্মঘটকে শত প্ররোচনা সত্বেও সফল করে তুলেছেন, আবার তাঁদের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রেও নানারকম আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বৃটিশ রাজত্বে হাওড়ার চট, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিল্প মূলতঃ বৃটিশ পরিচালিত হওয়ায় এখানে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তুলতেই হয়েছে—কখনও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, কখনও দেশী-বিদেশী মালিকের শোষণ-বঞ্চনা-বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে।

হাওড়ায় ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠন এবং এজেন্সী হাউসগুলি ছিল তারা সাংগঠনিক দিক দিয়ে খুবই সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ ছিল।[১]

অন্য শহরের শ্রমিকদের মত হাওড়া শহরের শ্রমিকদের নিজস্ব বাসস্থান নির্মাণের সঙ্গতি মালিকরা রাখেনা বলেই এখানকার অস্বাস্থ্যকর বস্তীজীবন কলকাতার উত্তর শহরতলীর জঘন্য বস্তী পরিবেশকেও হার মানায়।[১/১]

১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় তাতে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আহ্বান থাকায় দেশীয় মূলধনে কিছু কিছু শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে তোলে ঐ সময়ের শ্রমিক ধর্মঘটগুলি। স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশী নেতাদের সমর্থন এই ধর্মঘটি শ্রমিকরা পেয়েছেন। এই সময় বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।[১ক]

এই ধর্মঘটে তিনকড়ি গোস্বামী নামে একজন কেরানীকে বিচারাধীন বন্দী করা হয়। তাঁর হয়ে আদালতে মামলা লড়েন অপূর্বকুমার ঘোষ ও অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী নামক দুজন ব্যবহারজীবী।[১খ]

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রাখীবন্ধন উৎসবকে কেন্দ্র করে বাউড়িয়া জুট মিলের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার সম্ভবত প্রহৃত হয় এবং দুজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করেন।

এখানে ও ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী ধৃত শ্রমিকদের মুক্ত করেন ও উভয় পক্ষে মীমাংসা করিয়ে দেন। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আবার শ্বেতাঙ্গ মালিকের চক্রান্তে শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, শ্রমিকরা প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন। আদালতে ধৃত শ্রমিক পক্ষে মামলা লড়েন প্রমথ মিত্র, বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী। [১গ]

"এইযুগে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক জাগরণের প্রভাবে যে শ্রমিক সংগ্রামগুলি মূর্ত হয় তার মধ্যে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বেঙ্গল সেকশনের ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে বেতন হারের পার্থক্য এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে এবং উন্নত ধরণের বাসস্থান ইত্যাদির দাবীতে এই ধর্মঘট হয়। রেলশ্রমিকরা অপমানজনক 'নেটিভ' শব্দের পরিবর্তে 'ভারতীয়' কথাটি ব্যবহারের দাবীও করেন।....তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এই ধর্মঘট ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। লণ্ডনের 'দি টাইমস্' পত্রিকা মন্তব্য করে যে, 'প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনই' এই ধর্মঘটের জন্য দায়ী ছিল।.... 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' এই ধর্মঘট সম্বন্ধে লিখল, 'প্রায় সমস্ত 'নেটিভরাই' কর্মত্যাগ করেছে। বর্ধমানসহ হাওড়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনের কাজকর্ম স্তব্ধ।....তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এই রেল শ্রমিক ধর্মঘট ছিল প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত।" ১৯০৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের কেরাণীদের ধর্মঘট স্বদেশী মহলের ব্যাপক সমর্থন পায়।[২]

'১৯০৭ সালে রেল শ্রমিকরা তীব্রতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল।....হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা সভা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া এবং হাওড়া স্টেশন থেকে কোন ট্রেন যেতে না দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ফলে মালগাড়ীর প্রায় ৩০০ ওয়াগন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল এবং শত শত যাত্রীও স্টেশনে আটকে পড়লেন।....এই অচলাবস্থার পরিস্থিতিতে কলকাতার কারখানাগুলিতে কয়লার অভাব ঘটল এবং কলকাতা বন্দরেও জাহাজগুলি আটক হয়ে রইল কারণ রেল চলাচল না হওয়াতে জাহাজগুলি ভর্তি করা বা খালাস করা গেল না।....হাওড়া স্টেশনকে সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হল।' [৩]

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে হাওড়ার অনেকগুলি জুটমিলে ধর্মঘট হয়। ঘুসুড়ি, নিউসেন্ট্রাল, গ্যাঞ্জেস, ফোর্ট উইলিয়ম ও হাওড়া জুট মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। মোট ২৭০০০ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নেন। এই বছরে হাওড়ার প্যারী এণ্ড কোং নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ৩০০ শ্রমিকও ধর্মঘট করেন। মজুরীবৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীপূরণের প্রতিশ্রুতির পর এই সকল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[৪]

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হাওড়ার লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপের কয়েকটি বিভাগের শ্রমিকরা নানাবিধ দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত না ক'রে দু'জন শ্রমিককে ছাঁটাই করেন। শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারী মাসে আরও সংগঠিত হন এবং আরও কয়েকটি দাবী যুক্ত ক'রে পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ এবার আরও ৪ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ৫ই মার্চ কারখানায় ঢুকে বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত কাজ করবেন না হুমকি দেন। এতে কর্তৃপক্ষ ৪ জনকে কাজে নেন। কিন্তু সকলকে নেন্ না। পুনর্বহালের দাবীতে শ্রমিকরা অবস্থান ধর্মঘট করেন, কর্তৃপক্ষ লক আউট ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানী শ্রমিকদের বরখাস্ত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর ফল হয় সাংঘাতিক। শ্রমিকদের ধর্মঘট হাওড়া জেনারেল স্টোর্স, হাওড়া ব্লক সিগন্যাল শপ, কারেজ ডিপার্টমেণ্ট এবং বামুনগাছি ওয়ার্কশপে ছড়িয়ে যায়। ২৮শে মার্চ ১০ হাজার শ্রমিক কলকাতার ফেয়ারলী প্লেসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সদর কার্যালয়ে এজেন্টের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এজেন্ট কর্ণপাত করেন না। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা তাদের কোয়ার্টারে ফিরে এলে বামুনগাছির লোকো শেডে পুলিশ গুলি চালিয়ে দু'জনকে হত্যা করে ও অনেককে আহত করে।

এই গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। রেল শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে হাওড়া বার্ন কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন এবং হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। দিকে দিকে শোভাযাত্রা ও সভানুষ্ঠান করে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো হতে থাকে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘটের মীমাংসায় উৎসাহ দেখান। মিঃ সি.এফ.এণ্ড্রুজ, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখদের আলোচনা ব্যর্থ হয়। কমিউনিস্টরা এই ধর্মঘট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহ এই ধর্মঘটের পক্ষেই ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা এই শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের নিন্দা করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রগোষ্ঠী এই ধর্মঘটের পশ্চাতে মস্কোর হাত ও অর্থ আবিস্কার করতে দ্বিধা করেনি।[৫] পূর্বভারত রেলের ডালহৌসী স্কোয়ারের প্রধান কার্যালয়ের সামনে রেলশ্রমিকদের যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শালকিয়ার অধিবাসী শান্তিরাম মণ্ডল। তিনি ছিলেন লিলুয়া ওয়ার্কশপের কর্মী। সেদিন ছিল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন। সুভাষচন্দ্র বসু শালকিয়ার নির্বাচনী কাজের তদারকীতে এসে ঘটনাটি শোনেন। হাওড়ার তদানীন্তন জেলাশাসক 'ব্রতচারী' আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলাশাসকের আদেশে লোকোশেডের ডি সি এম ই. সি. মোল্ডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ব্রিটিশ সরকার শান্তিরাম মণ্ডলকে প্রধান আসামী করে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে

মামলা করে। মামলাটি চলেছিল হাওড়া কোর্টের বিচারক এস. এন. মোদকের এজলাসে। শ্রমিকপক্ষে মামলা দেখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও তদানীন্তন হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইন। এই মামলায় শান্তিরাম মণ্ডলের পাঁচ বছর জেল হয়।[৬]

১৯২৮ সালের ৮ই মার্চ থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত লিলুয়ার রেল মজুরদের এই ধর্মঘট চলে। এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব ও পরিচালনায় ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির নেতারা ছাড়াও কিরণচন্দ্র মিত্র (জটাধারী বাবা), শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ ছিলেন।[৭]

১৯২৮ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেথর ও ঝাড়ুদারেরা ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির নেতৃত্বে 'দ্য স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অফ বেঙ্গল' নামক ইউনিয়নের অধীনে জোটবদ্ধ হন এবং ঐ বছরেই দুবার ধর্মঘট করেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনেও প্রচুর সংখ্যক ঝাড়ুদার ও মেথর ছিলেন। এ শহরে সবই তখন প্রায় খাটা-পায়খানা ছিল, ফলে মেথরদের নানাদিকের অসুবিধাও ছিল খুব। এখানে যশোরের শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় শিবপুরের জীবনকৃষ্ণ মাইতি, অগম দত্ত ও প্রমোদ বসুর সহযোগিতায় কলকাতার নেতাদের পরামর্শ অনুসারে মেথর-ঝাড়ুদারদের সংগঠিত করেন। ১৯২৮ সালের ৮ই এপ্রিল এই শ্রমিকরা হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেন। অবশ্য তার আগে ৬ই এপ্রিল তারিখেই ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শানাপাড়ার মজুররা বিনা নোটিসেই ধর্মঘট করে বসেন। এ থেকে ধর্মঘট করার প্রতি তাঁদের আগ্রহ এবং উৎসাহ উপলব্ধি করা যায়। স্বভাবতঃই শ্রমিকদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তাঁদের বোঝাপড়া। কিন্তু ৮ই এপ্রিল ছয় থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত সব ওয়ার্ডেই শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলেন, সেই সময় মেথরদের দিয়ে জোর-জবরদস্তী করে কাজ করাবার দায়িত্বে এগিয়ে এল এংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্জেন্টরা। এ সম্বন্ধে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখছেন ঃ

"প্রথম দিন ৮ই এপ্রিল তারিখে শিবপুর ট্রামওয়ে টার্মিনাসের নিকটবর্তী শীল বস্তীতে একটা বড় ঘটনা ঘটে যায়। পুলিশের এংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টরা ওখানে গিয়ে জোর-জবরদস্তী করে মেথরদের দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা করে। তাতে উত্যক্ত হয়ে মেথরানীরা পায়খানার বালতি সার্জেন্টদের গায়ে ঢেলে দেয়। সার্জেন্টরা ওখানেই তাদের পোশাক (ইউনিফর্ম) খুলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলতে বলতে গেল যে তাদের গুলি করার অনুমতি না দিলে তারা আর কখনও মেথরদের বস্তীতে যাবেনা। খবর পেয়ে আমরা শীল বস্তীতে ছুটে গেলাম। দেখলাম পায়খানামাখা পুলিস সার্জেন্টদের ইউনিফর্মগুলি ওখানেই পড়ে আছে। তারপরে আমরা মেথরদের ওই অঞ্চলের বস্তীগুলিতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলাম।"[৮]

শ্বেতাঙ্গ শাসকদের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশই হলো এই ঘটনা।

সমসাময়িককালে সুতাকল চটকলের শ্রমিকরাও আন্দোলনে সামিল হতে থাকেন। 'চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া অঞ্চলের চটকলগুলিতে মজুরদের ওপরে জুলুমের কোন অন্ত ছিলনা। ওই অঞ্চলে আগে কখনও মজুর আন্দোলন হয়নি। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে চেঙ্গাইল লাডলো জুটমিলের মজুরেরা হঠাৎ ধর্মঘট করে বসেন। তিনদিন পরেই সেই ধর্মঘট ভেঙে যায়। তাতে অনেকেই ছাঁটাই হন।' [৯] লাডলো জুট মিলের মালিক হলো আমেরিকান কোম্পানী। এরই অদূরে বাউড়িয়ায় রয়েছে একসঙ্গে তিনটি চটকল ও একটি সুতাকল। এগুলির মালিক হলেন ফোর্ট গ্লসটার নামক একটি ব্রিটিশ কোম্পানী।[১০]

চটকল মালিকদের বিরামহীন শোষণের বিরুদ্ধে হাওড়া জেলায় প্রথম অসংগঠিত চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় ১৯২২ সালে বালীতে এবং তারপর ১৯২৩ সালে রাজগঞ্জে ও সাঁকরাইলে। [১১]

লাডলো জুট মিলে ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর তাঁরা সংগঠিত হন। "দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ করে বিগত এক বৎসর ক্রমাগত যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল শ্রমিকদের মধ্যে তার অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে ১৯২৮ সালে কলকাতার অদূরে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। বাউড়িয়ার তিনটি চটকলের অন্যতম ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন করে, তাই শ্রমিকদের এই আচরণের বিরুদ্ধে কোম্পানী এই মিলটি বন্ধ করে দেয়। মালিকপক্ষের এই অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে অন্য দুটি মিলের শ্রমিকরাও ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়। প্রথমে ফোর্টগ্লস্টার জুট মিলের ম্যানেজার কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত করার ঘোষণা করে। অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী 'এই ব্যক্তিরা শ্রমিক ইউনিয়নের সক্রিয় সংগঠক ছিল বলেই বিশ্বাস। এই লোকেরা চলে যাওয়ার পর সংবাদে প্রকাশ যে ম্যানেজার মিলটিকে বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দেন। শ্রমিকরা তখন মজুরী দাবী করলে তাদের পর দিন আসতে বলে ম্যানেজার স্থানত্যাগ করেন। তিনি স্থানত্যাগ করার পরই শ্রমিকদের পেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। মিলের প্রায় পঁচিশজন দারোয়ান এবং ৫০/৬০ জন মাঝি শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে। হতচকিত শ্রমিকরা তখন চতুর্দিকে পালাতে আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ফিরে দাঁড়ায় এবং তীব্রভাবে আক্রমণের প্রতিবাদ জানায়। তখন তাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয় এবং সে এখন খুব মারাত্মক আবস্থায় রয়েছে। আরও তিনজন গুরুতরভাবে জখম হয় এবং ৭/৮ জন গুলিতে আহত হয়। জনতা তখন স্থানত্যাগ করে এবং তৎক্ষণাৎ মিলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। (Amrita Bazar

Patrika, Calcutta 17th July. 1928.) এরপরে একই মালিকানাধীন বাউড়িয়ার অন্য দুটি চটকল এবং সুতাকলগুলিতেও ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়।

১৫ হাজার শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছয়মাস ব্যাপী চলার পর বিদেশী মালিক ও পুলিশের যুগপৎ দমননীতির সম্মুখে ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে দমননীতি এত তীব্র হয় যে, সমগ্র দেশের দৃষ্টি এই ধর্মঘটের দিকে আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বাউড়িয়ায় উপস্থিত হন এবং ধর্মঘটী মানুষদের সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে যে বিবৃতি প্রচার করেন, বিভিন্ন দিক থেকে তা উল্লেখযোগ্য। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন,

'হাওড়া শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে বাউড়িয়া গ্রামটি অবস্থিত। অল্পক্ষণের রেল ভ্রমণেই যে কেউ কলকাতার প্রাসাদ এবং বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলি থেকে বাউরিয়ার মাটির কুটির এবং কুলি লাইনে পৌঁছে যেতে পারে। এই গ্রামটিতে এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে কারখানার দরিদ্র শ্রমিক এবং বাংলাদেশের পাট সম্রাটদের মধ্যে চলছে এক ভয়াবহ সংগ্রাম। ক্ষুধা অর্ধ-নগ্নতা এবং দুরন্ত অভাব হচ্ছে শ্রমিকদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু চটকল সম্রাটদের রয়েছে সম্পদের প্রাচুর্য এবং তাদের মিত্র হিসাবে রয়েছে সরকার, পুলিশ বাহিনী এবং এমনকি আদালতগুলি। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিকরা বিস্ময়কর ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ছয় মাসাধিক কাল যাবৎ ১৫ হাজার শ্রমিক এই সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তাদের গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তার এবং আদালতে দীর্ঘ মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এইগুলি এখনও চলছে।...

মালিকরা তাদের স্বভাব সুলভ আচরণ করছে। শ্রমিকরা পুরুষোচিত ভাবে বিস্ময়কর সাহসের সঙ্গে এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু জনসাধারণ? দেশের নবজাগ্রত যুবকরা? তারা কি করেছেন? এটা দুঃখের বিষয় তাঁরা এই ব্যাপারে যা করেছেন তা খুবই নগন্য। সরকারের সর্বপ্রকার সহায়তাপুষ্ট একগুঁয়ে চটকল সম্রাটেরা বাউড়িয়ায় চটকল শ্রমিকদের গুঁড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এইটি কি তাঁরা দেখতে প্রস্তুত? এটি কোন স্থানীয় সংগ্রাম নয় বরং এই সংগ্রাম সমগ্র অঞ্চলকে এবং ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে প্রভাবিত করবে।

যাঁরা মনে করে যে বাউড়িয়ার শ্রমিকরা নায্য সংগ্রাম করছেন তাঁদের শুষ্ক সহানুভূতি প্রকাশ করলেই চলবে না, অর্থ, সম্পদ এবং শক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। যাঁরা দরিদ্র শ্রমিকদের মনোবল এবং সহ্যশক্তির প্রশংসা করেন তাঁদের শ্রমিকদের এই পরীক্ষার মুহূর্তে সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।" (Amrita Bazar Patrika, 6th February, 1929)

[ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খন্ড)—সুকোমল সেন পৃঃ ১১৩-১১৫]

বিদেশী ইংরেজ মালিকদের এই ধর্মঘট পরিচালনা করেন বঙ্কিম মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, ফিলিপ স্প্রাট, গোপেন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারা। পরে সারা বাংলাদেশে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন ছড়ায়। বার্লিনের লীগ এগেনষ্ট ইম্পেরিয়ালিজমের প্রতিনিধি জে, ডব্লিউ জনস্টোন ভারতবর্ষে আসেন এবং লিলুয়ায় ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করেন এবং বাউড়িয়ার চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার করেন।[ঐ পৃঃ ১২৯] জনস্টোন সাহেব ভারতবর্ষে উপস্থিত হলে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। [ঐ পৃঃ ১৪৯]

লিলুয়ার রেলশ্রমিকরা এবং বাউড়িয়ার চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বিদেশী মালিকের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে যে অনমনীয় দৃঢ় মনোবল দেখিয়েছিলেন তা সারা বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ব্রিটিশ শাসন শক্তির শোষণের বনিয়াদ ছিল এইসব বিদেশী মালিকগোষ্ঠী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ। তাকে আঘাত দেওয়ার অর্থই হোল সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে আঘাত দেওয়া। সেই কর্তব্য পালন করে শ্রমিকরা দেশপ্রেমিক কর্তব্যই পালন করেছেন।

১৯৩০ সালে ১-৪ এপ্রিল কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়। তার প্রভাব হাওড়ারও বিভিন্ন অঞ্চলে পড়ে।[১১ক]

হাওড়ায় শিল্প কারখানার শ্রমিকদেরও বারে বারে ধর্মঘটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৩০-৩১ সালে শালকিয়ার জি, টি, রোডে ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

পাটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও বস্ত্রশিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল বলে ১৯৩৬-৩৭ সালে ঘুষুড়ির পুরাতন বাজারের একটি বাড়ির দোতলায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার 'বেঙ্গল লেবার পার্টি'র অফিস খোলেন এবং এই অফিসই 'তখনকার দিনে হাওড়া শহরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। পাটকল ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল এই ঘুষুড়িতে তখন আনাগোনা হোত বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতাদের।....সেদিনের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী, তারকনাথ ব্যানার্জী, কালী মুখার্জী, বলাইচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিম মুখার্জী, কেশব ব্যানার্জী, ডাঃ রণেন সেন, আবদুল মোমিন, বীরেন ব্যানার্জী, এম. এ. জামান, জীবন মাইতি, শিশির গাঙ্গুলী, পতিতপাবন পাঠক, কমল সরকার, অবনী মুখার্জী প্রমুখ।'[১২]

হাওড়ার শিল্পাঞ্চলগুলিতে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

ও কমিউনিস্টরা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মিলিতভাবে ইউনিয়নগুলিতে নেতৃত্ব দিতেন। শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিরণ চন্দ্র মিত্রের এই ইউনিয়নগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯৩৫ সালের জুলাইয়ে শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিরণচন্দ্র মিত্রের নেতৃত্বে শালিমার শিপ বিল্ডিং, রিপেয়ারিং ও ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস (টার্নার মারিসন)-এ প্রায় ৩৩০০ শ্রমিক বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট করেন।

১৯৩৭-৩৮ সালে জেলার বিভিন্ন চটকলের কমিউনস্টদের নেতৃত্বে ধর্মঘট হয়। ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট নেতা কালী মুখার্জীর নেতৃত্বে হাওড়া স্টেশন রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও সম্পাদক ছিলেন কালী মুখার্জী।[১২ক]

"১৯৩৭ সালের ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী হাওড়া পুরসভার প্রায় ২০০ ঝাড়ুদার বেতন বৃদ্ধি, বছরে ১ মাস সবেতন ছুটি, ৪ মাসের প্রসবকালীন ছুটি এবং অন্যান্য কিছু দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করে। ক্রমশঃ ধর্মঘটিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮০।"[১২খ]

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব শ্রমিক জাগরণ ঘটে। নভেম্বর মাসে ই আই রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মোট ২৮ জন সদস্যের সকলকেই চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ঐ মাসেই বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের রাজগঞ্জ শাখার ১০৪ জন শ্রমিককে একদিনের নোটিশে ছাঁটাই করা হয়। এই সব অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।[১২গ]

দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মাটিন বার্ন, শালিমার পোর্ট এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং, বামারলরী, হুগলী ডক, গেস্টকন উইলিয়ামস, হোরমিলার কোম্পানী প্রভৃতিতে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। যুদ্ধের অস্ত্রাদি তৈরির জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলিতে বাড়তি শ্রমিকের দরকার পড়ে, অন্যদিকে মন্দার জন্য সুতোকলগুলিতে ছাঁটাই শুরু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজকে 'না এক পাই, না এক ভাই'—অর্থাৎ অর্থ-দিয়ে বা মানুষ দিয়ে—কোন সাহায্যই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে দেবনা—এই দাবিতে ঘুষুড়ির ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোম্পানীতে এ.আই.টি.ইউ.সি-র নেতৃত্বে দুমাস ধরে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এই শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিলেন শালকিয়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী, বীরেন ব্যানার্জী, আতঙ্কহরি পাঁজা ও সুরেন দাস। শেষের দুজন ঐ কারখানার কর্মী ছিলেন।[১২ঘ]

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই সর্বভারতীয় ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে হাওড়া থেকে যে বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা মনুমেন্টের (বর্তমান শহীদ মিনার-এর) পাদদেশে অনুষ্ঠিত সভায় গিয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী ও সৌমেন্দ্রনাথ

ঠাকুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে মার্টিন বার্ণ ও নিসকোতে শিবপুরের অবনী মুখার্জীর নেতৃত্ব ধর্মঘট হয়। এই সময়ে শালিমার ওয়ার্কসের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন ঐ ওয়ার্কসের কর্মী-মহম্মদ ইলিয়াস।[১৩] পরে তিনি বিখ্যাত শ্রমিক নেতায় পরিণত হন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫ সালে বার্ণ কোং, গেস্টকীন উইলিয়ামস প্রভৃতি কারখানায় প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে, ২/৩ হাজার শ্রমিকের মিছিল হয়। রসিদ আলি দিবসের শ্রমিক বিক্ষোভে আলামোহন দাসের দারোয়ান গেটে গুলি চালায়, তা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়, কেউ হতাহত হয়নি।[১৪]

ব্রিটিশ ট্রাইবুনাল আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দুজন অফিসারকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেয়। বোম্বাইয়ের সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালায়, দুজন শ্রমিক নিহত হন। তার প্রতিবাদে ২৭শে জানুয়ারী হাওড়া ময়দানে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্কিম মুখার্জী, বক্তা ছিলেন আব্দুল মোমিন, নেপাল নাগ, বীরেন ব্যানার্জী, সমর মুখার্জী প্রভৃতি।[১৫]

সূত্র ঃ

(১) ইতিহাস অনুসন্ধান-৩ঃ প্রবন্ধ—হাওড়ার পৌররাজনীতি (১৮৭০-১৯২০) -অমল দাস (পৃঃ ২৯৯-৩০০)

(১/১) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খন্ড)-সুকোমল সেন (পৃঃ ৮২)-পাদটিকায় শিবরাওয়ের 'দি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি সমেত।

(১ক) ঐ (পৃঃ ১৪১)

(১খ) ইতিহাস অনুসন্ধান (৩)-প্রবন্ধ ঃ স্বদেশীযুগে শ্রমিক আন্দোলন ও বাংলার কয়েকজন ব্যবহারজীবী (পৃঃ ৩২০)

(১গ) ঐ (পৃঃ ৩২১)

(২) ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খন্ড)-সুকোমল সেন। (পৃঃ ১৪১-১৪২)

(৩) ঐ (পৃঃ ১৪৮-১৫০)

(৪) ঐ (পৃঃ ২০০)

(৫) ঐ (২য় খন্ড) (পৃঃ ৯৭-১০০)

(৬) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৮৭)

(৭) আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মুজফ্‌ফর আহামদ (পৃঃ ৪৬৫)

(৮) ঐ (পৃঃ ৪৭৯-৪৮১)

(৯) ঐ (পৃঃ ৪৮৭)

(১০) ঐ (পৃঃ ৪৮৫)

(১১) হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস—অমিতাভ চন্দ্র (শারদীয় পদাতিক-১৩৯৪) (পৃঃ ১২৩)

(১১ক) ইতিহাস অনুসন্ধান-১১ঃ প্রবন্ধ-বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ-—অমিতাভ চন্দ্র (পৃঃ ৪৭৬)

(১২), (১২ঘ), (১৩) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৯২, ৯৩)

(১২ক) শারদীয় পদাতিক-১৩৯৪ঃ প্রবন্ধ ঃ হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস— অমিতাভ চন্দ্র (পৃঃ ২৯-৩২)

(১২খ) ইতিহাস অনুসন্ধান-৬ঃ প্রবন্ধ-'প্রাক্—স্বাধীনতা যুগে কলকাতার ধাঙড় আন্দোলন'— নির্বাণ বসু (পৃঃ ৪৪৯)

(১২গ) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১ম)-সরোজ মুখার্জী (পৃঃ ১৭২)

(১৪) আর,সি,পি,আই নেতা অনাদি দাস কথিত।

(১৫) স্বাধীনতা সংগ্রাম ও হাওড়া জেলার শ্রমিক আন্দোলন-দীপক দাশগুপ্ত ('লোকমুখ'-১ম বর্ষ ২য় সংকলন)।

জেলা কংগ্রেস সংগঠন

"জাতীয় আন্দোলনে কলকাতার সঙ্গেই হাওড়া জেলার বিশেষ অবদান ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল এই হাওড়া শহর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘা যতীন ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনের বহু ব্যাপারে হাওড়াকে প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত একদা হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ বিরোধী সভাসমিতি এই শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অনুশোচনার কথা সেইসব সভার কোন কার্য বিবরণ ও প্রস্তাবাদির কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি।" [১]

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হবার পূর্বে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন অমৃতলাল পাইন এবং সম্পাদক ছিলেন নারায়ণদাস গাঙ্গুলী।

১৯২১ সালে জেলা কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি হন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি প্রবোধ কুমার বসু, কোষাধ্যক্ষ গুরুদাস দত্ত, সম্পাদক বীরেন বসু, সহ-সম্পাদক সুশীল ব্যানার্জী।

বীরেন বসু পদত্যাগ করায় উনসুনির নারায়ণদাস দে সম্পাদক হন।

১৯২৩ সালে হাওড়ায় স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠলে তারও সভাপতি হন শরৎচন্দ্র, সহ-সভাপতি প্রবোধকুমার বসু এবং সম্পাদক হন নির্মল মিত্র।

১৯২২-২৩ সালে শাসমলগোষ্ঠী হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্ব করেন। এই কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন খগেন গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক ছিলেন অজিত মল্লিক ও সুশীল ব্যানার্জী। এই সময় হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসেন ও যুব সংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। অনন্য কর্মশক্তির আধার হরেন্দ্রনাথ শাসমল গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে ১৯২৩ সালে শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে নূতন কংগ্রেস কমিটি গড়ে তোলেন। সভাপতি হন শরৎচন্দ্র, সম্পাদক হন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও যুগ্ম সম্পাদক হন গুরুদাস দত্ত।

নতুন নেতৃত্ব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু চেয়ারম্যান পদে কংগ্রেস প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন পরাজিত হন, জয়ী হন সরকারীপ্রার্থী চারুচন্দ্র সিংহ। পরবর্তী নির্বাচনে ১৯২৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থী বরদাপ্রসন্ন পাইনই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ সালে শরৎচন্দ্র জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন। তখন সভাপতি হন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্পাদক হন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। সেই থেকে ১৯৩৯

সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই জেলা কংগ্রেস পরিচালিত হয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে কংগ্রেসের সন্তোষ ঘোষাল, কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী, ধীরেন সেন প্রমুখ ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। অরুণ ব্যানার্জী, কার্তিক দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র কর, বিজন চক্রবর্তী, ডাঃ বেণী দত্ত প্রমুখ কংগ্রেসে থেকে যান। এ্যাড হক কংগ্রেস গঠিত হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন সুশীল ব্যানার্জী ও সম্পাদক হন কালোবরণ ঘোষ। [২]

পরবর্তীকালে কালোবরণ ঘোষ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালেও তিনিই সভাপতি থাকেন।

সূত্র ঃ

(১) এস.টি.ই.এ-র ত্রয়োদশ সম্মেলনের স্মরণিকা ঃ প্রবন্ধ—হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনার উপাদান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া দরকার—ডঃ নিমাই সাধন বসু (ঘরোয়া আলোচনার ভিত্তিতে শ্রী হেমেন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত।)

(২) ঐ স্মরণিকা গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ—হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা—শিশির কর।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দল মহাত্মাজীর সম্মুখে একটা প্রবল বাধার মত হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা চাইলেন সক্রিয় কর্মপন্থা—সরকারী হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধন। সেই সংকট মুহূর্তে দেশবন্ধু বিপ্লবীদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনলেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরই গৃহে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ও মহাত্মাজীর বোঝাপড়া হয়ে গেল। [১] এই সময়ে গান্ধীজী ভারতবাসীর কাছে চাইলেন এক কোটি টাকা, এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক এবং একবছর সময়। বিপ্লবীরা গান্ধীজীকে একবছর সময় দিয়েছিলেন। গান্ধীজী অহিংসাকে জীবনের আদর্শ (creed) হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, বিপ্লবীরা উপায় (Policy) হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। [২]

বিপ্লবী নেতৃত্ব সারা বাংলাদেশব্যাপী তাঁদের সশস্ত্র আন্দোলনকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে রেখে তাঁদের কথার মূল্য রেখেছিলেন।

গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে ছিল Triple 'C' boycot — অর্থাৎ Court, Council, College পরিত্যাগ করা। হাওড়া জেলার যুবকবৃন্দ এ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ঃ

বালীর উপেন্দ্রনাথ দাস ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে দেন এবং ১৯২১ সালে বালীর রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতার বড়বাজারে কারাবরণ করেন।[৩] রতনমণি চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতায় পরিণত হন।

হাওড়ার বরদাপ্রসন্ন পাইন সারাভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (M.L.C) পদটি বয়কট করেন।[৩ক] হাওড়া শহরের বাসিন্দা বলাই সিংহ (আদি নিবাস নতিবপুর, হুগলী), দক্ষিণ ঝাপড়দার আশুতোষ ভট্টাচার্য (পিতা-নিলমণি ভট্টাচার্য), আমতা থানার অমরাগোড়ী গ্রামের পুলিনবিহারী রায় (পিতা-উপেন্দ্রনাথ রায়), আন্দুল ঝোড়হাটের পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতার বড়বাজারে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে পিকেটিং করে কারাবরণ করেন। পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুর আদালতের আইনজীবীদের মধ্যে প্রথম সত্যাগ্রহী এবং শাঁকরাইল থানার মধ্যে সত্যাগ্রহে প্রথম অংশগ্রহণকারী। স্কুলে ছাত্রথাকাকালে হাওড়ার বিপিনবিহারী বসু খদ্দর বিক্রী করতে গিয়ে ঐ বড়বাজারে গ্রেপ্তার হন ও ১৮ দিন জেলে থাকেন।

এই সময় হাওড়ার বহু ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করেন, পরীক্ষাও বর্জন করেন। শিবপুরের ১৯ নং হেম ব্যানার্জী লেনের সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কলেজ ত্যাগ করে কংগ্রেস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দক্ষিণ ঝাপড়দার নাজিরুদ্দিন দপ্তরী (পিতা-আব্দুল বারি দপ্তরী) কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পাঠ ত্যাগ করেন। ঐ গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (পিতা-বিরাজমোহন ঘোষ) বি.এ. পরীক্ষা দেন, কিন্তু সমাবর্তন (convocation) উৎসব বর্জন করেন। ডোমজুড়ের বন্দর পল্লীর হৃষীকেশ দাস বি.এ. পরীক্ষা বর্জন করেন।

বিভিন্ন এলাকায় তাঁতশালা বসতে থাকে, স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁতের কাপড় বিক্রী করতে থাকেন। শিবপুরে গুরুদাস দত্ত (পিতা-ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত) তাঁতশালা খোলেন। দফরপুর স্বদেশী ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী যুবকরা অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে থাকার কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর এলাকায় ফিরে আসেন ও ভাস্কুড় গ্রামে কেষ্ট চৌধুরীর বাড়িতে তাঁত বসান। সাঁতরাগাছি থেকে পুরাতন তাঁত কেনায় সাহায্য করেন ভাস্কুড়ের সুধীভূষণ ব্যানার্জী। এই কাজে সাহায্য করেন নার্ণা গ্রামের কালিদাস প্রামাণিক। গ্রামে গ্রামে তাঁত বস্ত্র বিক্রিতে অংশ নেন দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য,

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দফরপুর গ্রামের সত্য ঘোষ, বামাপদ ঘোষ, পরেশনাথ ঘোষ প্রভৃতি। [৪] বালীগ্রামের নলিনচন্দ্র মিশ্র, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকবৃন্দের নেতৃত্বে চরকা ও তকলিকাটা ঘরে ঘরে চালু হলো, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গান্ধীজীর অসহযোগের বাণী পৌঁছে দেবার কাজ চললো। [৫]

'এছাড়া ১৯২১ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতায় আসার দিন ছিল। সেদিন কলকাতার সঙ্গে হাওড়ায়ও হরতাল পালিত হয়। জনতার রোষ এত তুঙ্গে উঠেছিল যে সেদিন পুলিশকে গুলি চালাতেও হয়।' [৬]

অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশের দশকের শুরুতেই আমতার বিভিন্ন গ্রামে যুবকরা স্বদেশী বস্ত্র প্রচারে নেমে পড়েন। বাসুদেব বেরা (বেতাই), সূর্যচরণ মাজী (জয়ন্তী), রবীন্দ্রনাথ মাজী (পিতা-করুণাময় মাজী) (জয়ন্তী), ক্ষুদিরাম সেনাপতি (কাঁকরোল) প্রমুখ কর্মীরা চরকা কাটা, তাঁত বসানো, খদ্দরের জামা কাপড় বিক্রী করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হন। এঁরা প্রায় দুশো চরকা কেনেন এবং দুখানা তাঁত বসান। বেতাই বন্দরে বাসুদেব বেরার তত্ত্বাবধানে খদ্দরের জামা কাপড়ের দোকান খোলা হয়। মেদিনীপুরের কয়েকজন কর্মী তখন এই সব কাজে সহায়তার জন্য আমতায় এসে থাকেন। [৭]

অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ইংরেজ সৈন্যের বন্দুক ও মেসিনগানকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল জনতার মিছিল। হাওড়াতেও এক শোভাযাত্রা বেরুল, পুরোভাগে রইলেন শরৎচন্দ্র প্রমুখ নেতারা। [৮]

সূত্র ঃ

(১) বিপ্লবী বাংলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস—রাজেন্দ্র আচার্য (পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫)।

(২) অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম-অনন্ত সিংহ (পৃঃ ৩৪-৩৫)।

(৩) স্মৃতিকথা-শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৪)।

(৩ক) হাওড়ার রাজনৈতিক মঞ্চে শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখেছি—ডাঃ শম্ভুচরণ পাল [হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র - নির্মল কুমার খাঁ সম্পাদিত (পৃঃ ১০৩)]

(৪) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) ও অন্যান্য সূত্র।

(৫) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৫)।

(৬) ঐ (পৃঃ ১১৬)।

(৭) কিশোরীমোহন বেরা (মাজী), কল্যাণচক, আমতা কথিত।

(৮) আমাদের শরৎচন্দ্র-রবিদাস সাহারায় (পৃঃ ৯৩)।

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ঃ ১৯২৩ সাল। হাওড়ার এক উকিলের স্ত্রীকে তারকেশ্বরের মোহন্ত সতীশ গিরির লোক ঘরে আটকে রাখে। অবরুদ্ধ মহিলাটি একটি কাটারি দিয়ে পিছনের বাঁশের বাতা কেটে পালিয়ে এসে তারকেশ্বর রেল স্টেশনে অপেক্ষমান দুজন ইংরাজ সাহেবের পায়ে ধরে এই অন্যায়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। পরে স্ত্রীলোকটির স্বামীকে সাহেবরা উদ্ধার করেন। তারকেশ্বরের মোহন্তের এই অন্যায় আচরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি কংগ্রেসের নেতাদের কানে পৌঁছায়। প্রতিকারের জন্য স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি যশোরে রাজনৈতিক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামেন। স্থির হয় চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আন্দোলন শুরু হবে। ১৩৩১ সালের ১লা আষাঢ় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা হয়। হাওড়ার যুবকরাও ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দেন।

শালকিয়ায় একটি কমিটি গঠিত হয় ব্যবসায়ী বনোয়ারি লালের নেতৃত্বে। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দ বনোয়ারিলালের বাড়িতে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন।

এইসময় কলকাতার বড়বাজারে মদনমোহন বর্মনের বন্দোবস্তমত একটি বাসাবাড়িতে বলাইচন্দ্র সিংহ (জন্মস্থান নতিবপুর, হুগলী—তদানীন্তন সময়ে হাওড়াবাসী) পুলিশের তাড়া খেয়ে এসে বাস করছিলেন। তাঁর কাছে স্বামী বিশ্বানন্দ ও অন্যান্য নেতারা যান ও সত্যাগ্রহী সংগ্রহের অনুরোধ করেন। স্বামী বিশ্বানন্দের সঙ্গে বলাই সিংহ, এম.সি.ঘোষ লেনের সত্য ব্যানার্জী, ফরিদপুরের মহাবীর রুদ্র প্রমুখ তারকেশ্বরে যান। হাওড়ার স্বেচ্ছাসেবীরা মহাবীর দল ও মাদারিপুরের স্বেচ্ছাসেবীরা শান্তিসেনা খোলেন। মহাবীর দলের সম্পাদক হন বলাইচন্দ্র সিংহ।

এইসময় বিভিন্ন দিনে হাওড়া জেলার যে সব সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন তাঁরা হলেন শালকিয়া থেকে ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (সম্পাদক, 'হাওড়া বার্তা'), সুধীর মজুমদার (বড়বাগান), উপেন চৌধুরী (বাবুডাঙ্গা), বীরেন ব্যানার্জী (শালকিয়া), হাওড়া থেকে, সত্য ব্যানার্জী (সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেন), পুলিনবিহারী রায় (পিতা-উপেন্দ্রনাথ রায়, ধরণীধর মল্লিক লেন) ;—পুলিনবাবু তারকেশ্বরে মহাবীর দলের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হয়েছিলেন ; মাজুগ্রামের বিখ্যাত নেতা সতীসাধন গায়েন, আমতার ভোলানাথ মাল, মহাবীর দলের সম্পাদক বলাইচন্দ্র সিংহ, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (পিতা-ননীগোপাল ভট্টাচার্য, ৪৯০/২৬ সার্কুলার রোড, শিবপুর), নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অনাদি মুখার্জী (কদমতলা), হৃষীকেশ অধিকারী (ব্যাঁটরা), অজিত দাস, কার্তিকচন্দ্র পাত্র (বালিচক), মোহিত ব্যানার্জী (বালি), কানাই পাঠক, তারাকুমার মুখার্জী, বনবিহারী ব্যানার্জী, প্রবোধ

ঘোষ (ঘোষপাড়া), নীলমাধব চ্যাটার্জী, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ দাস (বালি) প্রভৃতি।

সমস্ত বিপ্লবীরাই ওখানে যেতেন। কংগ্রেসের প্রায় সকল প্রাদেশিক নেতাই ওখানে গিয়েছিলেন। বেলিলিয়াস স্কুলের শিক্ষক জ্ঞান পণ্ডিত বিদ্যালয় থেকে সত্যাগ্রহী সংগ্রহ করতেন। এম.সি. ঘোষ লেনের সত্য ব্যানার্জী, পুলিন রায়, ভবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে শিবপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন)—ওখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে পরে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

নিম্নলিখিত গানটি গেয়ে সত্যাগ্রহীরা পয়সা আদায় করতেন ঃ

"ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো
এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার।
তারকেশ্বর ভেসেছে পাপেতে
করিছে সবাই হাহাকার।
সচ্চিদানন্দ বিশ্বানন্দ গুণাধার
রুধিলে দানে কারাবরণে
করিবে দেশের পাপসংহার।"

তারকেশ্বরের মোহন্তকে নিয়ে কয়েকবারই আন্দোলন হয়েছিল। প্রতি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ভাট, হেটোকবি এবং কালীঘাটের পটুয়ারা। সেকালের হাওড়ার খ্যাতনামা কবি ও যাত্রাগানের পালাকার ঠাকুরদাস দত্ত মোহন্তকে নিয়ে গান বচনা করেছিলেন-

মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে,
টাক ধরেনা চুলে,
কানায় চোখে দেখতে পায়।।
বিলাতী ঘানি নতুন আমদানি
শিবের যাঁড় জুড়েছে তেলে
ভোলে কামিনী,
হয়েছে ল্যাজে-গোবরে বৃষ
কখন কি দায় ঘটায়।

[গানটি তারকেশ্বরের মোহন্তের বিচারের পর রচিত হয়। তখন মোহন্তের কঠিন শ্রমসহ তিনবৎসরের কারাবাস ও দুহাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়ে গেছে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দেও আর এক মোহন্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন হয়।]

দেশবন্ধুর অনুরোধে নজরুলও একটি গান লেখেন এবং মোহন্তের হাজার লাঠিয়ালেব সামনে গিয়ে নির্ভিক কণ্ঠে সেই গান ধরেন ঃ

"জাগো আজ দণ্ড হাতে বঙ্গবাসী।
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।
মোহের যার নাইকো অন্ত
পূজারী সেই মোহন্ত
মা-বোনের সর্বস্বান্ত
করছে বেদীমুলে।
তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপপূঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস
পাপ ব্যাভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী।"

এই গানশুনে লাঠিয়ালদের সর্দার সত্য বন্দোপাধ্যায় দেশবন্ধুর পায়ের কাছে লাঠি রেখে মোহন্তের বিরোধিতায় নামবার শপথ নেয়।

একটি গানেই বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে রায়ের পর আন্দোলন থামে।

সূত্র ঃ শালিখার ইতিবৃত্ত-হেমেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (পৃঃ১১২-১১৩);
উক্ত লেখক কর্তৃক লিখিত 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' গ্রন্থের 'তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ' শীর্ষক অধ্যায়, স্মৃতি কথা-শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ৪); এছাড়া বলাই চন্দ্র সিংহ, কানাইলাল ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জীর কাছ থেকে শোনা ঘটনা।

সভা-সমাবেশের কিছু বিবরণ ঃ

১৯২৫-এর ১৬ই জুন দেশবন্ধু প্রয়াত হন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন উপলক্ষে নানাস্থানে শোকসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

হাওড়ার বালী শহরে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র।[১] হাওড়া টাউন হলেও শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। প্রথম দু জনের বক্তৃতার পর সুভাষচন্দ্র বলতে ওঠেন। বেদনাক্লিষ্ট মুখ তাঁর, পরনে শ্বেতশুভ্র ধুতি ও চুড়ি হাতা পাঞ্জাবী। বক্তৃতা দিতে শুরু করেই 'দেশবন্ধুর বিয়োগে কি হয়েছে আমি কেমন করে বলব'— এটুকু বলতে না বলতেই তাঁর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন, 'এইখানেই সভা শেষ করছি। সমস্ত দেশের চোখের জল আজ সুভাষের

চোখে। দেশবন্ধুর বিয়োগে দেশের ব্যথা এইখানেই ফুটে উঠেছে, আর সভা নয়।' [১/১]

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার আইন রচিত হয়। তার একটা শর্ত ছিল যে দশবছর পার হলে সেই সংস্কার অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করেছে তা তদন্ত করে দেখা হবে। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে দশ বছর পার হয়। কিন্তু সে বছর ব্রিটেনে নির্বাচন থাকায় তার আগে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসেই স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে পার্লামেন্টের সাতজন সদস্যকে নিয়ে, কোন ভারতীয় সদস্য না নিয়ে কমিশন গড়া হলো। এই সংবাদে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠলো।

১৯২৮-এর ৩রা ফ্রেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পৌঁছালে ভারতের সর্বত্র হরতাল হয়। কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা বের হয়। হাওড়াতেও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা হয়। "সব রাস্তাঘাট 'সাইমন, গো ব্যাক' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।" শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। [১/২]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় হাওড়া টাউন হলে কারামুক্ত রাজবন্দীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাটি আহ্বান করেছিলেন। সভার বিজ্ঞপ্তি ২৩শে জুলাই 'বাংলার কথা'-য় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সভানুষ্ঠানের পরদিনই সভার বিবরণ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কংগ্রেস কর্মীরা সভাগৃহ ও তোরণদ্বার সুন্দরভাবে সাজিয়ে ছিলেন এবং প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছিল। উক্ত পত্রিকায় লেখা হয়ঃ "মঞ্চোপরি বহু কারামুক্ত স্বদেশ সেবক আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র. অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত হাওড়া জেলার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র বসু, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র দাস, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র বসু। দেশসেবকদের নির্যাতনকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[১/৩]

১৯২৮ সালের শেষে ভগৎ সিং গোপনে হাওড়ায় আসেন। তিনি কলকাতা অধিবেশনে এবং যুব অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। বিজয় সিংও হাওড়ায় এসে বিপ্লববাদীদের সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে বলে যান। [১ক]

১৯২৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া টাউন হলে জেলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন সদ্যোমুক্ত রাজবন্দী আশুতোষ ভট্টাচার্য। [২]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া জেলা যুব সংঘের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সেই সভায় সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই অধিবেশনের প্রায় পাঁচ মাস পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাইয়ের বঙ্গবাণী পত্রিকায় শরৎচন্দ্র একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং তাতে যুব সংঘের সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলেন,—

"কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছে দেশের যৌবন, তথাপি সেই কংগ্রেসের কাটা-ছাঁটা, ধরা-বাঁধা মুষ্টিভিক্ষায় যৌবনের ক্ষুধা মিটিল না; তাই যুব সমিতির সৃষ্টি।..."

সংঘের বৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

"এই তো সেদিনের কথা......কিন্তু যে মুহূর্তে সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াছে তাহার বাধা নাই, বিনাশ নাই....সেই দিন হইতেই এই সমিতির আর বিস্তৃতির বিরাম নাই।...আজ এই প্রতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় ভারতের সর্বত্র ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

দেশের মুক্তি সংগ্রামে বাংলার স্থান ও তার মধ্যে হাওড়ার স্থান সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত,—

"স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান যে কোথায় একথা নিজে বাঙ্গালী হইয়া উচ্চারণ করিলে আমার অবিনয়ের অপরাধ স্পর্শিবে। কিন্তু এই বঙ্গদেশের মাঝখানে হাওড়া জেলার নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে আর কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার বিগত ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথার সত্যতা বুঝিবেন।"

যুব-সমিতি খণ্ডিত হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

"যুব-সমিতির সম্মিলনের আয়োজনের প্রারম্ভেই জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মীযুবক ব্যক্তিগত মতবিরোধের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন......যুবশক্তি খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হওয়া যত বড় বেদনার বস্তুই হৌক....কর্মনৈপুণ্যে, নিষ্ঠায়, দেশের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগে তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। সেও দেশেরই কাজ, দেশের মুক্তি তাঁহাদেরও সাধনার সামগ্রী। প্রার্থনা করি, সে অনুষ্ঠানও যেন জয়যুক্ত হয়, ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ,১৩৩৬।" [৩]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে হাওড়া ময়দানে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র ভাষণ দেন, পাঞ্জাব থেকে ডাঃ আলম আসেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রবোধকুমার বসু, গুরুদাস দত্ত, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রখ্যাত উকীল বরদাপ্রসন্ন পাইন, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হাওড়া পৌরসভার এ্যাসেসর বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির উপস্থিতি সম্মেলনের মর্যাদাকে অপরিসীম গুরুত্ব

দান করে ও কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব করেন সুধাংশু মুখার্জী, বিপিনবিহারী বসু, গুরুদাস দত্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ তরুণ নেতৃবর্গ। এই সম্মেলন চলাকালে দুঃসংবাদ আসে যে, লাহোর জেলে অনশনরত বিপ্লবী যতীন দাশ মারা গেছেন (১৩ ই সেপ্টেম্বর,১৯২৯)[৪]। অনশনরত যতীন দাশ বলেছিলেন,'I shall fight to the last.' [৪ক] তাঁর মরদেহ এনে হাওড়া টাউন হলে রাখা হয়। সারা সময় স্বেচ্ছা সেবকরা পাহারা দেন। পরদিন ১৪ই সেপ্টেম্বর কেওড়াতলা শ্মশানে সুবিশাল মিছিল সহকারে শবযাত্রা হয়। সারাক্ষণ সুভাষচন্দ্র শব বহন ক'রে হাঁটেন। হাজার হাজার প্রচারপত্র বিতরিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা।' অতি গোপনে নির্মলচন্দ্র গুহের 'ডেডেন্‌হ্যাম প্রেস' থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় কম্পোজিটর নাম সুধীর সরকার এবং ঐ প্রেসেরই আর অখ্যাত কর্মচারী শশীভূষণ গাঙ্গুলী রাতভ'র জেগে প্রচারপত্রটি ছাপার ব্যবস্থা করে দেন।[৪খ] এই রাজনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে কার্তিক দত্তের উদ্যোগে হাওড়ায় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে অভিভাষণটি দেন তা ছাপা হয় ঐ বছরের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায়। এই সভার উদ্বোধক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি ছিলেন তাঁর মাতুল বিখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। সম্ভবত সভাটি হাওড়া টাউন হলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। [৫] শরৎচন্দ্র অভিভাষণটি পাঠ করতে না পারায় অন্য একজন অভিভাষণটি পাঠ করেন। সেখানে জি ও সি ছিলেন বিপিনবিহারী বসু. অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ আসেন। সেখানে বালী নিবাসী জার্মানী প্রত্যাগত ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, ডঃ ভূপেন দত্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ উপস্থিত থাকেন। [৫ক]

এই সময় হাওড়ায় 'ডিস্ট্রিক্ট ইউথ অর্গানাইজেশন' নামে একটি যুব সমিতি গড়ে ওঠে। তার সম্পাদক হন গণেশ মিত্র এবং সহসম্পাদক হন উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। একবার এঁরা কলকাতার আশেপাশের জেলাগুলির সকল মুক্ত ডেটিনিউদের ডেকে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। ঔপন্যাসিক শরৎবাবু ছিলেন সেই সভার সভাপতি। সেই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু ও সন্তোষ মিত্র মশাই উপস্থিত ছিলেন। সহসা সুভাষবাবু ও সন্তোষবাবুর মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। সন্তোষবাবু সভাস্থল ত্যাগ করেন। শরৎবাবুর সভাপতিত্বে এবং সুভাষবাবুর উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সভার কাজ শেষ হয়। [৬]

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস দেশের সর্বত্র পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবীতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই উপলক্ষে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে হাওড়া টাউন হলে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের খসড়াটি সভায় পাঠ হয়। সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়। সভায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিপিনবিহারী বসুর একটি জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভার কাজ শেষ হয়। সভার বিবরণ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [৭]

প্রতিবৎসর ২৬শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু যখনই যেখানে পুলিশ এই ২৬শে জানুয়ারী দিনটি পালনের বিষয় আগে জানতে পেরেছে সেখানেই আক্রমণ চালিয়েছে, গ্রেপ্তার করেছে। ১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারী হাওড়া ময়দানে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। আহত হন ঐ বছরেই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত কমিশনার কার্তিক দত্ত এবং আরো অনেকে। কার্তিক বাবুর কপাল ফেটে যায় এবং সে ক্ষত চিহ্ন কোনোদিনই মিলিয়ে যায়নি। এখান থেকে কার্তিক বাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। [৭ক] তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি জেলা শাসকের ভবনের সামনে রাস্তায় তাঁর মৃত্যুর পর বসানো হয়েছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে-মাসে যোগেন মল্লিকের বাড়ির সামনে দক্ষিণ বাগানে (বর্তমানে ওয়েলিংটন সিনেমা ও তৎসংলগ্ন হাইওয়ের অংশভূত এলাকায়) তিনদিন ধরে হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। "বহু বাধা ও সন্ত্রাসের মধ্যে 'বন্দেমাতরম্' ও 'শিঙ্গাধ্বনি'-সহকারে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে সম্মিলনী উদ্বোধন করেন 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৫৫-১৯৩৩)। পণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ সভাপতির দীর্ঘ মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন 'মিরাট ষড়যন্ত্র'-এর অন্যতম সহযোগী কমরেড্ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ডঃ কে.এল.গাঙ্গুলী। স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন পুলিনবিহারী বন্দোপাধ্যায় (ঝোড়হাট)। সভায় তরুণ সম্প্রদায়ের আকর্ষী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বক্তাগণের মধ্যে ভাস্বর বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।" [ভবদেব বন্দোপাধ্যায় লিখিত বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত স্মরণে পুস্তিকা]। ওখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছিলেন পাঁচুগোপাল তরফদার। তাঁর ছিল আদেশ করার মত কণ্ঠস্বর।

সম্মেলনস্থলে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে সমবেত হয়েছিলেন। আন্দুল-মৌড়ী যুবক সংঘের সহযোগিতায় সম্মেলনকে সংগঠিত করেছিলেন ডাঃ ললিত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আন্দুল-মৌড়ীর বিপ্লবপন্থী কর্মীবৃন্দ ও পুলিন বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অহিংসপন্থী কর্মীদল।

এই সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলনের শেষদিনে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে মুকুন্দদাস নিজে স্বদেশী যাত্রায় অংশ নেন। সারাদেহ ছিল তাঁর মেডেলে মেডেলে ঢাকা। চতুর্দিকে গোয়েন্দা পুলিশ সারা এলাকাটা ছেয়ে ছিল। সকলেরই আশঙ্কা ছিল যেকোন সময় মুকুন্দদাস গ্রেপ্তার হবেন। সেচ্ছাসেবক বাহিনী খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল।

বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে কাজ করছিলেন ইন্দুভূষন দাশ, জয়কেশ মুখার্জি, মাশিলা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন এতদঞ্চলের মানুষের মনে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কর্মীরাও নতুন মনোবল লাভ করেছিলেন।

এই সম্মেলনের কয়েকদিন পরেই পুলিশ মাশিলা গ্রামের শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার জন্য ওয়ারেণ্ট নিয়ে যায়। বাড়ির জিনিসপত্র ভেঙে অকথ্য অত্যাচার করে। সুরেন্দ্রনাথ এমনই আদর্শবাদী ছিলেন যে, পুত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকেই তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। [৮]

সাইমন কমিশন ১৯৩০-এর মে মাসে রিপোর্ট দিলেন। তাতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রেখে ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন এবং ঐ বছরেই লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন। কংগ্রেস ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দল ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দিলেন। জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন চেয়ে তাঁর চোদ্দ দফা দাবী পেশ করলেন, আম্বেদকর অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করলেন। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় এর বিশেষ গুরুত্ব রইলনা। সরকার গান্ধীজীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিল। এরপর 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (১৯৩১) হলো যে, হিংসাত্মক কাজের অভিযোগে আটক ব্যক্তিরা ছাড়া বাকি সবাই মুক্তি পাবে। গান্ধীজী আইন আমান্য আন্দোলন বন্ধ করলেন। ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ডাকলেন (সেপ্টেম্বর ১৯৩১)। তাতে যোগ দিতে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি গান্ধীজী লণ্ডন গেলেন। কিন্তু সে বৈঠক ব্যর্থ হলো। গান্ধী-আরউইন চুক্তি থেকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার মুক্তি সংগ্রামের উপর জোরালো আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলো। সর্বত্র দমন-পীড়ন শুরু হলো। গান্ধী-আরউইন চুক্তি প্রহসনে পরিণত হলো। শুরু হলো আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হলো। সারা ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হাওড়ার কর্মীরাও গোপনে সভাসমিতির আয়োজন করতে থাকলেন। কালীবাবুর বাজারে গোপনে সম্মেলনের আয়োজন করা হলো, প্রচার করা হলো টাউন হলে সভা হবে। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সুশীল মুখার্জী, মূল সভাপতি ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের ডেপুটি লীডার জালালুদ্দীন হাসমি। কালীবাবুর বাজারে সকাল ১০ টায় সভা শুরু হলো। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতি ভাষণ শেষ করেছেন, এমন সময় পুলিশ সভাস্থল ঘিরে ফেলে সুশীল মুখার্জী ও তাঁর ছোট

ভাই সুবোধ মুখার্জী—তাদের দুই বোন সুরমা ও সুষমাকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তার হলেন জালালুদ্দীন হাসমি, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

বৈষ্ণব পাড়ায় গোপন ক্যাম্প করে যুবকদের রাখা হয়েছিল, এখান থেকে নানা জায়গায় তাঁরা গোপন 'লিফলেট' প্রচার করতেন। অরুণ ব্যানার্জী গোপনে 'লিফলেট' লিখতেন এবং তা ছাপা হতো শালকিয়ায় ইন্দু মুখার্জীর বাড়িতে। একদিন সকালে এই ক্যাম্প থেকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করলো অরুণ ব্যানার্জী, মনোমোহন রায়, তারাপদ মজুমদার, দুলাল দত্ত, জলধর সাউ প্রভৃতিকে। [৯]

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের আলিন্দ যুদ্ধখ্যাত বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয় ১৯৩১-এর ৭ই জুলাই। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইনের উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটির একটি সভায় ঐ বিপ্লবী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। [১০]

সূত্র ঃ (১) শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড)-গোপালচন্দ্র রায়।

(১/১) স্মৃতিসুন্দর—প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১/২) অমিয় ঘোষ রচিত প্রবন্ধ 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়'।

(১/৩) নূতন তথ্যে শরৎচন্দ্র -গোপালচন্দ্র রায় (পৃঃ১৩৮-১৩৯)।

(১ক) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১ম)-সরোজ মুখার্জী (পৃঃ২৩)।

(২) হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র-সম্পাদকঃ নির্মলকুমার খাঁ (পৃঃ৫৮)।

(৩) নূতন তথ্যে শরৎচন্দ্র -গোপালচন্দ্র রায় (পৃঃ১৪৮)।

(৪) আর.এস.পি নেতা রামপ্রসাদ মুখার্জী কথিত।

(৪ক) ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস-সুপ্রকাশ রায় (পৃঃ৫২১)।

৪(খ) ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব-ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় (পৃঃ৪৪২-৪৪৪); ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১ম)-সরোজ মুখার্জী (পৃঃ২১৪)।

(৫) নূতন তথ্যে শরৎচন্দ্র-গোপাল চন্দ্র রায় (পৃঃ১৪০)।

(৫ক) হাওড়ার বিপিনবিহারী বসু কথিত।

(৬) পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কথিত।

(৭) নূতন তথ্যে শরৎচন্দ্র -গোপালচন্দ্র রায় (পৃঃ১৪০)।

(৭ক) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত-স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানী বৃন্দ (পৃঃ১০৫)।

(৮) মৌড়ীর গেপাল চক্রবর্তী ও ডোমজুড়ের জয়কেশ মুখার্জী প্রদত্ত তথ্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়াজেলার সেনানীবৃন্দ- সম্পাদনা ঃ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত।

(৯) ডঃ কিরণ চৌধুরীর ইতিহাস গ্রন্থ; অমিয় ঘোষ রচিত -'বিপ্লবী হরেন্দনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়' প্রবন্ধ।

(১০) ঐ শেষোক্ত প্রবন্ধ।

প্রচারে —লণ্ঠন লেকচার ঃ দেশবন্ধুর মৃত্যু (১৯২৫-এর ১৬ই জুন)-র পর কলকাতায় পল্লী সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পল্লীর মানুষদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এই সমিতির ভার নেন। এই সময় থেকেই ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতার তিনি প্রচলন করেন। এই বক্তৃতা ও তৎসহ স্লাইডে চিত্রপ্রদর্শনী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' অবলম্বনে নানারকম মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে ছবি করানো হয়। আরও নানা রকমের স্লাইড ছিল। ইংরেজদের দ্বারা কি ভাবে তাঁতীদের আঙুল কাটা হয় ও তাদের ওপর কিভাবে নানারকম জুলুম চলে। ভারতের অনটনের হেতু, কাঁচামাল বাইরে রপ্তানি হওয়া ও বিদেশী মালের ভারতে আমদানী হওয়া এইসব এবং কিছু কিছু সামাজিক অব্যবস্থার কথা তাতে তুলে ধরা হয়েছিল। স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্নকে জড়িয়ে ছবি দেখানো হতো। সন্ধ্যের পর অনুষ্ঠান শুরু হতো।[১] এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন নানা উদ্ধৃত-বচন।— এই রকম প্রচারের মধ্য দিয়ে গ্রাম-শহরের সাধারণ মানুষ বৈদেশিক শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেন এবং তাঁদের স্বাধীনতা প্রীতি বাড়তো। বিদেশী দ্রব্য বর্জন যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা-ও সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতেন।

হাওড়া জেলার শহর-গ্রামের প্রায় সর্বত্র এই ল্যাণ্টার্ন লেকচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানেই স্বদেশী কর্মীরা আছেন, সেখানেই তাঁরা এই লেকচারের ব্যবস্থা করতেন।

সভাসমিতির অনুষ্ঠানেও এই লেকচার-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকতো। টাউন হল, কদমতলা বাজার, দফরপুর, খাঁটোরা, পার্বতীপুর, জয়পুর, ঝিখিরা বাজার, গড়ভবানীপুর বাজার, খালনা, তাজপুর, গাজীপুর বাজার, বাগনান, থলিয়া বাজার, উদয়নারায়ণপুর, সিংটি-শিবপুর বাজার প্রভৃতিস্থানে স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় ল্যান্টার্ন লেকচারের ব্যবস্থা করা হতো। শহরও গ্রামের লোকেরা যত্ন সহকারে তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' প্রবন্ধে অমিয় ঘোষ লিখছেন-

"হরেন্দ্রনাথ জেলা সম্পাদক হবার পর তিনি মনে করলেন কংগ্রেসকে সংগ্রামমুখী করে তুলতে হলে—শহরের ধনী ও মধ্যবিত্তদের বৈঠকখানা থেকে কংগ্রেসকে গ্রামের কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি কয়েকজন পুরান কংগ্রেস নেতা বিপিন বসু, গুরুদাস দত্ত, ননী ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের প্রচার কার্যের এক অভিনব ব্যবস্থা নিলেন। তার সঙ্গে নিলেন হারমোনিয়ম ও ম্যাজিক লণ্ঠন। নিজেরাই কাঁধে করে বহন করতেন। এক গ্রামে উপস্থিত হয়ে প্রখ্যাত দেশাত্মবোধক গায়ক বিপিন বসু বন্দেমাতরম ও অন্যান্য স্বদেশীগান শুরু

করে ভীড় জমিয়ে দিতেন.....ঐ সঙ্গে বক্তৃতা করতেন ননী ভট্টাচায ও গুরুদাস দত্ত মহাশয়। এর ফলে গ্রামে গ্রামে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হোল।"[২]

সূত্র ঃ

(১) 'দেশ' ২২ অক্টোবর, ১৯৯৭-'কষ্টকল্পিত'-অতুল্য ঘোষ

(২) দফরপুরের পরেশ ঘোষ-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ; 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা ১৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা-প্রবন্ধঃ 'হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগ্রাম সংগঠন ও নিতাই মণ্ডলের জীবনী ও সংগ্রাম কাহিনী'- অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

আইন অমান্য আন্দোলনে

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সেদিন হাওড়া টাউন হলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। [১]—একথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

১৯৩০-এ গান্ধীজীর ব্রিটিশের সঙ্গে অহিংস অসহযোগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাপক মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হবার দিন থেকেই আন্দোলন শুরু হলো। হাওড়া শহরের বে-সরকারী স্কুলগুলো (একমাত্র হাওড়া জেলা স্কুল বাদে) ছ মাস ধরে বন্ধ ছিল। হরেন ঘোষ, সতীসাধন গায়েন (মাজু), পান্নালাল চৌধুরী (সাঁতরাগাছি) প্রভৃতির নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।[২]

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য শুরু করেন। কলকাতা এলবার্ট হলে (বর্তমানের ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটের দ্বিতলে) স্টুডেন্টস কনভেনশন হয়। সেই বছর ৪ঠা মার্চ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। এলবার্ট হলে প্রচুর ছাত্র সমাগম হয়। সরোজিনী নাইডু প্রেসিডেন্ট ছিলেন, প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। ভিড়ে ঠাসা সেই সভায় নেতৃবৃন্দ উদ্দীপনাময়ী-ভাষণে ছাত্রসমাজকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেল ভরতে আহ্বান জানালেন।

এই আহ্বান ছাত্রসমাজ গ্রহণ করলো, দেশবাসী এগিয়ে এলেন। দলে দলে দেশপ্রেমিক মানুষ আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে লাগলেন। জেলের সম্প্রসারণ করতে হলো সরকারকে। দমদমে মাঠের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে জেলখানা তৈরী করতে হলো। নতুন নতুন ক্যাম্প তৈরি করতে হলো বন্দীদের রাখবার জন্য।

জনগণের উন্মাদনাও উঠলো চরম শিখরে। রাস্তায়, ট্রেনে সবার হাতে একখানা করে গীতা, একটা করে তকলি। [২ক]

আইন অমান্য কারীদের জন্য নানাস্থানে শিবির তৈরী হতে লাগল। তখন এমন সর্বত্রগামী বাস-সার্ভিস চালু হয়নি। সাইকেলে করে বা পায়ে হেঁটে শিবিরে শিবিরে যোগযোগ রাখার কর্মী ঠিক করতে হলো। কোন গ্রামেই দু-চার খানার বেশী সাইকেল ছিল না। তাই সাইকেলে করে যোগযোগকারীর সংখ্যাও বেশী ছিল না। শিবিরে শিবিরে থাকা খাবার ব্যবস্থা, কারা কবে আইন অমান্য করবেন তার তালিকা প্রস্তুতিকরণ চলতে লাগল। কেউ কেউ শিবিরে যোগ না দিয়েও কংগ্রেস কার্যালয়ে নাম লেখাতে লাগলেন। বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিরাট কর্মোদ্যোগ শুরু হয়ে গেল। হাট-বাজারে ব্যাপারীদের কাছ থেকে তোলা নেওয়া হতো, দোকানদাররা টাকা দিতেন। এইভাবে হতো শিবিরে শিবিরে ব্যয় সংকুলান। শ্যামপুর থানার নওদা গ্রামের হরিচরণ মাইতির পুত্র সন্তোষ কুমার মাইতি ছিলেন সারা জেলার শিবিরে শিবিরে সংযোগ রক্ষাকারী একজন কর্মী। তিনি বড়গাছিয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। [২খ]

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের নেতারাও কৌশল হিসাবে আইন অমান্যে যোগদান করার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিতেন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী—যাঁর সঙ্গে হাওড়া-জেলার সশস্ত্র বিপ্লববাদী যুবকদের বিপুল অংশের যোগ ছিল—তিনি নিজে মধ্য কলকাতায় আইন অমান্যকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কর্মীদের আইন-অমান্যে অংশ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। [২গ]

২৩শে এপ্রিল হাওড়া হাটে বিলাতী কাপড় বিক্রি বন্ধ করার জন্য পিকেটিং শুরু হলে সত্যাগ্রহীদের নেতা অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করে। তারপর সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি-চালিয়ে ৮ জনকে আহত করে। ওখান থেকে বিপিন বসু, কার্তিক দত্ত, সাধন মিত্র, নারায়ণদাস মুখার্জী, বিভূতি মুখার্জী, বৃন্দাবন বসু, তারাপদ মজুমদার, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শান্তি দাশগুপ্ত, মনোমোহন রায় প্রমুখ ৩০ জনেরও বেশী সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। —এই ঘটনার পরই সারা শহরে হরতাল পালিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বরদাপ্রসন্ন পাইন, ভোলানাথ রায়, প্রবোধচন্দ্র বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা হাওড়া থানা থেকে বেরিয়ে হাওড়া কোর্ট হয়ে হাওড়া জেল পর্যন্ত সত্যাগ্রহী বন্দীদের অনুগমন করে। সকল বন্দীরই ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। [৩]

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে মধ্য হাওড়ার কয়েকজন কর্মী পথ অবরোধ আন্দোলনে নামেন। লেণ্টু বোস যুগান্তর দলের কর্মী ছিলেন। পঞ্চাননতলার মিত্র পরিবারের শৈলেন

মিত্র নীরব কর্মী ছিলেন। তাঁর বাড়ির সবাই যুগান্তরের লোক ছিলেন এবং তিনি নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। সাইকেলে করে আগ্নেয়াস্ত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দিয়ে আসতেন। তাঁর দাদা নির্মল মিত্র (এড্‌ভোকেট) বিপিন গাঙ্গুলীকে টাকা দিতেন। বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং একদিন পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে। শৈলেন মিত্র 'আর্মস'-সহ এ ছাদ-ওছাদ লাফিয়ে পালিয়ে যান। মনোহর দাস (পঞ্চাননতলারোড), ললিত মণ্ডল (লক্ষণ দাস লেন), দানু বোস (লক্ষণ দাস লেন)-এরা সবাই অস্ত্র বহন করতেন। ৫ই মে '৩০ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলে ৬ই মে সারা ভারতের সঙ্গে হাওড়াতেও হরতাল পালিত হয়। তখন তেলকল ঘাট থেকে পঞ্চাননতলা রোডের উপর দিয়ে মার্টিন ট্রেন চলতো। শীতলাতলা ক্ষীরেরতলার কাছে রেললাইনে ইট কাঠ ফেলে এঁরা সবাই মার্টিন ট্রেন অবরোধ করেছিলেন। সোডার বোতল ছুঁড়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই হয়। শীতলাতলার সামনের একজন লোক পুলিশকে মদত দিয়েছিল, তাকে মারার জন্য 'বম্ব চার্জ' করতে সে পালিয়ে যায়। পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। হরেন্দ্রনাথ ঘোষের দাদা সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র সুকুমার সহ ১০/১২ জন আহত হন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ হরেন্দ্রনাথের খোঁজে হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে তার বাসায় গিয়ে জিনিসপত্র তছনচ্ করে দেয় এবং তাঁর ভাই প্রভাসচন্দ্রকে বেদম প্রহার করে।[৪]

১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিভিন্নস্থানে ব্যাপক গ্রেপ্তার বরণ চলতে থাকে। ২৫শে জুলাই ৪নং তেলকলঘাট রোডের কংগ্রেস অফিস সার্চ করে পুলিশ কংগ্রেস নেতা হরেন্দ্রনাথ ঘোষ সহ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হন পাঁচলা থানার জুজার সাহার বিহারীলাল হাজরার পুত্র রামচন্দ্র হাজরা, উদয়নারায়ণ পুরের রামপুর গ্রামের দুর্গাপদ নিয়োগীর পুত্র যুগোল কিশোর নিয়োগী, শিবপুরের ৩/২ রামমোহন মুখার্জী লেনের বিনোদ বিহারী মুখার্জীর পুত্র নয়নরঞ্জন মুখার্জী প্রমুখ কর্মীরা। জুজারসাহার রামচন্দ্র হাজরার হাওড়া কোর্টে ১৪৪ধারা ভঙ্গের অপরাধেও সাজা হয়েছিল।[৫]

বেলিলিয়াস পার্কের 'হাওড়া ভলাণ্টিয়ার্স'-এর শিবির থেকে ক্যাম্পের অধিনায়ক সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জগাছা ক্যাম্পে হানা দিয়ে সাঁতরাগাছি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ধীরেন সান্যাল সহ ৩১ জনকে ধরে। সাঁতরাগাছি শঙ্করমঠে হানা দিয়ে জহর কুণ্ডু সহ ৫০ জনের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। রামরাজাতলার যে মেসে স্বেচ্ছাসেবকরা খেতেন, সে মেসের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে। কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক মন্মথনাথ দাস সহ হরিপদ রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল চৌধুরী, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন।[৬]

হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের উপেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র চুনীলাল দত্ত বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। জেলখানায় লাঠিচার্জের ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। ৫নং কালাচাঁদ নন্দী লেনের মতিলাল সরকারের পুত্র কৃষ্ণকমল সরকার আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেন। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করে চিকিৎসক হন। রামকৃষ্ণপুরের ৪২বি কৈলাসবসু লেনের যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্র সুবলচন্দ্র চক্রবর্তী জেলার কংগ্রেসের সদর দপ্তরের কর্মী ছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল পাঁচলা থানার গোগুল পাড়ায়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনের ঢেউ ঐ বছরেই শেষ হয়ে যায় না। হাজার কর্মীতে জেল ভরে গেলেও আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দেও বহুসংখ্যক কর্মী আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করতে থাকেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া রামরাজাতলার চৌধুরীপাড়ার মাঠে রাজনৈতিক সভা চলার সময় পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। ওইখানে উলুবেড়িয়া থানার কৈজুড়ি গ্রামের হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অনীষ মুখোপাধ্যায়, মুগকল্যাণের শরৎচন্দ্র সরকারের পুত্র প্রফুল্লকুমার সরকার গ্রেপ্তার হন।

হাওড়ার ২২নং রামেন্দুপ্রসাদ মজুমদার লেনের নিত্যগোপাল ঘোষের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, ৫২নং সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেনের পরেশচন্দ্র বসুর পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ বসু আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করেন। [৭]

১৯৩০ সালে বালি খালধারে সজনী বটব্যালের আবগারি মদের দোকানে পিকেটিং হয়। "এ বিষয়ে সর্ব পর্যায়ে সকল সময় রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, উপেন্দ্র দাস, শৈল মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বহু নির্যাতন ও কারাদন্ড ভোগ করিয়াছেন।" [৮] শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আইন, অমান্যে অংশগ্রহণ করার সময় পুলিশ কর্তৃক নির্মমভাবে প্রহৃত হন। [৮ক]

১৯৩২সালে বালি থানার কাছে জি.টি.রোডে মিছিল করে সরকার বিরোধী শ্লোগান দেবার অভিযোগে শৈলেন মুখার্জী গ্রেপ্তার হন ও দেড় বছর কারাদন্ড ভোগ করেন। হাওড়া আদালতে তাঁর বিচার হয়। [৯]

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার জন্য বালির রতনমণি চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার নায়ক মনোনীত হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। [১০]

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্যে যোগ দিয়ে শালকিয়ার ৮৪নং শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের পূর্ণপ্রসাদ মিত্র (পিতা-আশুতোষ মিত্র), ১০/৩ মীরপাড়া লেনের মুরারী মোহন দে (পিতা-চণ্ডীচরণ দে), দশরথ ঘোষ লেনের সুধাংশু মুখার্জী (পিতা-ইন্দু মুখার্জী)

সালকিয়ার আবগারি দোকানে পিকেটিং করে কারাবরণ করেন এবং বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। পূর্ণবাবু পূর্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। [১১]

বাঁধাঘাটের অরবিন্দ আগরওয়াল, বাবুডাঙ্গার অধীর চ্যাটার্জী এবং পিলখানার মকবুল আলীও পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন ও বিচারে সাজা পান।

১৯৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়ার অনুকূল শেঠ, ইন্দুভূষণ মুখার্জী, শঙ্করলাল মুখার্জী, নন্দলাল মোহন্ত, ব্রজলাল মোহন্ত, সুধীর মাইতি, হরিসাধন মাইতি, বামুনগাছির কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, সিন্ধুমণি কুমার, কালীকৃষ্ণ দাস, নিতাইচন্দ্র বেলেল, গোবিন্দলাল দেঁড়েল, রামপদ বেরা, রামপদ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইন্দুভূষণ মুখার্জী ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য তাঁর চাকরী যায়। তিনি একসময় জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৩৭-'৪৫ পর্যন্ত তিনি হাওড়া পৌরসভার কমিশনার হয়েছিলেন। বাঁধাঘাটে বিলাতী বস্ত্র পোড়ানোয় অংশ নেন সুকুমারী দেবী (ইন্দুভূষণ মুখার্জীর ভগিনী) ও কুমুদিনী দাসী (কালীকৃষ্ণ দাসের ঠাকুমা) গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে বাঁধা ঘাটে রাখালচন্দ্র সাহার মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে শঙ্করলাল মুখার্জী পুলিশের লাঠি চালনায় কানে আঘাত পান। এখানে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ছিলেন বাবুডাঙ্গার জিতেন মুখার্জী, উপেন মিত্র লেনের নন্দ মোহন্ত ও বলাই দাস, মহীনাথ পোড়েল লেনের কানাইলাল দেয়াশী, ক্ষেত্রমিত্র লেনের সুধীর মাইতি প্রমুখ। [১২]

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুলাই শিবপুরের মদের দোকানে পিকেটিং হয়। এখানে গ্রেপ্তার হন ৩৯১নং জি.টি.রোডের ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯৩২ খ্রীঃ ২৬শে জানুয়ারী শিবপুর মন্দিরতলায় পতাকা উত্তোলন করেও গ্রেপ্তার হন। পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁর একটি আঙুল ভেঙে যায় ও চোখে আঘাত লাগে। শিবপুরের ১১নং কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেনের শিবকালী মজুমদারের পুত্র তারাপদ মজুমদার আইন অমান্য করে জেলে যান। [১৩]

২১.৪.১৯৩০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়,—

"১৯শে এপ্রিল ১২-৩০ ঘটিকার সময় একদল ভারতীয় কনস্টেবলসহ সাব-ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত আইন অমান্য পরিষদের কার্যালয়ে আসিয়া খানাতল্লাস করে। দুই ঘন্টা ধরিয়া খানাতল্লাস চলিয়াছিল। অফিসের খাতাপত্র ও কার্যবিবরণী প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে. তাহা ছাড়া 'মরণ বিজয়ী যতীন দাস' ও 'স্বরাজগীত' নামক গ্রন্থ লইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মাইতির বাড়িতেও খানাতল্লাস হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অগমনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মাইতিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।" [১৪]

শিবপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা সুশীলকুমার মুখার্জীর ভগিনীদ্বয়—সুষমা মুখোপাধ্যায় ও সুরমা মুখোপাধ্যায় পূর্বেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। আবার ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য করে তাঁরা কারাবরণ করেন। [১৫]

পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামের যুবকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। কয়েকটিমাত্র ব্রিটিশভক্ত পরিবার ছাড়া বাকি সব পরিবারের যুবকরাই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ঘরে ঘরে তকলী কাটা, চরকায় সুতা কাটা শুরু হয়, সভা শোভাযাত্রা হতে থাকে এবং চলে পিকেটিং। এই সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এই গ্রামেরই প্রবোধকুমার মান্না ও তাঁর সহকারীবৃন্দ। স্বাধীনতার মন্ত্র শেখাবার জন্য গঙ্গাধরপুর গ্রামে গড়ে ওঠে 'অমূল্য বিদ্যামন্দির'।

এই গ্রামের দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (পিতা লক্ষীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়) জেলার মধ্যে ও জেলার বাইরে বিভিন্নস্থানে আন্দোলনে যোগদান করেন ও কারাবরণ করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মাজুতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে থাকেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্রবে তিনি আসেন। তাঁরই নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদেন ও কারাবরণ করেন। কলকাতার জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। সত্যাগ্রহী হিসাবে ইনি বিহার পর্যন্ত পদব্রজে যান। এঁর সঙ্গী থাকেন পাঁচলা থানার গোগুলপাড়া গ্রামের মহাদেব পাত্র (পিতা ভূতনাথ পাত্র)। পরে ইনি আইন পাশ করেন ও আইন ব্যবসায় নিযুক্ত হন। এঁর এবং ঐ গ্রামের হাতেম পুরকাইতের নেতৃত্বেই জুজারসাহা গ্রামে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। [১৬]

১৯৩০-এ পাঁচলা থানার সন্ধিপুর পোলের কাছে মিটিং করার সময় গ্রেপ্তার হন ডোমজুড় থানার কেশবপুর গ্রামের কিশোরীমোহন খাঁড়া (পিতা হলধর), পাঁচলার জ্ঞানেশ ঘোষ ও অশ্বিনী জানা, জুজারসাহার রামু হাজরা, গঙ্গাধর পুরের জীবন কোলে প্রমুখ ৩২ জন। তাঁদের সকলেরই ৩ মাসের কারাদণ্ড হয়। কিশোরী খাঁড়া দ্বিতীয়বার ধরা পড়েন গুরুদাস দত্তের বাড়ি থেকে। ওখানে ঐদিন মোট ৪জন গ্রেপ্তার হন। পুলিশ টাইপরাইটার মেসিন (ইংরাজী ও বাংলা), ১১ দিস্তা কাগজ প্রভৃতি নিয়ে যায়। সকলের ৩ মাস করে জেল হয়। কেশবপুর থেকে কিশোরীবাবু একাই ছিলেন। [১৭]

জুজারসাহার লক্ষীনারায়ণ দত্ত (পিতা হরিপদ) মোট ৩ বার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০-এ সিদ্ধেশ্বরে বুলেটিন বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। সাদা-পোশাকে পুলিশ কুলডাঙ্গা থেকে পিছু নেয়। শিবমন্দিরের কাছে বুলেটিন বিক্রি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে

ধরে। ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১-এর ৫ই জানুয়ারী ছাড়া পান। ১৯৩১-এর ২৬শে জানুয়ারী কুলডাঙ্গা স্কুলের কাছে পতাকা উত্তোলন করার সময় দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় (গঙ্গাধরপুর), রাধাকান্ত গলুই (জয়নগর), দিবাকর খাঁড়া (জয়নগর), ভবতারণ হাজরা, গুরুদাস দত্ত ও খাঁদু রায় (জুজারসাহা) প্রমুখ ১৬ জনকে ধরে ও ৬ মাস করে সকলেরই জেল হয়। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হন বড়বাহিরিয়ায় পঞ্চানন চক্রবর্তীর ডাক্তারখানার সামনের সভা থেকে। ওখানে সাধন মিত্র, বৃন্দাবন বসু প্রভৃতি মোট ৬ জন গ্রেপ্তার হন। এখানে যখন ওঁরা জনৈক বোধকের বাড়িতে বসেছিলেন, তখনই পুলিশ গিয়ে ধরে। প্রত্যেকের তিন মাসের জেল হয়। লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর বাবা ও দাদা স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ওদের বাড়িতে হাতেম পুরকাইত, খাঁদু রায় প্রমুখ নেতারা আসতেন ও থাকতেন।[১৮]

দুর্গাবাবুর নেতৃত্বে পাঁচলা থানার জুজারসাহার সতীশ হাজরা, হাতেম পুরকাইত, জিতেন পাত্র, পরেশ পাত্র, রামচন্দ্র হাজরা, গঙ্গাধরপুরের জীবন কোলে, গঙ্গাধর চক্রবর্তী এবং দেউলপুরের রাধাবল্লভ মাজী (পিতা-কৃষ্ণধন) সংগঠনের স্বার্থে ট্রেন যোগে রাউরকেল্লা যান। মাজুর অনেক যুবকও গিয়েছিলেন। এই সকল কর্মীদের দীর্ঘদিন বেলিলিয়াস ক্যাম্পেও থাকতে হয়েছিল। ওখানে পিকেটিং-এর প্রোগ্রাম দিত। রামকৃষ্ণপুরে, টিকিয়াপাড়ায় গাঁজার দোকানে, কালীবাবুর বাজারে পিকেটিং প্রভৃতিতে কর্মীরা অংশ নিতেন। দেউলপুরের শৈল মালিক (পিতা-হরিপদ) তাঁর পিতার মুদিখানা দোকানে বিলাতী কাপড় বিক্রী করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শৈলবাবু সত্যাগ্রহীদের অর্থসাহায্যও করতেন। তাঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। জালালসীর সতীশ মালও অর্থ সাহায্য করতেন। উপরন্তু তিনি দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলন পরিচালনাও করতেন—কোথায় মিটিং হবে, কে কোথায় থাকবে খাবে লুকোবে—তাও ঠিক করতেন। জালালসীর সমতুল মাজী জেল খেটেছিলেন। দেউলপুরের যতীন কোলে কুলডাঙ্গা বাজারে ধরা পড়েন, তিনি প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। কুল্লাই গ্রামের শিশির বাগও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবন কোলে মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন এবং সভাসমিতিতে সে গান গাওয়া হতো। তখন সভাসমিতিতে যে-সব গান গাওয়া হোত তার কয়েকটি,—

'দেশের জন্য গান্ধী হয়েছেন বন্দী....'

'আমরা চাষী মজুর ভাই

ঘরে ঘরে শিল্প চালাই, উঠান মাঠে চাষ লাগাই....' প্রভৃতি।

একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নিয়ে মাথায় 'বন্দেমাতরম' লেখা টুপি পরে শোভাযাত্রা হতো। ১৯৩২ সালে জগৎবল্লভপুর থানার অধীন বহরিয়া শিবতলায় পঞ্চুডাক্তারের ডিসপেনসারির কাছে মিটিং হয়। মিটিং-এ দুর্গাবাবু বক্তৃতা দেন। ওখান

থেকে কংগ্রেস পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে কুলডাঙ্গা বাজারে পিকেটিং করতে যান। সেখানে পাঁচলা থানার দারোগা আগে থেকেই ছিলেন। সেখানে গ্রেপ্তার হন দেউলপুরের রাধাবল্লভ মাজী (পিতা কৃষ্ণধন) ও শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পিতা-মিহিরলাল)। হাওড়া কোর্টে দেড়মাসের সাজা হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান দেয়। সেখানে বিমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে দেখা হয়। [১৯]

১৯৩২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কুলডাঙ্গা বাজারে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন পাঁচলা থানার শুভরআড়া গ্রামের হীরালাল মান্নার পুত্র পুলিনচন্দ্র মান্না, সাধনচন্দ্র সামন্তের পুত্র জিতেন্দ্রনাথ সামন্ত, দুখীরাম খাঁ-এর পুত্র বাবুরাম খাঁ, জুজারসাহা গ্রামের সেখ আবদুল মুজিদ প্রভৃতি।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন জুজার সাহার বসন্ত রায়ের পুত্র অমূল্য চরণ রায়।

১৯৩২ সালে আন্দোলন দমনের জন্য পাঁচলা থানার ধূলাগড়িতে ব্রিটিশ সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে। এই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হন কুলগাছিয়া গ্রামের সীতারাম বসুর পুত্র গোষ্ঠবিহারী বসু, জুজারসাহার নগেন্দ্রনাথ পাত্রের পুত্র মদনমোহন পাত্র, হরিদাস মান্নার পুত্র সুফলচন্দ্র মান্না প্রভৃতি। ঐ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন জুজারসাহার সতীশচন্দ্র হাজরা (পিতা-পূর্ণচন্দ্র হাজরা), পরেশচন্দ্র পাত্র (পিতা-সাধনচন্দ্র পাত্র), জিতেন্দ্রনাথ পাত্র (পিতা-দুধকুমার পাত্র) প্রভৃতি। [২০]

মাজুগ্রামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়বারের সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে শালকিয়ার ক্ষেত্রমিত্র লেনের বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীসাধন বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ গায়েন (পিতা-কালীপদ গায়েন) সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে হাওড়ার এস.ডি.ও-র আদালতে আনা হলে তিনি ওখানে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেন এবং সেই অভিযোগেও তাঁর সাজা হয়।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী মাজুগ্রামে গড়ে উঠেছিল। সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে মাজুবাজারে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন ও সাজা প্রাপ্ত হয়ে দমদম ও প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী থাকেন।

বাগনানের বিভূতিভূষণ ঘোষের (বাঙালপুর) শিবির থেকে শিক্ষা নিয়ে বাগনান থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মাখনলাল মাইতির পুত্র ধরণীধর মাইতি মাজু গ্রামে আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। সাহাগড়ি গ্রামের হরিপদ রায়ের পুত্র কানাই লাল রায়ও মাজুতে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। [২১] অরবিন্দ গায়েন

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়া জেলা সংরক্ষিত তপশীলী আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়যুক্ত হন।

আন্দুল মৌড়ী এলাকার বিপ্লবী দলের কর্মীরা সকলের জেলে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাই দু-একজন যদি যায় যাক—এই মনোভাবের কথাই ডাঃ ললিত চক্রবর্তী ও অন্যান্য নেতারা এখানে কর্মীদের বোঝাতে থাকেন।

মৌড়ী চক্রবর্তীপাড়ার রেবতী চট্টোপাধ্যায় লবণ সত্যাগ্রহে জেলে গিয়েছিলেন। তিনি তখন আই, এস, সি ক্লাসের ছাত্র। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে বি,এস,সি-তে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন এবং এম,এস-সি পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন।

পত্র-পত্রিকাগুলি বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার উঠেপড়ে লাগে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের গ্রুপ থেকে 'এড্‌ভান্স' কাগজ বেরোত। তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় 'নিউ এড্‌ভান্স' নাম দিয়ে কিছুদিন বের হয়। কিন্তু তাও বন্ধ হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রুপ থেকে 'লিবার্টি' বের হোত, তাও বন্ধ হয়ে গেল। অথচ যুবক কর্মীদের মধ্যে সংবাদপত্র প্রচাব ছাড়া দল ঠিক রাখা সম্ভব নয়। তখন 'লিথো' করে প্রতিদিন কাগজ বের করা হতে থাকে।

প্রকাশ্যে কাগজ বিতরণ করা অসম্ভব হয়ে যায়। প্রতিদিনই আই-বি-র লোকের আনাগোনা। ডাঃ ললিতমোহন চক্রবর্তীর ডিসপেনসারির সামনে প্রতিদিন আই বি এসে বসে থাকে। নানা রকম খোঁজ খবর নেয়। তাই গোপাল চক্রবর্তী, প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ কর্মীরা 'লিথো' করা কাগজ প্রতিদিন কর্মীদের বাড়ীর সামনে রাত্রির অন্ধকারে গিয়ে ফেলে রেখে আসতেন। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যেই কর্মীরা এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী', জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক', 'Flowers of Bengal' নামে একখানা বই বে-আইনী বলে ঘোষিত হোল। এইসব থাকতো ডাঃ ইন্দুভূষণ দাসের কাছে। কর্মীদের নিয়ে মাঝে মাঝে পড়া হোত। কেউ কেউ গোপনে নিয়ে নিজেও পড়তো। ক্রমশঃ পুলিশী হামলার আশঙ্কা বেড়ে যায়! একদিন হামলার আশঙ্কা করে পাঁচুগোপাল তরফদার ইন্দুবাবুকে বইগুলি নষ্ট করে দিতে বলেন। বইগুলি ইন্দুবাবু আগুনে পুড়িয়ে দেন।[২২]

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট আন্দুল বাজারে পিকেটিং হয়। গ্রেপ্তার হন ও ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন দুইল্যা গ্রামের বলাইচন্দ্র দাস (পিতা-বিনোদবিহারী দাস)।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনেও আন্দুল ঝোড়হাটের পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। তাঁর সহধর্মিনী করুণাময়ী দেবীও আইন অমান্য আন্দোলনে স্বামীর নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেন এবং হাওড়া জেলার মধ্যে

আইন অম্যন্য আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণকারিণীর মর্যাদা লাভ করেন। করুণাময়ী দেবী তখনকার দিনের প্রখ্যাতা কংগ্রেস নেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার, বাসন্তী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নির্ঝরিণী সরকার প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, ১৯২১ সালের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে পুলিনবাবু জেলে গিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যে সম্বর্ধনা সভা হয় পুলিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। [২৩]

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বলুহাটি হাটতলায় চারু চক্রবর্তীর আফিং গাঁজার দোকানে প্রথম পিকেটিং হয়। স্থির হয়, একই দিনে সব কর্মী আইন অমান্যে অংশ নেবেন না। আন্দোলনকে স্থায়ী করার জন্য তারাপ্রসন্ন দে'র পুত্র রাজেন্দ্র নাথ দে প্রমুখ কিছু কিছু সংগঠক গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকবেন। প্রথম দিনের আইন অম্যান্যে অংশ নেন বলুহাটির সুবোধ মুখার্জী ও সুশীল ভট্টাচার্য। তার পরের শুক্রবার বলুহাটির যামিনী দাস, বেচারাম মুখার্জী, নির্মল দাশ ও জ্যোতগিরির কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার বরণ করেন। তার পরের সপ্তাহে বলুহাটির ফেলুরাম মুখার্জী ও তুলসী দাস গ্রেপ্তার হন। সকলকেই গ্রেপ্তারের পর প্রথমরাত্রি ডোমজুড় থানায় রাখে। সকলেরই এস-ডি-ও-র কোর্টে বিচার হয় ও ছ মাসের কারাদণ্ড হয়। বিচারের পর বন্দীদের প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠিয়ে দেয়। তখন ঐ জেলে উলুবেড়িয়ার বিভূতি (নানু) ঘোষ ছিলেন। তিনি ওখানে যুবক কর্মীদের খেলাধূলা করাতেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনে নানু বাবুর আস্থা ছিল না। তিনি কর্মীদের সশস্ত্র বিপ্লব করার পরামর্শ দিতেন এবং তার জন্য প্রস্তুত হবার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে ভাল লাঠি খেলা ও কুস্তী জানতেন। ঐ জেলে তখন হাওড়ার হরেন ঘোষ, অগম দত্ত, দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবর্গ ডেটিনিউ হিসাবে কারারুদ্ধ ছিলেন। ওঁরা জানালার ধারে ধারে এসে কর্মীদের খুবই উৎসাহ দিতেন।

বলুহাটির কর্মীরা প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালেই ঐ জেলে সেই বিখ্যাত পাগলাঘন্টি বেজেছিল—যাতে বরিশালের বিখ্যাত নেতা সতীন সেন আহত হয়েছিলেন। লাঠি চার্জের সময় বলুহাটির সুবোধ মুখার্জীও আহত হন। লাঠি চার্জের পরই বন্দীদের বিভিন্ন জেলে যখন স্থানান্তরিত করে তখন বলুহাটীর কর্মীদেরও ঐ জেল থেকে সরিয়ে দমদম স্পেশাল জেলে নিয়ে আসে।

পরপর তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে বলুহাটির কর্মীরা পিকেটিং করার পর যেসব কর্মীরা বাকী থাকেন, তাঁরা হাওড়া শহরে গিয়ে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩১

খ্রীঃ হাওড়া আদালতে পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে বলুহাটির ভজহরি পাঁজি ও কানাইলাল দাস গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন।

এই সময় প্রেসিডেন্সী জেলে রূপ সিং নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দী হয়ে এসেছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। হাওড়া ময়দানের কাছে তাঁর ডালপুরির দোকান ছিল। হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনের কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহকর্মী ছিলেন তিনি। রূপ সিং যে কি রকম স্নেহ প্রবণ অথচ তেজস্বী প্রকৃতির যুবক ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলের একটি ঘটনায় তার প্রমাণ থেকে গিয়েছে। ঘটনাটি এই,—

তখন ভাদ্রমাস। ভোরবেলা ফাইল হবার সময় জেলের সিপাইরা 'উঠ্ যাও' বলে হাঁকতে হাঁকতে জেলে ঢুকতো। এই সময় জেলে একটি অল্প বয়সী ছেলে ছিল। সে ঘুমোচ্ছিল। সিপাইরা তাকে ঘুমুতে দেখেই তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড় করায়। উদ্দেশ্য এই, তাকে ফাইলে যথা সময়ে না দাঁড়াবার অজুহাতে পরে মারবে। এদিকে ফাইল দাঁড়িয়ে গেছে, গনা শুরু হয়ে গেছে। এই সময় রূপ সিং ছেলেটিকে নিয়ে এসে ফাইলে দাঁড় করিয়ে দেয়। ছেলেটিকে সিপাইদের মারের হাত থেকে বাঁচানোই ছিল ওর উদ্দেশ্য। যেই না ছেলেটিকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সার্জেন্ট তাই দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে রূপ সিংকে বেটন দিয়ে বেদম প্রহার করতে থাকে। রূপ সিংও শক্তিমান যুবক। তাকে যখন এলাপাথাড়ি মারছে সেও ঘুরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্টের বেটন কেড়ে নিয়ে সার্জেন্টকেই মারতে আরম্ভ করে। এই দেখে একটা ফালতু ডাকাত ছুটে গিয়ে রূপ সিংকে আক্রমণ করে। তখন ওরা সম্মিলিত ভাবে তাকে মেরে আধমরা করে দেয়।

রূপ সিং-এর ১৫ দিন সাজা হয়ে যায়। সাজার পর যখন রূপসিংকে বহরমপুর নিয়ে যায় তখন তার সহবন্দীরা দেখেন যে, রূপ সিং-এর রং কালো হয়ে গেছে। সহবন্দীদের দিকে হাতজোড় করে রূপ সিং বলে, 'বাবুজী, আমি চলে যাচ্ছি'!

স্বাধীনতা আন্দোলনে এরকম অজ্ঞাত অখ্যাত হাজার হাজার রূপ সিং রয়ে গেছেন। তাঁরা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে কতখানি ত্যাগ করে গেলেন তার হিসাব রাখারও দরকার আছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় নামী দামী লোকের কথাই থাকে। এই রকম অবজ্ঞাত মানুষদের তথ্য আহরণ করে লেখা হলে তবেই তা সত্যকারের ইতিহাস হবে বলে এই অখ্যাত তথ্য সংগ্রাহক মনে করে।

প্রেসিডেন্সী জেলে তখন নিদারুণ অব্যবস্থা চলছিল। বন্দীদের অধিকাংশই তখন প্রচন্ড রকম চুলকানিতে ভুগছিলেন। মাত্র তিনবাটি জলে বন্দীদের স্নান সারতে হোত। দেহের নোংরা ময়লা সাফ্ করার মত প্রয়োজনীয় জল ব্যবহারের সুযোগ না থাকাতেই

বন্দীদের এই সকল চর্মরোগের শিকার হতে হোত। একটু বেশী জল ব্যবহার করলেই বন্দীদের সাজা পেতে হোত। বলুহাটীর সুবোধ মুখার্জী একদিন পাঁচ বাটি জল ব্যবহার করায় একজন সার্জেন্ট এসেই তাঁর পাঁজরায় কষে এক ঘা লাঠি মারে। সুবোধবাবু ড্রেনে পড়ে যান। এই রকম নির্মম ব্যবহার চলতো জেলখানায়।

দমদম স্পেশাল জেলে কুস্তী, লাঠিখেলা, প্রভৃতির সুযোগ ছিল। বিভূতি ঘোষ নামে একজন মাষ্টার মশাই ছিলেন। তিনি এবং বিভূতি (নানু) ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। দমদম জেলের বিভূতি বাবু অহিংস সত্যাগ্রহের পক্ষে বলতেন। তিনি বন্দীদের নিয়ে সভা করতেন এবং অহিংসপথে স্বাধীনতা আদায়ের উপর জোর দিতেন। এই জেলে বাবা গুরুমুখ সিং তখন ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পাঞ্জাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

বলুহাটির গাঁজা আফিমের দোকানে পিকেটিং-এর সংগঠক রাজেন্দ্রনাথ দে গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবেন এ রকম সিদ্ধান্ত হলেও পুলিশ তাঁর নামে সাজানো মামলা আনে। পুলিশ খুঁজতে আসার পরই তিনি লুকিয়ে থাকেন। তাঁর দাদা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলায় তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর তিনমাসের জেল হয়। [২৪]

১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই বৈকাল ৩-৩০ মিনিটে বড়গাছিয়ার আবগারি দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন পাতিহালের অজিত কুমার মজুমদার ওরফে রবীন্দ্র (পিতা-ডাঃ যোগেশচন্দ্র মজুমদার), মাজুর হরেকেষ্ট মাজি, হাঁটালের গোপী মাজি, পাতিহাল ঘোষপাড়ার শচীন্দ্রনাথ ঘোষ। হাওড়া কোর্টে বিচার হয়। অজিত মজুমদারের বয়স কম থাকায় ৫ মাস এবং অন্যদের ৬ মাসের সাজা হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের বিখ্যাত পাগলাঘন্টির (১/৮/১৯৩০) সময় অজিতবাবু পিঠে আঘাত পান। ওঁদের বহরমপুর জেলে সরিয়ে দেয়।

পাতিহালের সরস্বতী গ্রাউণ্ডে মাজুর সতীসাধনবাবুর পরিচালনায় নুন তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নোনামাটি জ্বাল দিয়ে এই নুন তৈরি করা হতো। এক প্যাকেট দু আনা করে বিক্রী করা হতো। একবার জে.বি.পুরের ও. সি-কে বিক্রী করতে গেলে তিনি কিনে নেন।

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় অজিত মজুমদার এবং আরও তিনজন একজন গাইডের সঙ্গে মেদিনীপুরের বাঘাজল গ্রামে যান, ট্যাক্স বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়ে সভা করেন। তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে লিথোপ্রেস, প্রচারপত্র প্রভৃতি ছিল। ওখান থেকে ওঁরা তমলুক যান, অজয় মুখোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে দেখা করেন ও চিঠি নেন। পথিমধ্যে চারজন পুলিশ সাইকেলে করে তাড়া করে। গাইড লিথো প্রেস নিয়ে পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যায়। অজয় মুখার্জীর চিঠি

অজিত মজুমদার চিবিয়ে নষ্ট করে দেন। বিষ্ণুপুরে বিচার হয়, ছ মাসের কারাদণ্ড হয়।

অজিতবাবুদের সমগ্র পরিবারই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। [২৫]

১৯৩০-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে ডোমজুড়ে আফিংয়ের দোকানে ও প্রশস্থ নিবাসী চারুচন্দ্র সাহার ডোমজুড়ের মদের দোকানে পিকেটিং করে প্রথম জেলে যান ডোমজুড় ষষ্ঠীতলার ফটিকচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, উত্তর ঝাপড়দহের হীরামোহন গাঙ্গুলী ও কালীপদ দে, ডোমজুড় বারুইপাড়ার নরেন্দ্রনাথ হোড়, ভাণ্ডারদহ বারুইপাড়ার সুরেন্দ্রনাথ আশ। এঁদের গ্রেপ্তার বরণের পূর্বে শতাধিক মহিলা শঙ্খবাদ্য সহকারে এঁদের কপালে চন্দনের টিকা পরিয়ে দেন, আশেপাশের শত শত যুবক এঁদের মাল্যভূষিত করেন। মার্টিন ট্রেনের শত শত যাত্রী সমবেত হন, আসতে থাকে পর্যাপ্ত খাবার। কল্লোলিত জনসমুদ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'বন্দেমাতরম'। গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে প্রথমটা হতচকিত হয়ে যেতে হয়। এখান থেকে হাওড়া শহরে যাবার বাস তখনো চালু হয়নি। পৌনে দশটার ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে, ট্রেন এলে হাওড়া কোর্টে চালান দেয়। এস.ডি.ও কে.পি.মৈত্রের এজলাসে বিচার হয় এবং প্রত্যেককে ছ মাস করে সাজা দেওয়া হয়।

প্রথম দলের গ্রেপ্তারের পরই ডোমজুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

ঐ সময় পার্বতীপুর গ্রামের যুবকদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। শিক্ষক গোষ্ঠবিহারী মুখার্জীর প্রচেষ্টা, বসন্ত ঢেঁকির মির্জাপুর স্ট্রীট বোমার মামলার প্রভাব যেমন একদিকে প্রচার আন্দোলনের সহায়ক ছিল আবার বিদেশী বর্জনের ঢেউয়ে ওগ্রামে তাঁতও বসে গিয়েছিল। ঐ গ্রামের অমর চাঁদ মুখার্জী এবং ননীলাল মুখার্জী (পিতা জিতেন মুখার্জী) তাঁত বসিয়ে ছিলেন। ঘরে ঘরে চরকা কাটা হতো এবং তারই সুতোয় কাপড় বোনা হতো। ননীলাল মুখার্জীর ভাই গোপাল মুখার্জীর ঝাপড়দা বাজারে রামপদ পাত্রের দোতলার ঘরে দর্জির দোকান ছিল। সেখানে ঝাপড়দা ডিউক ইনস্টিটিউশনের ছাত্রদের যাতায়াত ছিল। ওখানে স্বদেশী ভাবাপন্ন কাগজপত্র আসতো। নিকটবর্তী স্যাকরাঘাটা শ্মশানের নির্জনতায় ছাত্ররা গিয়ে সেই কাগজ পড়তো।

গ্রীষ্মের ছুটির পর ছাত্রদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর একদিন স্কুলের টিফিনের সময় গোপাল মুখার্জীর প্রস্তাব অনুসারে ছাত্ররা মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে আমতা রোড ও জগদীশপুর রোডের মোড়ে আনোয়ার সাহেবের দোকানের সামনে এসে তাঁর দোকানের বিলাতী কাপড় টেনে বের করে রাস্তায় জড়ো করে। নিকটবর্তী আলগু সা'র দোকান থেকে কেরোসিন তেল এনে তাতে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তারা আফিঙের দোকানের সামনে বক্তৃতা দিতে থাকে। হৈ-চৈ শুনে থানা থেকে পুলিশ আসে এবং পার্বতীপুরের গোপাল

মুখার্জী, উত্তর ঝাপড়দার বক্রেশ্বর (কিশোরী) সাধুখাঁ, কানাইলাল দাস (পিতা-পঞ্চানন), কানাইলাল গাঙ্গুলী, কার্তিক দাস, দক্ষিণ ঝাপড়দার হরিচরণ দত্তের পুত্র রাধারমণ দত্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম রাত থানায় রেখে পরদিন ট্রেনে তোলার সময় কারাবরণকারীরা বিপুলভাবে জনসাধারণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। এস.এন. মোদকের এজলাসে ঐ দিনই বিচার সমাপ্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের জেল ও জরিমানা— উভয় রকমের সাজাই হয়। গোপাল মুখার্জীর কিছু বেশি মেয়াদের সাজা হয়েছিল।

এই দলের দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে একমাত্র রাধারমণ দত্তের বাড়ি ছাড়া সকল বন্দীদের বাড়ি থেকেই পুলিশ জরিমানা আদায় করে। [২৬]

১৮ই জুলাই ১৯৩০ দক্ষিণ ঝাপড়দার ডাঃ তারাপদ চ্যাটার্জী (পিতা-বঙ্কিম চ্যাটার্জী)-কে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য এবং মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য হীরেন্দ্রনাথ রায় (পিতা-বনমালী রায়)-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ইউ. এন. দাসের দোকানের সামনে পতাকা উত্তোলন করার জন্য খাঁটোরার কুবীর ঘোষ, সীতানাথ চ্যাটার্জী, পার্বতীপুরের মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী (পিতা-হরিদাস মুখার্জী) ও রামপদ মুখার্জী (পিতা-সতীশ মুখার্জী) গ্রেপ্তার হন। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ বিচার হয় ও প্রত্যেকে ৬ মাস করে কারাদণ্ড ভোগ করেন। [২৭]

ডোমজুড়ের দ্বিতীয় দফায় আইন অমান্যকারী দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা নিজের নিজের দণ্ডের মেয়াদ অন্তে সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন। বক্রেশ্বর (কিশোরী) সাধুখাঁর বাবা অভিমানে ছেলের সঙ্গে কথা বলেন না। পাড়ার স্বদেশী কর্মী নিরাপদ গাঙ্গুলী তাঁকে ধূলাগোড় সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য হাওড়ায় কংগ্রেস অফিসে গুরুদাস দত্তের কাছে ধূলাগোড় সম্মেলনের আগের দিন নিয়ে আসেন। সঙ্গে যান উত্তর ঝাপড়দার গণেশ দাস, দক্ষিণ ঝাপড়দার রাধারমণ দত্ত, খাঁটোরার অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (অমাই) প্রভৃতি। ওখানে তখন কিচেন ইনচার্জ হয়ে আছেন উত্তর ঝাপড়দার কানাই (ভোঁদড়) মণ্ডল। ওখানে ছিলেন তখন শিবপুরের সাঁঝের আটচালার গোপাল রায়, ঢাকার পূর্ণ গাঙ্গুলী এবং স্থানীয় যুবকরা। রাত্রে পুলিশ বাড়িটি ঘেরাও করে এবং মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। শিবপুর থানায় পুলিশ এদের মারধোর করে। এঁরা নিজের নাম ও বাবার নাম ঠিক রেখে পদবী ও ঠিকানা বদলে দেন। ওখান থেকে কোর্টে নিয়ে যায় এবং সকলকে বছরখানেক করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তারপর বন্দীদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এবং পরে হিজলী বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। তার কয়েকদিন আগেই (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১) ঐ জেলে তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ মিত্রকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিল।

শুধুমাত্র কংগ্রেস অফিসে থাকার জন্যই এই বারোজন কর্মীকে সশ্রম কারাদণ্ড

ভোগ করতে হলো এবং হিজলী জেলে চরম অব্যবস্থার মধ্যে দণ্ডকাল কাটাতে হলো। বন্দীরা ওখানে অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন। পুরো মেয়াদ শেষ করে সকলেই একসঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। [২৮] পুলিশ যে তখন কি রকম দিশেহারা হয়ে গ্রেপ্তার করতো তার নজির এই সময়টায় এত অজস্র যে বলে বোধ হয় শেষ করা যাবে না। ছুতো নাতায় সুযোগ পেলেই তারা গ্রেপ্তার করতো, হয়রানি করতো। এমনই গ্রেপ্তারের একটি দৃষ্টান্ত হলো—

হাওড়ার এম. সি. ঘোষ লেনে থাকতেন মানসারাম দে। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার আন্দোলনের নেতা ছিলেন। বাঙ্গালপুরের বিভূতি ঘোষের স্বদেশী যাত্রার দলে তিনি অভিনয় করতেন। একদিন দক্ষিণ ঝাঁপড়দার রাধারমণ দত্ত গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পুরানো দিনের আলাপ, তাই একটু আধটু কথাবার্তা বলাই ছিল উদ্দেশ্য। বাড়ীর সামনে গিয়ে রাধারমণ বাবু যেইমাত্র তার খোঁজ নিয়েছেন, অমনই পাশ থেকে একজন এসে ধরলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ২/১ খানা কাগজ পেলো। মনসা বাবুকেও ধরে নিয়ে এলো। ভাগ্যে জুটলো এঁদের কয়েকদিনের হাজত বাস। [২৯]

দক্ষিণ ঝাপড়দার রাজকুমার দে ও ললিত মোহন মল্লিক হাওড়া টাউন হলে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা শুনে সোদপুরে লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। সেখান থেকে মেদিনীপুরের মহিষবাথানে সত্যাগ্রহে যান, কিন্তু গ্রেপ্তার হন নি। [৩০]

খসমরা গ্রামে প্রথম কংগ্রেস অফিস খোলেন মেঘনাদ ঘোষ (পিতা-দাশরথি ঘোষ)। সেখানে তাঁত বসানো হয়েছিল। তাঁরই যোগাযোগে হরেন ঘোষ, খগেন গাঙ্গুলী, বরদা পাইন, বিভূতি হাজরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ খসমরা গ্রামে এসে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। উমাশঙ্কর ঘোষ (পিতা-নবকুমার), জীবনকৃষ্ণ ঘোষ (পিতা-হরিপদ) প্রমুখ ছিলেন স্থানীয় সংগঠক।

খসমরার অরবিন্দ ঘোষ (পিতা-পঞ্চানন) নিত্যধন মুখার্জী রোডের জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে ১৯৩০-এর জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন। এঁরা মোট ১৯ জন ছিলেন। প্রথম দিন থানা হাজতে, পরের দিন মল্লিক ফটক এবং সেইদিনই প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে গিয়ে ২২ দিন রাখে। এই সময়েই পাগলী ঘন্টা হয়। পর পর সকলেরই বিচার হয়, সকলেই সত্য কথা বলেন। ১৯৩০-এর ২রা আগস্ট দেড় বছরের কারাদণ্ড হয়। তারপর প্রেসিডেন্সী, পরে দমদম স্পেশাল জেল। সেখানে অব্যবস্থা ছিল। বন্দীদের খুবই ঠাণ্ডা লাগত। সুভাষচন্দ্র তখন বাইরে ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বন্দীরা দুখানা করে কম্বল পান। সেখানে দুর্গাপূজা হয়, সুভাষচন্দ্র বাইরে থেকে বন্দীদের কাছে লুচি মিষ্টান্নাদি পাঠান

হাওড়ার আদালতে যখন নিয়ে আসা হয় তখন পাগলী ঘন্টায় আহত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কোমরে দড়ি হাতে হাতকড়া পরা বন্দীদের দেখে অরবিন্দবাবুর জ্যাঠামশাই

উকিল সমতুল ঘোষ জজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কি ডাকাতি করে এলো?' জজ কালীপদ মিত্র কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'মিঃ সমতুল, এরা দেশ উদ্ধারের জন্য গেছে, চুরি ডাকাতি করে নয়।'—'হাতের হাতকড়ি, কোমরের দড়িটা খুলে দেন না তাহলে?' তখন ওঁদের কোমরের দড়িটা খুলে দেওয়া হলো। [৩১]

মাকড়দায় কংগ্রেস আন্দোলন দানা বাঁধে বিনোদবিহারী মুখার্জীর পুত্র জীবনকৃষ্ণ মুখার্জীকে কেন্দ্র করে। তাঁর আদি বাড়ি মাকড়দায় হলেও কলকাতায় ১৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটেও তাঁদের বাড়ি ছিল! আইন অমান্য আন্দোলনের তখন সূচনাকাল। জীবনকৃষ্ণবাবু মাকড়দার লক্ষ্মণচন্দ্র ব্যানার্জীকে সঙ্গে নিয়ে বি.পি.সি.সি অফিসে যান। সেখানে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার প্রস্তাব করায় শরৎবাবু তাতে আপত্তি জানিয়ে মাকড়দায় কংগ্রেস অফিস খোলার উপর জোর দিতে বলেন। হরেনবাবু জেলা কংগ্রেস অফিসে (নিত্যধন মুখার্জী রোডে) দেখা করতে বলেন। সেখানে দেখা করলে তিনি কিছু কাগজ দেন। মাকড়দা হাটে সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় মাকড়দা চৌধুরী পাড়ার নলিনী ব্যানার্জী আসেন। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ ব্যারিস্টারের ক্লার্ক। আসেন উকীল শৈলেন ব্যানার্জী, জ্ঞান শ্রীমানী, ললিত চৌধুরী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রায় পঞ্চাশ জনকে নিয়ে কমিটি তৈরি হয়। সদস্য ফি ধার্য হয় চার আনা। সবাই সদস্য ফি দিয়ে দেন। কাজের জন্য বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়।

কর্মীরা অফিস খোলার উদ্যোগ নেন, পুলিশের পক্ষ থেকে বাড়িওয়ালাদের ভয় দেখানো হতে থাকে। অঙ্কুরহাটির সন্নিকটে বড়পুকুরের ধারে শৈলেন ব্যানার্জীদের বাগানবাড়িতে অফিস খোলা হয়। কর্মীরা গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করতে থাকেন, শুকনো কলাপাতা পুড়িয়ে গামড়া পুড়িয়ে লবণ তৈরি হতে থাকে, চরকা কাটা তকলীকাটা চলে, জনসাধারণকে সচেতন ও আগ্রহী করার জন্য পোস্টার মারা হতে থাকে। এর সঙ্গে চলে সেবামূলক কাজ—মড়া পোড়ানো, অসুস্থদের শুশ্রূষা করা, হাসপাতালে ভর্তি করা ইত্যাদি। দল বেঁধে গান গাওয়া হতে থাকে—'ওঠরে চাষী ভারতবাসী ধর কষে লাঙল', 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ইত্যাদি। সাধারণ যুবকরাও এইসব গান পাড়ায় পাড়ায় গাইতেন। হাওড়া থেকে কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরেন ঘোষ প্রমুখ নেতারা আসতেন, গোপনে ট্রেনিং দিতেন। স্বদেশী কাজে তখন মাকড়দার বহু কর্মী আত্মহারা হয়ে মেতে উঠেছিলেন। নেতৃত্বের প্রথম সারিতে তখন বাঁড়ুজ্যে পাড়ার বড়বাড়ির কালো মুখার্জী (পূর্বোল্লিখিত জীবন মুখার্জীর দাদা), সুধীর ব্যানার্জী, সত্যেন ব্যানার্জী, শ্রীমানি পাড়ার পঞ্চানন মুখাজী, কমলাকান্ত শ্রীমানি, গোপীকান্ত

শ্রীমানি (বড়), রবীন চ্যাটার্জী, কাটলিয়ার অশ্বিনী মিত্র প্রভৃতি। পূর্বে উল্লিখিত শৈলেন ব্যানার্জী (উকীল), ললিত চৌধুরী, লক্ষ্মণ ব্যানার্জী প্রভৃতি কর্মীরাতো ছিলেনই। কিছু কিছু মুসলমান যুবকও এগিয়ে আসেন।

পুলিশের টনক নড়ে। শৈলেন ব্যানার্জীর বাবাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বড়পুকুরের পাড়ের সেই অফিস বন্ধ করে দেয়।

কর্মীরা মাকড়দা হাটে কংগ্রেসের নামে, তোলা তোলবার ব্যবস্থা করায় আর্থিক অসচ্ছলতা বেশ খানিকটা দূর হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুজির পর মাকড়চণ্ডী পুকুরের স্নান ঘাটের বিপরীতে পিচ রাস্তার উত্তর দিকে একটা কাঠের দোতলা ঘর পাওয়া যায়।

কিছুদিন পর শুরু হলো আবার পুলিশের ভয় দেখানো। ঐ অফিসও বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু অফিস খোঁজা।

অবশেষে চৌধুরীপাড়ার ললিত চৌধুরীর যোগাযোগে মাকড়দা মার্টিন রেল স্টেশনের বিপরীতে পঞ্চানন দত্তদের টিনের শেড দেওয়া পাটগুদামে অফিস বসে। এ অফিস স্থায়ী হয়। অন্নদা দত্তের পুত্ররা সহায়তা করেন। পুলিশের হুমকী পাত্তা পায় না। হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে এই অফিসের উদ্বোধন হয়। বেশ ঘটাঘাট্য করে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নলিনী ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি শৈলেন ব্যানার্জী (উকীল), সম্পাদক লক্ষ্মণ ব্যানার্জী, সহ-সম্পাদক জীবন মুখার্জী, কোষাধ্যক্ষ ললিত চৌধুরী। পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে থাকেন জিতেন ব্যানার্জী, অলক ব্যানার্জী, সুশীল চ্যাটার্জী প্রমুখেরা। কর্মীদের নিয়ে যে স্বেচ্ছাসেবক শিবির খোলা হয়েছিল তাতে এঁরা সাহায্য করেছিলেন।

ঐ অফিসে স্বেচ্ছাসেবকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

নির্দিষ্ট দিনে কাটলিয়ার মদের দোকানে ও মাকড়দার আফিঙের দোকানে পিকেটিং হয়। গ্রেপ্তার বরণ করেন লক্ষ্মণ ব্যানার্জী, গোপীকান্ত শ্রীমানি (বড়) [পিতা বিশ্বনাথ শ্রীমানি], সুধীর ব্যানার্জী, সত্যেন ব্যানার্জী, বিভূতি মুখার্জী, বলরাম দে, হরকালী মুখার্জী, রবীন চ্যাটার্জী, অশ্বিনী মিত্র (কাটলিয়া), জীবন মুখার্জী, বাসুদেব ব্যানার্জী, পঞ্চানন মুখার্জী (কাটলিয়া)।

ডোমজুড় থানায় এদের নিয়ে যায়। পরের দিন যখন ট্রেনে করে আদালতে নিয়ে যায় তখন বিপুল গণ-সম্বর্ধনা হয় মাকড়দা স্টেশনে। ট্রেন ছাড়তে বিলম্ব হয়ে যায়।

১৯৩০ সালের ১২ই জুলাই এঁদের হাওড়ায় কে. পি. মৈত্রের এজলাসে বিচার হয়। প্রত্যেকের সাজা হয়। প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রল জেলে নিয়ে যায়। সেখানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গতই উল্লেখনীয় এঁরা প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন সেই বিখ্যাত পাগলাঘন্টি বাজে। বরিশালের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা সতীন সেনকে পা ধরে টানতে

টানতে নিয়ে যায়। তার প্রতিবাদ করার জন্য মাকড়দার জীবন মুখার্জী নির্মমভাবে প্রহৃত হন, মাকড়দার বিভূতি মুখার্জীকেও এমনভাবে বেটনের আঘাত দেওয়া হয় যাতে সারা জীবনের মত তিনি বধির হয়ে যান এবং এমনভাবে কানের পর্দা ছিঁড়ে যায় যে, নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে অনায়াসে তিনি কান দিয়ে বের করে দিতে পারতেন। [৩২]

আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যাপক অংশের ছাত্র-যুবকরা জেলা কংগ্রেস অফিসে যোগাযোগ রাখতেন। দক্ষিণ ঝাপড়দার দীনেশ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, খাঁটোরার অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (অমাই) এঁরা প্রায়ই একত্রে শিবপুরে গুরুদাস দত্তের অফিসে যেতেন। ওখানে থেকে সাইক্লোস্টাইল বুলেটিন ও লিফলেট ছাপা হতো। লিফলেট-এ খবর থাকতো। তখন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। গুরুদাসবাবু খবরগুলি দিতেন, দীনেশবাবু সেগুলি সাজাতেন, অন্য দুজন এইকাজে নানাভাবে সাহায্য করতেন। দীনেশবাবুর হাতের লেখা ভাল ছিল, উনি লিখে দিতেন। লিফলেট ছাপা হয়ে গেলে বিক্রি করা হতো। ১৯৩১ সালে খুরুট রোডের মোড়ে লিফলেটগুলি ব্যাখ্যা করে বিক্রী করার সময় এই তিনজন এবং হাওড়ার আরও তিনজন গ্রেপ্তার হন। হাওড়া কোর্টে সাড়ে চারমাস করে সাজা হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও দমদমের স্পেশাল জেলে থাকেন। [৩৩]

বি.পি.সি.সি অফিসে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ডিউটি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন উত্তরঝাপড়দার পঞ্চানন গাঙ্গুলী, ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে যায় এবং তিনমাসের কারাদণ্ড হয়। [৩৪]

দক্ষিণ ঝাপড়দার শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী (ছোট খোকা) (পিতা-সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী) ১৯৩০ সালে বড়বাজারে কাপড় পট্টির ভিতর বিলাতী কাপড় বর্জন আন্দোলনের পিকেটিং-এ যুক্ত হন। পুলিশ গ্রেপ্তার করে হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজের নাম ঠিক ঠিক বলেন। ঠিকানা ভুল দেন, বাবার নাম বলেন 'জানিনা।' অজুহাত দেন যে ছেলেবেলা থেকে এর-ওর বাড়ি মানুষ হয়েছেন। এখন 'জেলে গেলেই খেতে পাব, তাই আন্দোলনে ঢুকে পড়লুম।' পুলিশ ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন কলকাতার ভবানী দত্ত লেনের কংগ্রেস অফিস পুলিশ ঘেরাও করায়। অনেকের সঙ্গে ওঁকেও জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচার হয়। সাজা হয় না। এরপর ঐ ১৯৩০ সালেই কলকাতার আর তিনজন সঙ্গীসহ হাইকোর্টে কংগ্রেস পতাকা তোলবার নির্দেশ পান। উনিই পতাকা তোলেন। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে ও হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে যায়। এর আগের বার কাপড় পটিতে পিকেটিং করে এই থানাতেই এসেছিলেন। সেই একই ও সি। সেবার নিজের নাম ঠিক দিয়েছিলেন। এবার নিজের নাম বদলালেন। বললেন, 'উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী',

ঠিকানা-'মাজু', বাবার নাম জানেন না বললেন। ও সি বললেন 'নাম পাল্টাচ্ছো কেন?' উনি বললেন, 'আমার দুটো নাম—ডাক নাম উপেন কি-না তাই।' আসল নামটা কি, পুলিশ জানতেও চাইল না, উনি বললেনও না। উপেন মুখার্জী নামেই বিচার হলো, ঐ নামেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারে তিনমাস সাজা খাটলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ডোমজুড়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইনি ছিলেন কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। তাঁর আরও দুই সহোদর শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৩০-এ হাওড়ায় পিকেটিং করে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন শচীন্দ্রনাথ। তাঁর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ হাওড়ায় পিকেটিং করেন, গ্রেপ্তারও হন কিন্তু জেলখানা ভর্তি-থাকায় থানাতেই দুশো বার ওঠবোস করতে বাধ্য করিয়ে ছেড়ে দেয়। এই পরিবারের সকল সক্ষম যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে দণ্ডভোগ করেছেন এটা যেমন ডোমজুড়ের গর্ব, তেমনই ডোমজুড়েরই এক সন্তান সর্বপ্রথম কলকাতা হাইকোর্টের শীর্ষে স্বাধীনতার প্রতীকচিহ্ন স্বরূপ কংগ্রেস পতাকাকে উড্ডীন করেছিলেন—এটাও আর এক গর্বের বিষয়। [৩৫]

উলুবেড়িয়া মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ বিস্তার লাভ করে। যে সব দৃঢ়চেতা কর্মীরা এই আন্দোলনে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — বিভূতি ঘোষ (নানু), বিভূতি ঘোষ (বাঙ্গালপুর), চণ্ডীদাস ঘোষ, পূর্ণ দত্ত, মনোমোহন রায়, তারাপদ মজুমদার, বনমালী দত্ত, মৃগাঙ্ক কাঁড়ার, কৃষ্ণদাস মণ্ডল, নিতাই মণ্ডল, অর্ধেন্দুশেখর (ইন্দু) চৌধুরী (গড়ভবানীপুর), বিভুতি আচার্য প্রভৃতি।

এই মহকুমায় এই আন্দোলন এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা পদত্যাগ করেন, কেউ কেউ আইন অমান্যে অংশ নেন এবং ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলন শুরু করেন। [৩৬]

উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্ভুক্ত কানুপাটের নির্যাতিত অক্লান্ত দেশকর্মী নিতাই মণ্ডলের স্মরণে উদয়নারায়ণপুর থেকে বেতাই বন্দর পর্যন্ত তাঁর নামে রাস্তা হয়েছে। রাস্তার নাম 'নিতাই মণ্ডল সরনী'। রাস্তাটির উদ্বোধন হয় ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী মাননীয় যতীন চক্রবর্তী মশাই। [৩৭]

'বিদেশী বর্জন, উলুবেড়িয়া কোর্টে বিক্ষোভপ্রদর্শন, আবগারী ও মদের দোকানে সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতা দিবস (২৬শে জানুয়ারী) পালন প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার অপরাধে সন্তোষ ঘোষাল, সুনীল (পেনা) ঘোষাল, বিভূতি (নানু) ঘোষ, অবনী বসু, তারাপদ (পচা) দাস, সুনীল (নেনু) মুখার্জী, সরোজ বসু, অরবিন্দ গায়েন, অমূল্য সাহা, শরৎ (নন্দ) দে, কার্তিক অধিকারী, ফনীন্দ্র, ভূজেন্দ্রও জীতেন্দ্র হাজরা ভ্রাতৃত্রয় সহ সবাই গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনের নেতা হিসাবে বিভূতিভূষণ আচার্যকে চিহ্নিত করে

সরকার তাঁর ওপর হাওড়া জেলা ত্যাগের আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অমান্য করায় শীঘ্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।' [৩৮]

হাওড়াজেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে শিবগঞ্জের লবণ সত্যাগ্রহ নানাদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেতৃত্বে যেমন ছিলেন দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা, স্বেচ্ছাসেবীরাও ছিলেন কঠোর মনোভাবাপন্ন যুবকবৃন্দ। শিবগঞ্জে যাবার আগে 'রুট' ঠিক ক'রে আসার দায়িত্ব পান হাওড়ার বিপিনবিহারী বসু (পিতা-প্রকাশচন্দ্র বসু)। তিনি সাইকেলে শিবগঞ্জ যান। সেখান থেকে বড়গাছিয়া শিবিরে যান। রুট ঠিক হয় বড়গাছিয়া মুন্সীরহাট-আমতা-নুনটিয়া-বাঁটুল-মুগকল্যাণ-শ্যামপুর-শিবগঞ্জ। [৩৯]

১৯৩০ সালের ৪ঠা এপ্রিল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ২৭ জনের প্রথম দলটি হাওড়া ময়দান থেকে পদব্রজে রওনা হল। বিপিন বসু, খগেন গাঙ্গুলী, নয়নরঞ্জন মুখার্জী, হরিনারায়ণ মুখার্জী প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মীগণ অংশ নেন। এঁরা ডোমজুড়, বড়গাছিয়া, মুন্সীরহাট, বাগনান হয়ে শ্যামপুরের শিবগঞ্জে যান। পরদিন ৫ই এপ্রিল ৩৭ জনের দ্বিতীয় দলটি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার বিজয় হাজরার নেতৃত্বে ধূলাগড়ী; পাঁচলা, উলুবেড়িয়া, বাগনান হয়ে শিবগঞ্জে যান। ঐ দলে বিভূতি হাজরা, সাধনেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়ার গান্ধী), কার্তিক দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন। তৃতীয় আইন অমান্যকারী দলটিতে ছিলেন ২৫ জন। নেতা ছিলেন কানাইলাল ঘোষ। এঁরা যান ৬ই এপ্রিল। শিবগঞ্জের লবণ আইন অমান্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন শ্যামপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক মধু বেরা। ওখানে নুন তৈরি করে ছোট ছোট প্যাকেটে করে সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবর্গ স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে নুন বিক্রি করতে যেতেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নেবার জন্যে যুবকদের উৎসাহিত করতেন। সব সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও বাধা দেয়নি। [৪০]

এইখানে সত্যাগ্রহের ব্যাপারে বিপিন বসু একটি মজার কথা শুনিয়েছিলেন। প্রথম দল নিয়ে উপস্থিত হবার পর বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের এক বৃদ্ধা তাঁর পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে এঁদের খুব যত্নের সঙ্গে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। এঁদের পৌঁছোবার কিছু পরেই পুলিশও গিয়ে হাজির। এঁরা খাবার পর যে ভিড় হয়েছিল, পুলিশ যাবার পর সে ভিড় অনেক বেড়ে গেল। সাধারণ লোক ভাবল এদের আসবার পর যখন এত পুলিশ এসেছে তখন ধরপাকড় জাতীয় দেখবার মত একটা কিছু হবে। আইন অমান্যকারীদের আহারাদির পর কিছু সময় বিশ্রাম হলো। এবার সেই বৃদ্ধার বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হবে। সবাই প্রস্তুত হয়ে নেবার পরই সত্যাগ্রহীদলের যুবনেতা লেণ্ডু বোস অপেক্ষমান সেপাইদের বললেন, 'অ্যাই, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তো?' তারা সম্মতি

জানাল। 'নাও, আমাদের বিছানাপত্র পোঁটলাপুঁটলিগুলো তুলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো।' লেণ্ডু বোসের আদেশ করার মতো কণ্ঠস্বর, নেতাসুলভ চলাফেরা এবং গাম্ভীর্য—সব কিছু মিলিয়ে তাঁর আদেশ সেপাইরা মান্য করল। জনসাধারণ এক মজা দেখতে এসে দেখলেন আর এক মজা। এরপর এলো সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনার পালা। অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহীদল পদব্রজে শিবগঞ্জে গিয়েছিলেন মুগকল্যাণের 'পল্লীভারতী' গ্রন্থাগারে তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। [৪১]

শিবগঞ্জে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেন শিবপুরের ১/১ রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেনের ফনিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি পরে শিবপুরে মদের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। শিবপুরের যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শান্তিকুমার দাশগুপ্ত শিবগঞ্জে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। [৪২] যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁরই নাম বহন করছে হাওড়া ময়দানের সন্নিকটে অবস্থিত "যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়।" যোগেশচন্দ্রের সহোদর নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন এ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এবং প্রথমে সি পি আই-এর ও পরে সি পি আই (এম)-এর দীর্ঘদিনের জেলা সম্পাদক। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হন এবং একসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও হন।

বাগনানের গোষ্ঠবিহারী পাণ্ডার পুত্র অনঙ্গমোহন পাণ্ডা শিবগঞ্জ লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেন। পরে আন্‌টিলার মদের দোকানে পিকেটিং ক'রে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। উলুবেড়িয়া থানার কুলগাছিয়া গ্রামের গোষ্ঠবিহারী বসু (পিতা-সীতারাম বসু) শিবগঞ্জে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। [৪৩] শিবগঞ্জ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের একাংশকে পরে ছেড়েও দেয়।

আমতায় বুদ্ধদেব মুখার্জীর নেতৃত্বে সমর মুখার্জী, শঙ্কর চ্যাটার্জী, বারীন্দ্রলাল মুখার্জী, দুর্গাপদ মজুমদার প্রভৃতি মাদক বর্জন আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। সকলের এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। [৪৪]

আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে জয়পুরের অনাথ মণ্ডল (পিতা-অতুলচন্দ্র মণ্ডল), সিয়াগোড়ীর কানাইলাল রায় (পিতা হরিপদ রায়), সারদার শরৎচন্দ্র ওঝা (পিতা-অতুলচন্দ্র ওঝা), খালনার হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'দেশের ডাক' নামক বই পড়ার অপরাধে আমড়দহের তাজনগরের হৃদয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পুত্র মনোরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হন ও জেল খাটেন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে আমতার

ভানুচরণ চক্রবর্তীর পুত্র নবনীকুমার চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হন। আমতার খড়দহ গ্রামের সুফলচন্দ্র মান্না (পিতা-রাখালচন্দ্র মান্না) আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত হন ও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

আমতার উদং গ্রামের শরৎচন্দ্র পট্টনায়কের পুত্র সতীশচন্দ্র পট্টনায়ক বিভিন্ন জায়গায় নিষিদ্ধ বুলেটিন ও পত্রপত্রিকা বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীঃ নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাসমেত গ্রেপ্তার হন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে আমতার সেহাগড়ীর মতিরাম সামন্তের পুত্র সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রেপ্তার হন। সতীশচন্দ্র বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা হিসাবে পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করেন। খালনার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভূধরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ঐ বছর আমতায় পিকেটিং করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হন। উলুবেড়িয়ায় বিচার হয় ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। হিজলী ও দমদম জেলে তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন।[৪৫]

আমতার বেতাই গ্রামের কিশোরী মোহন বেরা (পিতা-বাসুদেব বেরা) আইনঅমান্য আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৩২ সালে আমতা কোর্টে সভা হয়, তাতে পুলিশ লাঠি চালায়। আমতা ভবানীপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে কিছু কর্মী আশ্রয় নেন। সেখান থেকে ভবানীপুর বাজারে গাঁজার দোকানে পিকেটিং হয়। পুলিশ ধরে না। হাওড়া কদমতলায় মার্টিন স্টেশনের কাছে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ি নিয়ে যান, সেখান থেকে শিবপুর কংগ্রেস অফিসে থাকেন। কংগ্রেস অফিস থেকে বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবকদের আইন অমান্যে পাঠানো হয়। কিশোরীবাবু ও উলুবেড়িয়ার এক কর্মীকে ব্যাঁটরা থানায় পতাকা উত্তোলনে পাঠানো হয়। তখন ছদ্মনামে অন্য ঠিকানা দিয়ে কাজ হতো। ব্যাঁটরা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। হাওড়া কোর্টের বিচারে ছ মাস কারাদণ্ড হয়। আলিপুর সেণ্ট্রাল ও পরে দমদম জেলে পাঠায়। আলিপুর জেলে উলুবেড়িয়ার নানু ঘোষ, জয়পুরের মুরারী মণ্ডল, মৃগাঙ্ক কাঁড়ার প্রমুখ আন্দোলনকারীরা ছিলেন।[৪৬]

'স্মৃতিকথা 'গ্রন্থে শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন (পৃঃ৭)—

"১৯৩৩ সালে একদিন 'হাওড়ার গান্ধী' সাধনদার (সাধন মিত্র, যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি, সেখানেই কঠিন ব্যাধিতে মারা যান) নেতৃত্বে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার রূপনারায়ণ নদের তীরে 'শশাটি' হাটে হাটবারে এক আফিমের দোকানে আমরা কয়েকজন পিকেটিং করতে থাকি। ...পিকেটিংয়ের সংবাদ পেয়ে একজন পুলিশ এসে ভয় দেখায় যে স্থান ত্যাগ না করলে মার দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, সে সাবধান বাণী উপেক্ষা করলুম। মার আরম্ভ হল।... হাটের জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা ঐ পুলিশ চারজনকেই নদীতে ডুবিয়ে মারবে বলে

ঠিক করল।... আমরা পুলিশ চারজনকে ঘিরে ফেললুম ও জনতার পায়ে হাতে ধরে বোঝাতে বোঝাতে পুলিশদের বাংলোয় ঢুকিয়ে দিলুম। আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য সারকেল অফিসারকে অনুরোধ করলুম, কিন্তু তিনি রাজী হলেন না।...(পরদিন—লেখক) আবার পিকেটিং করলুম।... ওখানকার তৎকালীন এস ডি ও নেপাল সেন ...... আমাদের গ্রেপ্তার করে... পরদিন জেলের মধ্যেই বিচার করে আমাদের প্রত্যেককে ছয়মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। .....আমাদের নিয়ে আসার পর নেপাল সেন ঐ শশাটি গ্রামের অনেকের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন।"

শশাটি গ্রামে পিকেটিং-এ গ্রেপ্তার হন রামচন্দ্র হাজরা (পিতা-বিহারীলাল হাজরা -জুজারসাহা), বিজয়কুমার ব্যানার্জী (পিতা-সুশীলকুমার ব্যানার্জী—শালকিয়া)। বিজয়বাবু মাজুতে লবণ আইন অমান্য করে জেল খাটেন, শিবপুর মন্দির তলায় কংগ্রেস পতাকা উত্তোলনে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে শশাটিতে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। এই দলে নেতৃত্ব দেন গুরুদাস দত্ত। [৪৭]

শ্যামপুরে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহ হয়। শশাটি, ডিহিমঙ্গলঘট, শ্যামপুর, বেলাড়ি, আয়সা, কমলপুর, মুকুন্দপুর, গড়চুমুক—এই ৮ জায়গা থেকে থানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একই দিনে একই সময়ে সত্যাগ্রহ হয়। শ্যামপুরের মাটি থেকে ওঁরা নুন তৈরি করতেন। পোঁটলা বেঁধে ছাইয়ের মধ্যে পুঁতে দিলে রিফাইণ্ড হত। কুলটিকরি গ্রামের বনমালী জানা (পিতা হৃদয়কৃষ্ণ জানা) শ্যামপুরের বেশ নামকরা নেতা ছিলেন। ১৯৩০ সালে খাড়ুবেড়িয়া হাটে মদের দোকানে পিকেটিং করায় তাঁর ৩ মাসের জেল হয়। ১৯৩১ সালে শশাটির হাটে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে তিনি ৬ মাস জেল খাটেন। শশাটি শিবির থেকে সাধনেন্দ্র মিত্র (হাওড়ার গান্ধী) জেলে যাবার পর শশাটি শিবিরের (ছদ্মনাম দীনবন্ধু আশ্রম গান্ধী বিদ্যামন্দির) দায়িত্ব নেন মুরলীধর জানা (পিতা হৃদয়কৃষ্ণ জানা)। এই সময় আরও অনেকে জেলে যান—প্রিয়নাথ জানা (সুতাহাটা, মেদিনীপুর) শ্যামপুর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, মনোরঞ্জন বৈতালিক (শ্যামপুর স্কুলের শিক্ষক)। তখন বুলেটিন আসত, শিবিরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীকে সেগুলি বিতরণ করতে হতো। এই দলটি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসার পর মুরলীধর জানা (পিতা হৃদয়কৃষ্ণ) জেলে যান। কমলপুর হাটে শ্যামপুর থানা সম্মেলন হয়েছিল।

আয়সা ক্যাম্পের নেত্রী ছিলেন সুমিত্রারাণী সামন্ত। তাঁর বাড়িতেই ছিল শিবির। শ্যামপুর থানা সম্মেলনে তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তখন তাঁর বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত আইন অমান্য করে জেলে ছিলেন। সুমিত্রারাণী লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু থানা তাঁর ভয়ে কাঁপত। পুলিশ সম্মেলনস্থল থেকে প্রেসিডেন্টসহ ৩ জন মহিলা ও ১৫ জন যুবককে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েদের ওখান থেকে স্টীমারে করে এবং ছেলেদের

হাঁটিয়ে উলুবেড়িয়া সাব-জেলে নিয়ে যায়। উলুবেড়িয়া কোর্টে নেপাল সেনের এজলাসে বিচার হয়। বন্দীরা কেউই বণ্ড দিয়ে মুক্ত হতে চান না। সকলেরই ৬ মাস করে জেল হয়। জেলে তখন ছিলেন দামোদর বাগ (শ্যামপুরের দক্ষিণ দুর্গাপুরের অধিবাসী), গোষ্ঠ মণ্ডল (ঐ থানার নস্করপুর), সন্তোষ ডগর, বঙ্কিম জানা, বিজয় মণ্ডল, দুধকুমার মণ্ডল, শ্রীপতি পাল (সর্বসাং শশাটি), বিশ্বম্ভর বাগ (ডিঙাখোলা, শ্যামপুর), সতীশ বেরা (গুটিনাগোড়, বাউড়িয়া) প্রভৃতি। উলুবেড়িয়া সাবজেল থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আনে। সেখান থেকে হিজলীতে পাঠায়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সবাই ছাড়া পান।

১৯৩৪-এ হরিজন সেবক সঙ্ঘ গঠিত হয়। তার প্রধান কার্যালয় হয় হাওড়ার শিবপুরে। কাজ ছিল হরিজন পল্লীতে স্কুল করা। নিউ কোলড়া, গঙ্গাধরপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর (উলুবেড়িয়া), হরিনারায়ণপুর (বাগনান), খোরোড (শ্যামপুর), বেলাড়ি (শ্যামপুর) ও মাজু—মোট ৮ টি কেন্দ্র হয়। শ্রীকৃষ্ণপুরে বনমালী ঘোষ ও খোরোডে বনমালী জানা নেতা ছিলেন। [৪৮]

বাগনান থানার বাঙালপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বিভূতিভূষণ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৯২৫ খ্রীঃ নাগাদ হাওড়ার নীলমণি মল্লিক লেনে নানাবিধ সংগঠন গড়ার মধ্যদিয়ে খুব জনপ্রিয় হতে ওঠেন। ঐ লেনে যামিনী সরকারের বাড়ি ছিল তাঁর পিসীমার বাড়ি। ঐখানে 'বয়েজ ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। তুলসী সরকারের বাড়িতে তাঁরই প্রেরণায় 'সাধনা লাইব্রেরী' গড়ে ওঠে। পরে 'হাওড়া সঙ্ঘ' গড়ে তোলেন। উনি 'দাদা' নামে একটি স্বদেশী যাত্রার বই লেখেন এবং তা অভিনীত হয়। দর্শকরা তা দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। হাওড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সুগায়ক বিপিনবিহারী বসু এই যাত্রার বইয়ের গানগুলিতে সুরারোপ করেছিলেন। বিপিনবাবুর কথায়—'নীলমণি মল্লিক লেনের যা কিছু তার সবই ওই বিভূতিবাবুর শ্রমের ফল।'—আইনঅমান্য আন্দোলনের শুরুতেই বিভূতিবাবু বাগনানে স্বগ্রামে সংগঠন গড়ার জন্য চলে যান।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আইনঅমান্য আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য বাগনানের বাঙালপুর গ্রামে ৪০ জন ছাত্র নিয়ে বিভূতিবাবু স্বেচ্ছাসেবক শিবির চালু করেন। এই বিষয়ে তাঁর সহকর্মী চণ্ডীদাস ঘোষের ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভ করেন। চণ্ডীদাসবাবুর বাড়ি বাগনান থানারই মুগকল্যাণের সাহড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মতিলাল ঘোষ। তিনিও নিজগ্রামে কানাইলাল সামন্ত (পিতা-কালিপদ, গ্রাম-বাঁটুল), দিবাকর খাঁ (পিতা বসন্ত, গ্রাম-খাঞ্জাদাপুর) প্রমুখের সহায়তায় শিবির খোলেন।

বিভূতিবাবুর কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার মোটেই সুনজরে দেখতেন না। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, তাঁর দেড়বছর কারাদণ্ড হয়। আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করার অপরাধে এত বেশী দিনের দণ্ড খুব কম স্বাধীনতাসংগ্রামীই ভোগ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি আইন ব্যবসা গ্রহণ করেন ও আইন ব্যবসার মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকদের পাশে দাঁড়ান। আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সহকারীদের মধ্যে যেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন চণ্ডীদাস ঘোষ তেমনই ছিলেন মুগকল্যাণের নন্দলাল সরকার (পিতা-অতুলচন্দ্র), বাগনানের অনঙ্গমোহন পাণ্ডা (পিতা-গোষ্ঠবিহারী), খাজুরনানের সত্যচরণ গিরি (পিতা-রাখালচন্দ্র), রামচন্দ্রপুরের ধরণীধর মাইতি (পিতা-মাখনলাল), খালোড়ের বিষ্ণুপদ খাঁড়া (পিতা-নারায়ণচন্দ্র), আমতা থানার খালনা গ্রামের দুই ভাই ভূধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (পিতা-সুরেন্দ্রনাথ) ও বাগনান থানার বাইনানের রামচন্দ্র মুখার্জী, চন্দ্রপুর গ্রামের জ্ঞানোজ কুমার ঘোষ। জ্ঞানোজবাবু প্রথমে বিভূতি ঘোষের শিবিরে ছিলেন, পরে মুগকল্যাণ শিবিরে যান। আমতার জয়পুরের মুরারীমোহন মণ্ডল (পিতা-তিনকড়ি), বাগনান থানার কটাই গ্রামের বিষ্ণুপদ ধাড়া (পিতা-ফকিরচন্দ্র), সাহড়া গ্রামের ফণীন্দ্রনাথ মাজী (পিতা-রাখালচন্দ্র), কানাইপুরের বিভূতিভূষণ ব্যানার্জী (পিতা-মণিলাল), হরিনারায়ণপুরের উমাকান্ত বেরা (পিতা-কেদারনাথ), খাজুরনানের লক্ষ্মণ চন্দ্র ধাড়া (পিতা-বিহারী লাল), দিলদা গ্রামের শ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক (পিতা-পরেশচন্দ্র), জয়পুরের অনাথকুমার মণ্ডল (পিতা-অতুলচন্দ্র), মুগকল্যাণের মণিমোহন সরকার (পিতা-শরৎচন্দ্র), মুগকল্যাণের তরেন্দ্রনাথ ঘোষ (পিতা-হরকুমার) প্রমুখ আত্মত্যাগী সহকারীরা ছিলেন।

এইসকল শিবির থেকেই স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন স্থানের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিতেন। তাতে বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করে পুলিশকে গ্রেপ্তার করার কষ্ট স্বীকার করতে হতো। তাই তারা গভীর রাতে শিবিরগুলোয় হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করতো এবং মিথ্যামামলায় সাজা দেবার চেষ্টা করতো। উপরন্তু রাত্রে গ্রেপ্তারের সুবিধা ছিল—জানাজানিটা কম হতো, পুলিশের ঝক্কিটা কম হতো এবং নেতাদের হয়রানি বাড়ানো যেত।

সেইসময় কর্মীরা সাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের একটা ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রামের মেয়েরা এসে শিবিরের নানা কাজ করে দিতেন। চণ্ডীদাস ঘোষের স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে ঐ গ্রামের শরৎচন্দ্র সরকারের স্ত্রী এসে কাজ করে দিতেন, সময় থাকলে রান্নাও করে দিতেন। তাঁর নিজের ১২ বছরের ছেলে প্রফুল্লও ঐ শিবিরে ছিলেন। পিতৃহীন ছেলেকে নির্ভয়ে মা স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন।

এই শিবিরগুলির প্রায় সকল কর্মী কোনও না কোনও সময় গ্রেপ্তার বরণ করেছেন এবং জেল খেটেছেন। তখন এমন দিন উলুবেড়িয়া মহকুমায় ছিল না যেদিন কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক সভা, গাঁজা মদের দোকানে পিকেটিং, প্রভাত ফেরী, লবণ আইন অমান্য ইত্যাদি কোন না কোন আন্দোলন না হয়েছে। এই শিবিরগুলি সারা উলুবেড়িয়া মহকুমাকে আন্দোলনে উথাল-পাথাল করে দিয়েছে।

পুলিশ অতিষ্ঠ হয়ে একদিন গভীর রাত্রে ক্যাম্প ঘেরাও ক'রে সেদিন যে ক'জন সত্যাগ্রহী ছিলেন তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। উলুবেড়িয়া কোর্টে সকলের সাজা হয়। কিন্তু দণ্ডকাল শেষ হয়ে যাবার পরই আবার নতুন নতুন ছেলেদের নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নুনটিয়ার (নুন্টের) হাটে আইন অমান্য হয়। এখানে নিষিদ্ধ পুস্তক 'দেশের ডাক' পাঠ করা হয়। পুলিশ আসে এবং গ্রেপ্তার হন নওদা গ্রামের রসিকলাল দাসের পুত্র প্রবোধকুমার দাস, মুগকল্যাণের নলিনীকান্ত পালের পুত্র বিমলকৃষ্ণ পাল, গোপালপুরের মন্মথনাথ মিত্রের পুত্র হরিদাস মিত্র, বাগনানের ফকির চাঁদ আদিত্যের পুত্র বিভূতিভূষণ আদিত্য, খাজুরনান গ্রামের রাখালচন্দ্র গিরির পুত্র সত্যচরণ গিরি। সত্যচরণ গিরি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দেও মাদক বর্জন আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। মুগকল্যাণের নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুরের পরাণচন্দ্র কবিরাজের পুত্র চন্দ্রকান্ত কবিরাজ নুন্টেরহাট আন্দোলনে সম্পাদক ছিলেন, বাগাণ্ডায় সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হন। এখানে বাঁটুল গ্রামের কানাইলাল সামন্ত (পিতা-কালীপদ) গ্রেপ্তার হন।[৪৯]

মুগকল্যাণের অজয়কুমার মিত্র (পিতা-লালবিহারী) ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩১ সালে সূর্যসেনকে মুগকল্যাণে আশ্রয়দানে সহায়তা করেন। ১৯৩২ সালে বাগনান থানার উপরে অতর্কিতে জাতীয় পতাকা তোলার জন্য গ্রেপ্তার হন ও প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হন। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনে অংশ নেন ও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য বর্মায় যান। [দ্রঃ 'মুক্তিপথের সন্ধানে'—অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য, শম্ভু বোস, সুধীন মৈত্র সম্পাদিত-পৃঃ ২৭]। বাগনান থানার বেড়াবেড়িয়া গ্রামের লক্ষ্মণচন্দ্র ধাড়া ১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মুগকল্যাণ শিবিরে যোগ দেন। ১৯৩২-এ আবগারী দোকানে পিকেটিং করে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরের বছর আবার পিকেটিং করার জন্য ৬ মাসের সাজা পান। [দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৯৮]।

উলুবেড়িয়া মহকুমার বাকসীর হাটে কয়েকদফায় সত্যাগ্রহ হয়। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা কতখানি নৃশংস হতে পারে তারও একটি দৃষ্টান্ত আমরা পরে তুলে ধরছি।

১৯৩০ সালের অক্টোবরে বাকসীর হাটে প্রথম বারের আইন অমান্য আন্দোলন

হয়। রূপনারায়ণ ও দামোদর নদ এখানে এসে মিলেছে! সবদিক থেকে নৌকোয় করে সত্যাগ্রহীরা আসছেন। চারজন করে এক এক দিক থেকে পতাকা সহ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে উঠে আসছেন। পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। এক একদল আসছেন ও গ্রেপ্তার বরণ করছেন। পুলিশের সংখ্যা থেকে গ্রেপ্তারবরণকারীদের সংখ্যা বহুগুণ ছাপিয়ে যায়। বাগনান থানা বহুদূরে। হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কয়েকডজন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে চলল কয়েকজন পুলিশ। স্থানীয় মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। উলুবেড়িয়া কোর্টের বিচারে অধিকাংশেরই কারাদণ্ড হয়।

সেইসময় গ্রেপ্তার বরণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব কত প্রবল ছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে,—

বাঙালপুরে বিভূতিঘোষের শিবিরে শিক্ষা নিয়ে পরিকল্পনা মত বাকসীর হাটে দ্বিতীয়বারের আইন অমান্যে অংশ নিলেন মুরারী মোহন মণ্ডল। তাঁর পিতা তিনকড়ি মণ্ডল ছিলেন রেলকর্মচারী। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন মুরারীকে এ পথে যেতে নিষেধ করলেন। মুরারী শুনলেন না। তিনি তখন জয়পুর ফকিরদাস স্কুলের ছাত্র। আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হলেন, কারাদণ্ড হলো। দণ্ডভোগের কাল শেষ হতে ফিরে এসে আবার জয়পুর স্কুলে ভর্তি হলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষও ভাবলেন পড়াশুনায় মন দিলে ভালই হবে। একদিন উলুবেড়িয়ার এস ডি ও স্কুল পরিদর্শনে এলেন। ছেলেরা তার আগেই ঘোঁট পাকালো—ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি স্কুলে এসে নির্বিবাদে ফিরে যাবে তা হবে না। তখন ছাপানো নিষিদ্ধ বুলেটিন চারদিকে বিলি হচ্ছে, তারই এক কপি ধরিয়ে দিতে হবে এস ডি ও-র হাতে। কিন্তু কে দেবে? নির্বাচিত হলেন মুরারীমোহন। এস.ডি.ও-কে দিলেন এক কপি বুলেটিন। এর কয়েকদিন পর জয়পুর বাজারে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হেমেন্দ্রকুমার মণ্ডল ও মৃগাঙ্ক কাঁড়ার সহ মুরারীমোহন গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে দণ্ড হলো।

বাকসীর হাটে জিতেন্দ্রনাথ দত্ত (পিতা-বিপিন বিহারী) গ্রেপ্তার হন। পরবর্তীকালে বাগনানে সম্মেলন করার সময়েও তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। [৫০]

আইন অমান্য অসহযোগ আন্দোলনে আমতার জয়পুরের কর্মীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। জয়চণ্ডীতলায় বিলাতী কাপড় পোড়ানোর ও মেয়েদের বিলাতি কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গবার অনুষ্ঠান হতো। ওখানে তাঁত বসানো হয়েছিল, মেয়েরা ঘরে ঘরে তকলিতে সুতো কাটতেন, চরকা থাকতো। গ্রামে যে তাঁত বসেছিল, তাতে তাঁতীরা কাপড় উৎপাদন করতেন। মুসলিম তাঁতীরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। 'জয়পুর থেকে নিতাইদার (কানুপাটের নিতাই মণ্ডল—লেখক) নেতৃত্বে

স্বেচ্ছাসেবকরা ঝিকিরার আফিমের দোকান, আমতায় আফিমের দোকান এমন কি হাওড়া শহরেও জয়পুরের স্বেচ্ছাসেবকরা আন্দোলন করতে এসেছিলেন....।'

'এই সময়ের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন বাক্সিরহাট আফিমের দোকানে পিকেটিং থেকে শুরু হয়। বাক্সিরহাটের মালিক খাজনগাছির জমিদার নাদের আলীর লোকলস্কর এবং হাটের দারোয়ানগণ আফিং-এর দোকানে পিকেটিংরত স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অত্যাচারে পুলিশকে সহায়তা করত ও গ্রেপ্তারে সহায়তা করত। ঐ রকম অত্যাচারের সময় একটি স্বেচ্ছাসেবক বালককে ঐ দারোয়ান তেলেভাজার দোকানের গরম তেলের কড়াইতে ঠেলে ফেলে দেওয়ায় ঐ স্বেচ্ছাসেবক গুরুতর আহত হয় ও পার্শ্ববর্তী অনেকেই আহত হয়। ঐ ছেলেটিকে বাগনান হাসপাতালে পাঠান হয়। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণ ও হাটের দোকানদারগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় জনসাধারণের সহিত পুলিশ ও দারেয়ানদের খুব মারপিট হয়। বিক্রেতাদের জিনিসপত্র বেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। জনসাধারণ তখন সম্পুর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা শুরু করে। ঐ হাট বর্জন আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সমস্ত মালবোঝাই নৌকা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রূপনারায়ণের অপর পারে দুধকামরায় লঙ্গর করল। তখন বিভূতি ঘোষ (বাইনান) ও নিতাইদার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ঐ দুধকামরার মাঠেই হাট বসানো হয়—ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই ঐ মাঠেই কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়।......এখনো ঐ হাট বেশ জমজমাট ভাবে চলছে। এখানে উল্লেখযোগ্য ঐ বাক্সিরহাটে আফিং-এর দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিন জ্যাটি, মৃগাঙ্ক কাঁড়ার প্রভৃতির জেল হয়।' [৫১]

পরবর্তীকালে বিভূতিবাবু বাঙালপুর গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন এবং নিজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। আমতা থানার শারদা গ্রামের শরৎচন্দ্র ওঝা (পিতা-অতুলচন্দ্র), বাগনানের পূর্ণচন্দ্র দত্ত ও জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, কটাই গ্রামের বিষ্ণুপদ ধাড়া কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন।

গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন বাগনান থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের ধরণীধর ঘোষের পুত্র বনমালী ঘোষ। নুনটিয়া হাটে স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠানে পুলিশের লাঠিতে ৪০ জন আহত হন।

এইসব শিবিরের কর্মীরা কল্যাণপুর, ঝিখিরা, খালনা, খিলা গৌরাঙ্গচক, উদং, ফতেপুর, জয়পুর, গড়ভবানীপুর প্রভৃতি গ্রামে সত্যাগ্রহ করেন। [৫২]

বাগনানে হারানচন্দ্রপুরের আফিঙের দোকানে পিকেটিং-এ সুধাংশুমালা মুখার্জী (পিতা-রাখালচন্দ্র মুখার্জী) কানাইপুরের চন্দ্রকবি সহ মোট ৪ জন গ্রেপ্তার হন। থানার কিছুটা পশ্চিমে ছিল আফিঙের দোকান। সরিফ সাহেব ছিলেন দারোগা। উলুবেড়িয়া

কোর্টে বিচার হয়। সকলের ৬ মাস করে সাজা হয়। কয়েকদিন আলিপুর জেলে রাখে। সেখানে তখন বাঙালপুরের বিভূতি ঘোষ, বর্ধমানের বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ বন্দীদের নেতৃত্বে সরকার সেলামের বিরোধিতা করায় লাঠিচার্জ হয়। বিভূতি ঘোষের পিঠ লাঠির আঘাতে ফেটে যায়। ওখান থেকে বন্দীদের দমদমের নতুন তৈরি ছিটে-বেড়ার জেলে নিয়ে যায়। কাঁচা মেঝে, কাঁচা দেওয়াল। ঐ অস্বাস্থ্যকর জেলখানায় অনেককেই বিছের কামড় খেতে হয়। হাওড়া ও বর্ধমানের কিছু বন্দীকে ঐ জেলখানায় তখন নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল। [৫৩]

হাওড়া জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হলো শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, আমতা, বাগনান প্রভৃতি থানাগুলির এলাকাধীন বহু ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পদত্যাগ করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। খাড়ুবেড়িয়া, বাগাণ্ডা, শশাটি, বেলাড়ি প্রভৃতি ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্টরা পদত্যাগ করে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ঐ সব এলাকার প্রায় ৫০ টি গ্রামে সরকারী খাজনা দেওয়া বন্ধ হয়। মাজুতে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন। [৫৪]

সূত্র :

(১) হাওড়াজেলা ও শরৎচন্দ্র-সম্পাদনা : নির্মলকুমার খাঁ : প্রবন্ধ—শরৎচন্দ্র ও বাজেশিবপুর—প্রদ্যোত সেনগুপ্ত (পৃঃ ৫৯)।

(২) ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অধ্যাপক ডঃ কানাই ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(২ক) মৌড়ীর ডাঃ ইন্দুভূষণ দাস কথিত।

(২খ) হাওড়ার বিপিনবিহারী বসু কথিত।

(২গ) বলুহাটির উপেন্দ্রনাথ ঘোষ কথিত।

(৩) হাওড়া জেলার ইতিহাস—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২১৭-২১৮), বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—অমিয় ঘোষ।

(৪) হাওড়ার কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (২৮/৫/৮৫) ও অমিয় ঘোষ লিখিত 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' প্রবন্ধ।

(৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত (পৃঃ ৭৮) ও অন্যান্য সূত্র।

(৬) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—অমিয় ঘোষ।

(৭) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা : প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (পৃঃ ৪৪, ৫৭, ১১১, ৮৩, ৮৬, ৭০, ৭১) ও অন্যান্য সূত্র।

(৮) (১০) শতাব্দীর পরিক্রমায় বালিগ্রামের ইতিকথা—শীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৬)

(৮ক) (৯) স্মৃতিকথা-শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৬) ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(১১) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ৪১, ৭৬, ৮৪)

(১২) শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৮৩, ৮৪)

(১৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ৯১, ৮৬) ও অন্যান্য সূত্র।

(১৪) লোকমুখ (১ম বর্ষ, ২য় সংকলন) থেকে গৃহীত।

(১৫) পাঁচশো বছরের হাওড়া—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১২০)

(১৬) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ৫৯-৬০) ও অন্যান্য সূত্র।

(১৭) কিশোরীমোহন খাঁড়া (কেশবপুর) প্রদত্ত তথ্য।

(১৮) জুজারসাহার লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের দেওয়া তথ্য।

(১৯) দেউলপুরের রাধাবল্লভ মাজী কথিত।

(২০) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ৪৫, ৭২, ৮১, ৬১, ১১২, ৫৮, ৪৯, ৫৯, ৬০, ৬১)

(২১) ঐ (পৃঃ ৮০, ৩৪, ৪৮, ৩৭, ৭১)

(২২) মৌড়ীর গোপাল চক্রবর্তী ও ডাঃ ইন্দুভূষণ দাস কথিত।

(২৩) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ৩৬, ৯৬, ১০১-১০২)

(২৪) বলুহাটির স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ দে, সুবোধ মুখার্জী ও নির্মল দাস কথিত।

(২৫) পাতিহালের অজিতকুমার মজুমদার কথিত।

(২৬, ২৮) উত্তর ঝাপড়দার কিশোরী (বক্রেশ্বর) সাধুখাঁ ও পার্বতীপুরের উমাপ্রসাদ (বলাই) চট্টোপাধ্যায় কথিত।

(২৭) দক্ষিণ ঝাপড়দার হীরেন্দ্রনাথ রায় কথিত।

(২৯) দক্ষিণ ঝাপড়দার রাধারমণ দত্তের কাছে শোনা।

(৩০) দক্ষিণ ঝাপড়দার রাজকুমার দে কথিত।

(৩১) খসমরার অরবিন্দ ঘোষ কথিত।

(৩২) মাকড়দহের লক্ষ্মণ ব্যানার্জী, রবীন চ্যাটার্জী, বিভূতি মুখার্জী ও কাটলিয়ার অশ্বিনী মিত্রের বক্তব্য অনুযায়ী লিখিত।

(৩৩) দক্ষিণ ঝাপড়দহের ইন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য কথিত।

(৩৪) উত্তর ঝাপড়দহের পঞ্চানন গাঙ্গুলীর নিকট শ্রুত।

(৩৫) দক্ষিণ ঝাপড়দার শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী, শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী ও সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী কথিত।

(৩৬) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (প্রবন্ধ)—অমিয় ঘোষ

(৩৭) স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কথিত।

(৩৮) হাওড়া জেলার ইতিহাস— হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২১৮)।

(৩৯) বিপিনবিহারী বসু কথিত।

(৪০) অমিয় ঘোষ রচিত প্রবন্ধ—'হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়'।

(৪১) হাওড়া জেলার ইতিহাস—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ২১৭)

(৪২) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত (পৃঃ ৬৭, ৭৩)

(৪৩) ঐ (পৃঃ ৪০, ৫৮)

(৪৪) অমিয় ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ ঃ 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়'।

(৪৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত (পৃঃ ৭৫, ৭১, ৩৯, ১১০, ৪৫, ৫২, ৬৩, ২৪, ৮৮, ৪২)

(৪৬) আমতার কিশোরী মোহন মাজী (বেরা) কথিত।

(৪৭) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (পৃঃ ৭৮, ৮০)

(৪৮) শ্যামপুর থানার কুলটিকরী গ্রামের মুরলীধর জানা (পিতা-হৃদয়কৃষ্ণ জানা)-র দেওয়া তথ্য।

(৪৯) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ' ও অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্যাদি সংগৃহীত।

(৫০) ঐ (পৃঃ ৫৫, ৬৬)

(৫১) হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগ্রাম ও সংগঠন ও নিতাই মণ্ডল-এর জীবনী ও সংগ্রাম কাহিনী—অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ফরওয়ার্ড ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩)।

(৫২) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত সম্পাদিত—'স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ' ও অমিয় ঘোষ রচিত প্রবন্ধ 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়'।

(৫৩) বাগনানের সুধাংশুমালা মুখার্জী কথিত।

(৫৪) 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' (প্রবন্ধ)—অমিয় ঘোষ।

—— o ——

সুভাষ-নেতৃত্বে হাওড়া

সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক গুরুপদে বরণ করবার পূর্বেই হাওড়া শহরের বাসিন্দা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক গুরুপদে বরণ করে নিয়েছেন। ১৯২১ সালে শরৎচন্দ্রকে দেশবন্ধু হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি করে দেন।[১] সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র উভয়ে সতীর্থ হবার জন্য দুজনেরই মনের মিল ছিল অসামান্য। বিদ্বান, বুদ্ধিমান সর্বোপরি কর্মী সুভাষকে পেয়ে এবং বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সর্বোপরি পরামর্শদাতা শরৎচন্দ্রকে পেয়ে দেশবন্ধু যেন নববলে বলীয়ান হয়ে উঠলেন। একদিকে কংগ্রেসের অনুদার নেতৃত্বের, অন্যদিকে অত্যাচারী; দলন-নীতি পরায়ণ ব্রিটিশ সরকারের—এই উভয় পক্ষ থেকেই দেশবন্ধুর উপরে ঝটিকা বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের আমেদাবাদ কংগ্রেসে, ১৯২২-এর এপ্রিলের চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু উপস্থিত থাকতে পারলেন না জেলে থাকার কারণে। ১৯২২-এর ৯ই আগস্ট কারামুক্ত হলেন, ঐ বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে কংগ্রেসের কাউন্সিল প্রবেশনীতি নিয়ে তুমুল মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তাঁর সমর্থকদের নিয়ে স্বরাজ্য দল গঠন করলেন।[২] তারিখ ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী।[৩] এই সময়ে দেশবন্ধুর ডান হাত ও বাঁ হাত ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র।[৪]

স্বরাজ্যদল গঠন করার পর একদিকে বিরুদ্ধ দলের আক্রমণ অন্যদিকে আর্থিক দৈন্যে নেতৃত্ব জেরবার হয়ে গেলেন। এই সময়ের অবস্থার বর্ণনা পাই রবিদাস সাহারায়ের 'আমাদের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে ঃ 'বিরুদ্ধদল গালিগালাজ না করে কোন কথা বলে না। দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা। শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'অর্থসংগ্রহের জন্য বড়লোকদের কাছে কাছে ধরনা না দিয়ে উপায় থাকতো না। একাজে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গী হতেন।' বৃষ্টির মধ্যেই 'দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে শিয়ালদহ অঞ্চলে এক বড়লোকের বাড়িতে অর্থসংগ্রহের জন্য গেলেন।' (পৃঃ ৯৮-৯৯)

দেশবন্ধুর কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের ঐকান্তিক সখ্যতায় হাওড়াতেও 'স্বরাজ্য দল'-এর শাখা গড়ে ওঠে এবং তারও সভাপতি হন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। একথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। "স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বরাজ্যদল সিন্ধু ও বঙ্গদেশ ছাড়া তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। হাওড়া জেলায় 'স্বরাজ্য দলে'র প্রভাবই সর্বাধিক ছিল।" ১৯২৪-এ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বেই কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচনে

নামে। হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে সভা করতে আসতে হয়।[৫] দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের নিবিড়তা এমন স্তরে পৌঁছায় যে দেশবন্ধুর গৃহদেবতা গোবিন্দজীর সেবা পূজার জন্য বিগ্রহটিকে তিনি শরৎচন্দ্রের হাতেই তুলে দেন।[৬] দেশবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিনী বাসন্তী দেবী তখন উভয়েই রাজনৈতিক কার্যকলাপে গভীরভাবে লিপ্ত। উভয়েই যদি একত্রে কারান্তরালে চলে যান, তখন গোবিন্দদেবের নিত্যপূজার কি হবে? সেই আশঙ্কার বশেই গোবিন্দ দেব বিগ্রহটিকে শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

চৌরীচৌরা ঘটনার পর বারদৌলিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠক ডেকে গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত করলেন। ইতিহাসে এ ঘটনা 'বারদৌলি হল্ট' নামে চিহ্নিত হলো। ক্ষুব্ধ হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি শরৎচন্দ্র এ ঘটনাকে 'কণ্ঠরোধ' আখ্যা দিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নন-ভায়োলেন্সের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্য শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারালেন না। সুভাষচন্দ্রও তাই। 'কংগ্রেস রাজনীতিতে হিংসা-অহিংসা বা বামদক্ষিণ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশ্নে শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষবাদী।[৬ক]

১৯২৩ সালের ২৩শে আগস্ট হাওড়া টাউন হলে ১৭শ গান্ধী পুণ্যাহ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সুভাষচন্দ্র 'তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, শ্রমিকদের সংগঠিত করবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেইদিক থেকে হাওড়া সবচেয়ে ভাল এলাকা। কেন না এইস্থানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দিন মজুর যাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না করে তুললে দেশের পরিত্রাণ ঘটবে না। কেননা এই অঞ্চলের শ্রমিকরা দুই বৎসর আগে গুলিচালনা অগ্রাহ্য করে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করেছিল।' সুভাষচন্দ্র তাঁদের জাতীয় আদর্শে যথাসম্ভব ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। [৬খ]

অনুরূপভাবেই তিনি ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা যুব সম্মেলনের অভিভাষণে বলেন যে, বিশ্বের সব মানবীয় সৃষ্টির পিছনেই আছে শক্তিমত্ত যৌবন। গণশক্তিই হলো মূলশক্তি—দেশকে বড় করতে গেলে এদের সঠিক পথে চালাতে হবে। আর একজন্য চাই সর্বত্যাগী কর্মীদল যাদের জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য হবে স্বদেশ সেবা।[৬গ]

বঙ্গদেশের মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ঘটে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির সুবাদে। কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার হিসাবে কায়েমি স্বার্থবাদীদের অপরিসীম লোভের চিরস্থায়ী শিকার যে বস্তীবাসীরা তা-ও তাঁর গোচরীভূত হয়।[৬ঘ] এরই ফলে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতি তাঁর সাধারণ সহানুভূতি জাগ্রত হয় এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই তাঁদের এই দীনহীন অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

হাওড়ায় তরুণদের ব্যাপকভাবে স্বদেশীকার্যে অংশগ্রহণে কংগ্রেস এখানে

একসময় খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ হলো বামপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ এবং সুভাষ-নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে হাওড়ার হরেন্দ্রনাথ ঘোষের জেলা কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ। সুভাষচন্দ্র যেমন 'অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও যোগ্যতার সঙ্গে' 'নিখিলবঙ্গ যুবক সমিতি গঠন' করে 'অল্পকালের মধ্যেই বাংলার সকল জেলাতে এর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত' করে ছিলেন,[৭] হরেন্দ্রনাথও বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথের হাতে গড়া পুরোপুরি স্বদেশী আন্দোলনের ক্লাব 'হাওড়া সেবা সঙঘ'-এর পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন এবং 'তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেস নেতা অজিত মল্লিক, হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ধীরেন সেন, সন্তোষ ঘোষাল ও গৌরমোহন রায় প্রমুখের সহযোগিতায়' সঙেঘর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করলেন।'সামরিক কায়দায় বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি হাওড়া ভলান্টিয়ার্স নামে একটি অসামরিক ব্যাণ্ড পার্টিও তৈরি করেছিলেন।'[৮]

হাওড়া সেবা সঙঘ সম্পর্কে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার, ১৯৭২-এর পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃঃ ৫৬৩-তে লেখা হয়,-

'Established in 1923, the Howrah Seva Sangha since its inception was associated with all national movements for attainment of the country's freedom. Its office and library are situated at 33/1 Narasingha Dutta Road and Gymnasium and playground at 74, Kalachand Nandy Lane, Howrah. Affilated to various statewide organisations, it promotes physical culture, sports and games, cultural programmes and community worships......"

স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া সেবা সঙ্ঘের অবদানের কথা এখানে স্বীকৃত। হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যুবসংগঠন গুলির বিশেষ ভূমিকা রয়ে গেছে।

হাওড়া সংঘ—সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিবাদকে কেন্দ্র করে একদল যুবক সেনগুপ্ত পন্থী হয়ে যান, তাঁরাই মূলতঃ এই সংঘ স্থাপন করেন, কিন্তু পরে এঁরাও সুভাষচন্দ্রকেই অনুসরণ করতে থাকেন।

শিবপুর তরুণ সমিতি—সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরাই এটি গড়ে তোলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) এখানে যাতায়াত করতেন। তিনি সুভাষ ও সেনগুপ্ত কারোর দলেই ছিলেন না। তিনি যুবকদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণের উপর জোর দিতেন। তরুণ সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে শিবপুরের রামমোহন মুখার্জী লেনের অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইনি পরে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন ও হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা নেন। অরুণ বাবু এই জেলায় কৃষক সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধকালে অরুণবাবুর উপর পুলিশী নির্যাতন নেমে আসে। ইতোমধ্যে শিবপুরের তরুণ সমিতি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত সংগঠনে পরিণত হয়।

হাওড়া সেবা সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাওড়ার কুঞ্জবিহারী দত্তের পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্ত। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তিনি হরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন। হাওড়া শহর এবং সন্নিহিত গ্রামগুলির প্রায় সব যুব সংগঠনগুলির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। তিনি প্রধানত ছিলেন যুবআন্দোলনের সংগঠক এবং হাওড়া ভলান্টিয়ার দলের নায়ক।[৯]

এলো ১৯২৮ সাল। পার্কসার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন। জি ও সি সুভাষচন্দ্র। হাওড়ার হাজার হাজার যুবক শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সেদিন হাওড়া জেলার এই বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী সাজাবার দায়িত্ব পান উনসানির নারায়ণ দাস দে।[১০]

সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে এবং হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে তখন হাওড়ার দানু বসু, বৃন্দাবন বসু, সুনীল দাস, হেমন্ত কুমার দে, ঘন্টু বাবু, ডাঃ আলী ইমাম, উলুবেড়িয়ার বিভূতি (নানু) ঘোষ প্রমুখ তরুণ কর্মীরা যুব সংগঠন গড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। উলুবেড়িয়ার বিভূতি (নানু) ঘোষ তখন জেলার সর্বত্র যুব সংগঠন শক্তিশালী করায় মনোনিবেশ করেন। লাঠিখেলা, ছোরা খেলা শিক্ষার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠনও গড়ে ওঠে। জমিদারী অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা আন্দোলন করতে শুরু করেন। এই সময় বিশেষ করে উলুবেড়িয়া মহকুমায় কৃষক সংগঠন জোরদার হয়ে ওঠে। ঐ মহকুমায় 'কুৎখামার' প্রথা নামে এক জঘন্য প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের শোষণ করা হতো। সুভাষ চন্দ্রের অনুগামী আমতা থানার থলিয়া গ্রামের তারাপদ মজুমদার (পিতা-নগেন্দ্রনাথ মজুমদার)-এর নেতৃত্বে কৃষকরা আন্দোলনে নেমে পড়েন। তিনি কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। অন্য যাঁরা এই আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন তাঁরা হলেন বিভূতি ঘোষ (নানু), মনোমোহন রায়, সত্যচরণ দাস (মেদিনীপুর) প্রভৃতি।[১১]

হাওড়া জেলার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংগঠনে এবং তাঁর অনুগামীদের পরিচালনায় সুভাষচন্দ্রের ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা ছিল। লিলুয়ায় রেলশ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিচালনায় (২৮শে মার্চ ১৯২৮) সুভাষচন্দ্রের হস্তক্ষেপেই তদানীন্তন জেলা শাসক গুরুদাস দত্ত বামুনগাছি লোকোশেডের ডি.সি. এম. ই মিঃ গোল্ডকে গ্রেপ্তার করেন। একথার উল্লেখ আগেই করেছি।

১৯২৮ সালের ২১শে এপ্রিল লিলুয়ার ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র বিবৃতিতে বলেন, "দুঃস্থ শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় শক্তির সমর্থনপুষ্ট মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই-এ যথাসাধ্য করতে জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন জানাচ্ছি।"[১২]

১৯২৮-এর ২৭শে নভেম্বর বাউড়িয়া চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে বিবৃতিতে বলেন, "চটকলের শ্রমিকরা ৪ মাস ধরে ধর্মঘট করছেন। তাঁরা অটল, ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়সংকল্প। ধর্মঘটীদের এক বিশাল সভায় আমার বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি দেখেছিলাম তাঁদের মানসিকতা নির্ভীক। দীর্ঘস্থায়ী এই সংগ্রামে তাঁরা যে তেজস্বিতা এবং সাহস প্রদর্শন করেছেন আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা বাইরে থেকে কার্যত কোন সাহায্য পাননি, কিন্তু তবু তাঁরা বীরের মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।"[১৩]

এই সময় বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু রাজগঞ্জে ও সাঁকরাইলে যেতেন শ্রমিকদের মধ্যে সভা করতে।'[১৩ক]

১৯২৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী লিলুয়া ময়দানে এক শ্রমিক সমাবেশের ভাষণে তিনি শ্রমিকদের সুসংগঠিত হয়ে আন্দোলন করার উপর গুরুত্ব দেন।[১৪]

১৯২৯ সালের ১৬ই আগস্ট লিলুয়া ময়দানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল ইউনিয়নের উদ্যোগে যে শ্রমিক সমাবেশ হয় তাতে তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের পার্থক্য নেই। উভয় আন্দোলনই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে সারা বিশ্বের কাছে জানাতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রথম কর্তব্য হলো ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করা, স্থায়ী ভিত্তির উপর তাকে গড়ে তোলা এবং ঘন ঘন ধর্মঘটের ডাক না দিয়ে শিল্পবিরোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া।[১৫]

১৯৩৬-এ সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ থেকে বোম্বাইতে ফিরে এলেন ও গ্রেপ্তার হলেন। তখন সারা বাংলা ব্যাপী বিরাট আন্দোলন হয়। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট হয়। হাওড়ায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু ভট্টাচার্য প্রভৃতির নেতৃত্বে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে হাওড়া টাউন হলে জেলা কংগ্রেস সম্মেলন হয়। প্রধান অতিথি হন শরৎচন্দ্র বসু।

১৯৩৮-এ কংগ্রেসে বিভেদ আসে। সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান হাওড়ার হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক দত্ত, সুহৃদ বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবর্গ।[১৬]

সুভাষচন্দ্রেরই নির্দেশে হাওড়া জেলায় কৃষক-শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকের সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল সুপ্রকাশ রায় রচিত 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থের ৫৭৭-৫৭৮ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ-

"সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার পর সুভাষচন্দ্র তাঁহার সমর্থক কংগ্রেস-সভ্যদের এবং কংগ্রেসের চরমপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে

'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন হইতে কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিবার আবেদন জানানো হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' ও অন্যান্য বামপন্থীরা একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা এবং খণ্ড খণ্ড ও ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বামপন্থী ঐক্য কমিটি' (Left Consolidation Committee) গঠন করেন।....'ফরওয়ার্ড ব্লক' ও অন্যান্য বামপন্থীদের সংগ্রামের আহ্বানে শঙ্কিত হইয়া কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করেন। এই সকল প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে আরও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তন করা হয়, কংগ্রেস মন্ত্রীদের সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির অধিকার বিশেষভাবে খর্ব করা হয় এবং কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের সম্মতি ব্যতীত কংগ্রেস কর্মীদের শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি সংগ্রামে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের দৈনন্দিন সংগ্রাম বন্ধ করাই ছিল এই সকল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।"

এই শেষোক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১৯৩৯ সালের ৯ই জুলাই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শাস্তি স্বরূপ তাঁকে তিন বৎসরের জন্য বাংলাদেশের কংগ্রেস সভাপতির পদ ও কংগ্রেসের কোন কর্মকর্তার পদের অনুপযুক্ত বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়।

হাওড়া জেলার যুব-সমাজ এই সংকটকালে সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম-বিমুখ উচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতা করে চলে। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন—'হাওড়া আমার দুর্গ।'

আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গড়ে তোলেন ২২শে জুন ১৯৩৯। তার আগে তিনি তাঁর নূতন দল গঠনের উদ্দেশ্য বিবৃত করে সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখতে থাকেন। ১৯৩৯ সালের ৮ই মে হাওড়া বেলিলিয়স পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি তাঁর সংগ্রামী কর্মসূচীর মাধ্যমে শীঘ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে তুলে ধরেন। তিনি 'আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন' এই ধ্বনি নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আহবান জানান। কংগ্রেসের সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তিকে মিলিত হবার ডাক দেন।[১৭]

১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে আপোষ বিরোধী পাল্টা সম্মেলন হয়। সেখানে "হাওড়ার স্বেচ্ছাসেবকগণ ও 'হাওড়া সঙ্ঘ', 'সেবা সঙ্ঘ' প্রভৃতির মিলিত ব্যাণ্ডপার্টির সামরিক শৃঙ্খলাবোধ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।"[১৭ক] রামগড় কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করার জন্য হরেন ঘোষের নেতৃত্বে হাওড়া থেকেই মূল স্বেচ্ছাসেবী

বাহিনী ওখানে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গতই সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও বাইরের প্রগতিশীল ও বিপ্লবীশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন ভারতবর্ষে তথা বাংলায় (এবং হাওড়াতে) কমিউনিস্ট দলের অথবা মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের অভ্যুদয় ঘটছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কোন ভালধারণা পোষণ করেন নি, বরং কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম-কে অনেকখানি এক করেই দেখিয়েছিলেন এবং এই উভয় মতবাদের একটা মিলন (Synthesis) চেয়েছিলেন যা ইতিহাসগতভাবে হবার নয়। ১৯৩৮ সালের গোড়ায় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা রজনীপাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষ্যৎকারে তিনি কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর মতপরিবর্তনের কথা জানান এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চায় পরিণত করে একাধারে স্বাধীনতা অর্জন ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।*

সুভাষচন্দ্র কোন সময়েই কমিউনিজমের আদর্শ অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবুও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন কি আমরা দেখিনা তাঁর মহানিষ্ক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট ব্যবহারজীবী স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণে, কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জাবের কৃষক সংগঠন 'কীর্তি কিষাণ পার্টি'-র কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় মহানিষ্ক্রমণের কালে ভারত-সীমান্তে গমনে এবং দেশত্যাগের পর ভারতের বা আন্তর্জাতিক স্তরের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য না করার মধ্য দিয়ে? এদেশের

---

* রজনীপাম দত্তের সঙ্গে সুভাযচন্দ্রের আলোচনায় সুভাষচন্দ্র যে মত ব্যক্ত করেন 'সুভাষচন্দ্র বসুর অর্থনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার উদ্ধৃত তা করেছেন। তারই প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি,—

'My political ideas have developed further since I wrote my boook three years ago...........

I should point out also that communism as it appeared to be demonstrated by many of those who were supposed to stand for it in India seemed to me anti-national, and this impression was further strengthened in view of the hostile attitude which several among them exhibited towards the Indian National Congress It is clear, however, that the position to-day has fundamentally altered

I should add that I have always understood and am quite satisfied that communism, as it has been expressed in the writings of Marx and Lenin and in the official statements of policy of the Communist International, gives full support to the struggle for national independence and recognizes this as an integral part of the world out-look

My personal view to-day is that the Indian National Congress should be organized on the broadest anti-imperialist front, should have the two-fold objective of winning political freedom and the establishment of a socialist regime.'[১৮]

কমিউনিস্ট পার্টিও দেরীতে হলেও নেতাজী সম্বন্ধে তাঁদের অতীতের ভ্রান্ত মূল্যায়নের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর মহান অবদানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। সুবিখ্যাত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'Bow of Burniing Gold' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অবশ্য এ সবই ভিন্ন ক্ষেত্রে সবিস্তার আলোচনার দাবি রাখে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম মাত্র।

১৯৪০ এর ২৮ বা ২৯শে জুন রামরাজাতলায় প্রায় দশহাজার মানুষের সভা হয়। প্রধানবক্তা সুভাষচন্দ্র, আসার কথা পাঁচটায়। উনি এসে পৌঁছান রাত ৯ টায়। ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায় মানুষ সভাস্থল ত্যাগ করেন না।

১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা তাতে যোগ দেন। হাওড়া জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি হন হরেন ঘোষ, সম্পাদক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। সন্তোষ ঘোষাল, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, ধীরেন সেন প্রভৃতি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। কংগ্রেসে থেকে যান অরুণ ব্যানার্জী, কার্তিক দত্ত, বঙ্কিম কর, বিজন চক্রবর্তী, ডাঃ বেণী দত্ত প্রভৃতি।[২০]

সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকেরও প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে হাওড়া। এখানে সভা-সমিতি হলেই তাঁকে আহবান করা হতো এবং তিনি আসতেন। "এমনকি দেশত্যাগের আগে শেষ জনসভা করে গিয়েছেন তিনি, হাওড়া শহরেরই শালকিয়া নামক অঞ্চলে।"[২১]

শিক্ষক সুজন সরকার, সুহৃদ বিশ্বাস ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। প্রথমে সুভাষপন্থী কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে অফিস সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনা ও প্রচার বিভাগকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব নেন ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[২২] (মণীন্দ্র বাবু পরবর্তীকালে এম. এল. সি. হয়েছিলেন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। অসিতবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের সুবিখ্যাত গবেষক গ্রন্থ-প্রণেতা হন। সম্প্রতিকালে তিনি 'হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পথে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর বাধা বৈদেশিক প্রভুত্বের জোয়াল এবং তাকে কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে না পারলে যে দেশবাসীর কোন উন্নতিই সম্ভব নয় একথা তিনি অন্যান্য সভার মত ধূপচাঁচীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনেও শ্রোতাদের স্মরণ করান। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে ক্ষীরেরতলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার বাণীকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আহ্বান জানান। ঐ বছরের ২৭শে ডিসেম্বর হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে অনুষ্ঠিত

জনসভায় স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীর গভীর দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের নারীরা এবং অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরা যোগদান করে যে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তার উল্লেখ করেন। [২৩]

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুভাষচন্দ্র কেমন মানুষ ছিলেন সে দিকটা একটু দেখা যাক—"তিনি চিরকাল সকলের কাছে সুভাষবাবু, কোনদিন কারো 'সুভাষদা' হন নি। সকলের সঙ্গে তিনি অমায়িকভাবে মিশে কাজ করেছেন, বিন্দুমাত্র অহঙ্কার, দম্ভ বা আভিজাত্যের ভাবও তাঁর ছিলনা, অথচ কর্মীদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গতা স্নেহবন্ধন, ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন নি। একান্ত নিকটে থেকেও তিনি যেন বহুদূরে থাকতেন।" অথচ, 'সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ে সহকর্মীদের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা ছিল'। তাঁর অন্তরঙ্গদের তালিকায় হাওড়ার হরেন ঘোষ অন্যতম ছিলেন।[২৪] একবার জেলের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অবমাননাকর ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করেন। জেল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তার জন্য তাঁর ৭ দিনের কারাবাস হয়।[২৫]

সুভাষচন্দ্রের দরদী মনের কিছু পরিচয় উপস্থিত করছি ঃ

১৯২৪-এর ২৪শে আগস্ট সন্ধ্যায় পার্বতীপুরের বসন্ত ঢেঁকি মির্জাপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হলেন। পরদিন খবরের কাগজে সংবাদ শুনে বিপ্লবী কর্মীরা থ। তাঁরা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে বসন্তবাবুকে এমন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগেই রেখেছি। বসন্তবাবুর এই গ্রেপ্তারে চিন্তান্বিত কর্মীরা কি করা যাবে আলোচনা করলেন। স্থির হলো দক্ষিণ ঝাপড়দার ধীরেন মুখার্জী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে যা করার করবেন। ধীরেনবাবু সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। সুভাষবাবু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্র সুনন্দ সেনকে ঠিক করে দিলেন। সুভাষচন্দ্র ডোমজুড়েও এসেছিলেন। সে বিবরণ উত্তর ঝাপড়দার নিরাপদ গাঙ্গুলী (পিতা-মন্মথনাথ গাঙ্গুলী)-র কাছ থেকে পাই। নিরাপদ বাবু জীবনে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন। এমন কি, একবার তিনি বি পি সি সি-র প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। তখন বৌবাজার স্ট্রীটে ছিল কংগ্রেস অফিস। প্রতিদিন বিকালে 'বুলেটিন' বেরোত। আর যিনিই বি পি সি সি-র প্রেসিডেন্ট হতেন, তাঁর নাম বুলেটিনে ছাপা হতো এবং পুলিশ সেই অনুযায়ী গ্রেপ্তার করতো। নিরাপদবাবুর নামও ছাপা হলো। তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তখন তিনি বালকমাত্র। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট রকস্‌বার্গের আদালতে বিচার। রকস্‌বার্গ টেনে টেনে বাংলায় বললেন, 'ভারতবর্ষের ছেলেরা বাপের নাম ঠিক বলে না।' সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ বাবু জুতো তুলে দেখালেন। প্রথম শ্রেণীর বন্দী করে আড়াই বছর কারাবাসের হুকুম হলো। অল্প বয়স থাকায় পুরো মেয়াদ জেলে

থাকতে হয় নি। আলিপুর জেলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি থাকতেন এবং তাঁর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর ঠিকানা জানতে চান। 'উত্তর ঝাপড়দা' বলতেই সুভাষচন্দ্র হেসে বলেন, 'আমি ওখানে গেছি।' কিন্তু কোথায় গেছেন, কেন গেছেন জানান না। দিন কয়েক পরে সুভাষচন্দ্র নিজেই 'জেলেপাড়া'-য় গেছেন জানালেন। কিন্তু এবারও কারণ জানালেন না।

একবার নিরাপদ বাবু ও উত্তর ঝাপড়দার গঙ্গাধর ঘোষ বড়বাজারে কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়েন। পুলিশ ওঁদের কোর্টে না পাঠিয়ে সুন্দরবনে গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। ১৩/১৪ দিন হেঁটে হেঁটে পথে ভিক্ষা করতে করতে হাটে বাজারে রাত কাটিয়ে কলকাতায় ওঁরা কংগ্রেস অফিসে আসেন। সুভাষচন্দ্র তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওঁদের ঐ রকম কষ্ট করে ফিরে আসার কথা শুনে বললেন, "তোমরা ট্যাক্সি করে আসোনি কেন?"[২৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১) আমাদের শরৎচন্দ্র-রবিদাস সাহারায় (পৃঃ ১০৯, ৯৭)।
২) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র-অপর্ণা দেবী, পশ্চিমবঙ্গ নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ৫৮-৫৯)।
৩) আমাদের শরৎচন্দ্র-রবিদাস সাহারায় (পৃঃ ৯৮)।
৪, ৬) শরৎ স্মৃতি-ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত (পৃঃ ৮০,১১৭)।
৫) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৪)।
৬ ক) শরৎচন্দ্র ও বাজে শিবপুর-ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, হাওড়া জেলাও শরৎচন্দ্র সম্পাদনা ঃ নির্মল কুমার খাঁ (পৃঃ ৪৪-৪৬)।
৬ খ) সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন ও রচনা সম্ভার ঃ তথ্যপঞ্জী—অসিতাভ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ২৫১)।
৬ গ) ঐ (পৃঃ ২৪৬)।
৬ ঘ) বঙ্গদেশের রাজনীতি ও সুভাষচন্দ্র-বাসব সরকার-ঐ (পৃঃ ১৩৬)।
৭) নেতাজী সুভাষচন্দ্র-শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ১০)।
৮) পাঁচশো বছরের হাওড়া-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৬) এবং 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়'—অমিয় ঘোষ, সম্পাদনা ঃ ড. শিশির কর।
৯) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা ঃ প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (পৃঃ ১০৫)।
১০) স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়কেশ মুখার্জী কথিত।
১১) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—অমিয় ঘোষ, সম্পাদনা ঃ ড. শিশির কর।

১২) দীপ্ত প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর আলোকে সুভাষচন্দ্র—ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ২২৯)।

১৩) ঐ (পৃঃ ২৩০)।

১৩ ক) হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস-অমিতাভ চন্দ্র, শারদীয় পদাতিক, ১৩৯৪ (পৃঃ ২৭)।

১৪) সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন ও রচনা সম্ভার ঃ তথ্যপঞ্জী-অসিতাভ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা ১৩০৪) পৃঃ ২৭০।

১৫) ঐ (পৃঃ ২৫৫)

১৬) ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অধ্যাপক ডঃ কানাই ভট্টাচার্য কথিত।

১৭) সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন ও রচনা সম্ভার ঃ তথ্য পঞ্জী-অমিতাভ-দাশ, পশ্চিমবঙ্গ নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

১৭-ক) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—অমিয় ঘোষ, ড. শিশির কর সম্পাদিত।

১৮) পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকার (পৃঃ ১২৬)।

১৯) ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অধ্যাপক ডঃ কানাই ভট্টাচার্য কথিত।

২০) হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা--ড.শিশির কর, এস টি এ-র ত্রয়োদশ সম্মেলনের স্মরণিকা।

২১) হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনার উপাদান রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া দরকার—নিমাই সাধন বসু।

২২) বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়-অমিয় ঘোষ, সম্পাদনা ঃ- শিশির কর

২৩) সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন ও রচনা সম্ভার ঃ তথ্য পঞ্জী--অমিতাভ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ২৭১,২৭৫)।

২৪) নেতাজী—সুভাষচন্দ্র—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় (পৃঃ ১২,৪৭,৪১)।

২৫) পাঁচশো বছরের হাওড়া—হেমেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (পৃঃ১২০)।

২৬) উত্তর ঝাপড়দার স্বাধীনতা সংগ্রামী নিরাপদ গাঙ্গুলী কথিত।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বহু সংখ্যক ইংরাজকে বন্দী করে হত্যা করেছিলেন—তাঁর নামে এই নৃশংসতার কলঙ্ক আরোপের জন্য 'অন্ধকূপ হত্যা'র স্মারক-চিহ্ন স্বরূপ লর্ড কার্জন ডালহৌসী স্কোয়ার (বর্তমান বিবাদী বাগ)-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' স্থাপন করেন।

আন্দুলের বিহারীলাল সরকার (সহ-সম্পাদক, বঙ্গবাসী পত্রিকা) ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বহু পুস্তক ও দলিল-পত্র ঘেঁটে বাঙালী লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী অলীক।[১]

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। ইংরেজ সরকার তখন নানাদিকে ব্যস্ত। তাকে সর্বাত্মকভাবে আঘাত দেবার চিন্তা সুভাষচন্দ্রকে অহোরাত্র ভাবিয়ে চলেছে। ভারতের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল করতে না পারলে সেকাজ সম্ভব নয়। 'এই কারণেই ২৫শে মে (১৯৪০) ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পরিকল্পনা রাখেন।'[২]

১৯৪০-এর জুন মাসের মাঝামাঝি বাংলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে মিথ্যা ইতিহাসের ওই স্মারক চিহ্নটি অপসারণের দাবি জানানো হলো। এ কথাও জানানো হলো যদি ওই স্মারক চিহ্ন অপসারণের ব্যবস্থা করা না হয় তবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে। তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ.কে.ফজলুল হক। মন্ত্রীসভার কাছ থেকে কোন সাড়া এলো না।[৩] ১৯৪০-এর ৩রা জুলাই কলকাতার এলবার্ট হলে সভা ডেকে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, "৩রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি-দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবী বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্কস্বরূপ মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হউক।" 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় ওইদিন সুভাষচন্দ্র বিজ্ঞপ্তি দিলেন—"আগামী ৩রা জুলাই থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ ২৯শে জুন কালিম্পং থেকে কলকাতায় ফিরলেন। ২রা জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুভাষচন্দ্র দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির সমাবেশ ঘটবে এই আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার ভীত হয়ে পড়লো। ২রা জুলাই বেলা

আড়াইটায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জানব্রিন এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা মতে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করলো।[৫]

সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করায় সত্যাগ্রহ বন্ধ হলো না। ৩রা জুলাই "নির্ধারিত দিনে হাতুড়ী হাতে নিয়ে সত্যাগ্রহীরা ডালহৌসী স্কোয়ারে হলওয়েল মনুমেন্টের সন্নিকটবর্তী হলেন।" হেমন্তকুমার বসু সহ চারজন বন্দী হলেন। এমনিভাবে দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ চললো।[৬] হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী গ্রেপ্তার হলেন। ১১ই জুলাই বন্দী হলেন হরেন ঘোষ। "সত্যাগ্রহীর সংখ্যা দিন দিন চললো বেড়েই। এগিয়ে এল শতশত বাঙালী. বিহারী, শিখ। বাংলার হিন্দু-মুসলমান একযোগে কারাবরণ করলো। সংখ্যা তিনশো পেরিয়ে গেল।"[৭] বিভূতিভূষণ (নানু) ঘোষ, হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে আমতা থানার খলিয়া গ্রামের তারাপদ মজুমদার (পিতা-নগেন্দ্রনাথ), বাগনান থানার খাজুরনানের লক্ষ্মণচন্দ্র ধাড়া, ঐ থানারই দুর্লভপুরের গোষ্ঠবিহারী মাইতি (পিতা-শশীভূষণ মাইতি), কানুপাটের নিতাই মণ্ডল এবং এ জেলার বিভিন্ন এলাকার বিজয় ঘোষ, জহর ঘোষ, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, অনিল মিত্র প্রমুখ হাওড়ার বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৮] বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হাওড়ার সি এস পি নেতা রামচন্দ্র শর্মা (পিতা-সুমের শর্মা)।[৯]

শালকিয়ার আলোকদূত দাস তখন ছিলেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা। তিনি এই আন্দোলনে প্রেসিডেন্সী ও ইসলামিয়া (বর্তমান সেন্ট্রাল ক্যালকাটা) কলেজের ছাত্রদের নিয়ে যোগ দেন। পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র আহত হলে ছাত্ররা একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে।[১০]

এই আন্দোলনে তদানীন্তন জাতীয় নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে তেমনভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি।[১১] জেল থেকে হরেন্দ্রনাথ কানুপাটের নিতাই মণ্ডলকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের দায়িত্ব দিলেন। ঐ আন্দোলনে অন্যান্য জেলা থেকে স্বেচ্ছা-সেবক যোগ দিলেও হাওড়া থেকেই সিংহভাগ স্বেচ্ছাসেবক সরবরাহ করেছিলেন নিতাই মণ্ডল।[১২]

১৩ই জুলাই '৪০ এলবার্ট হলের সভায় হক মন্ত্রীসভার সমর্থক মুসলিমরা যোগ দিলেন। আন্দোলন তীব্র রূপ নিল। ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে পুলিশ লাঠি চালালো। ২৮শে জুলাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হলো বিরাট সভা। ওই দিনই সন্ধ্যায় মন্ত্রীসভা ঘোষণা করলো হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারিত হবে।[১৩]

জয় হলো সুভাষ-নেতৃত্বের।

তথ্যসূত্র ঃ

১) শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে হাওড়ার সাময়িক পত্র—অচল ভট্টাচার্য, রসপুর পিপলস লাইব্রেরী শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা।

২) রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ঃ শেষ অধ্যায়—নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ১৯৬)।

৩) নেতাজী—গোপাল ভৌমিক (পৃঃ ৮৯)।

৪) আনন্দবাজার পত্রিকা-৩০শে জুন, ১৯৪০; আমি সুভাষ বলছি (১ম)—শৈলেশ দে (পৃঃ ৪৯৬)।

৫) আনন্দবাজার পত্রিকা—৩রা জুলাই, ১৯৪০ ; রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ঃ শেষ অধ্যায়-নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ (নেতাজী সংখ্যা-১৪০৩), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পৃঃ ১৯৬); আমি সুভাষ বলছি (১ম)-শৈলেশ দে (পৃঃ ৫০০)।

৬) নেতাজী-গোপাল ভৌমিক (পৃঃ ৯৫)।

৭) নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)-নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (পৃঃ ২৩)।

৮) হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা—শিশির কর।

৯) সি এস পি নেতা রামচন্দ্র শর্মা কথিত।

১০,১২) হাওড়া জেলার ইতিহাস—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩১২, ১৮৬)।

১১) পাঁচশো বছরের হাওড়া—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১২২)।

১৩) নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (পৃঃ ২৩, ২৬)।

—— o ——

পার্টিগঠনে ও আন্দোলনে কমিউনিস্টরা

বিশ শতকের প্রথম দু দশক ধরে কল-মিল-ফ্যাক্টরী-রেলওয়ে সদর স্টেশন-রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অধ্যুষিত হাওড়ায় উপর্যুপরি শ্রমিকদের বিক্ষোভ-ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় বিশ্বস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেতে চেয়েছেন। মাঝি-মাল্লাদের ধর্মঘট, মেথর-ধাঙড়দের ধর্মঘট সাধাবণ শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় নতুন মাত্রা আনে। কলকাতায় গাড়োয়ানদের ধর্মঘটের প্রভাবও এখানে পড়ে।—এসব কথা যথাসাধ্য 'শ্রমিক আন্দোলনে' অধ্যায়ে আমরা রেখেছি।

বিশ ও তিরিশের যুগে যে সব স্থানকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লববাদী আন্দোলন, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনীতির ধারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো তাতে যেমন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, সি আর দাশের বাড়ি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বাড়ি প্রভৃতি ছিল, তেমনই হাওড়াতেও বরদাপ্রসন্ন পাইন, কালোবরণ ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র দত্ত প্রমুখকে কেন্দ্র করে কাজ চলত।

বাংলাদেশে'ইকনমিক স্বরাজ' স্থাপন নিয়ে এক সময় চিন্তাভাবনা চালু হয়। বহু কংগ্রেসকর্মী, মুক্ত রাজবন্দী, বিপ্লবীযুগের নেতারা সোস্যালিজমের কথা ভাবতে শুরু করলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্রকেও এ সব বিষয় ভাবালো। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বালির ডঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, বঙ্কিম মুখার্জী, সন্তোষ মিত্র (পরে হিজলী জেলে পুলিশের গুলিচালনায় নিহত) প্রমুখদের শিবপুরে এনে তাঁর একান্ত অনুগামীদের সমাজতন্ত্রের পাঠ দেওয়াতে লাগলেন। [শরৎচন্দ্র ও বাজে শিবপুর—ড প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, হাওড়া জেলা ও শরৎচন্দ্র-নির্মলকুমার খাঁ সম্পাদিত (পৃঃ ৬৩-৬৪)]। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আন্দুল-মৌড়ী বলুহাটি প্রভৃতি নানা জায়গায় যুবকদের কাছে সোস্যালিজমের কথা বলার জন্য যেতেন।

জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্বের সঙ্গে দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলা কংগ্রেসের বিরোধ ১৯২২-এ গয়া-কংগ্রেস অধিবেশন থেকেই তীব্র হয়ে ওঠে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর অনুসৃত পথই ধরে রইলেন, কিন্তু গান্ধী-অনুগামী যতীন্দ্রমোহনের প্রভাবাধীন নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চললোই। ফলে, প্রতিটি জেলাতেই যেমন উভয়ের অনুগামীরা ছিলেন, হাওড়াতেও ছিলেন এবং সেই বিরোধের আঁচ এখানে এসেও স্বাভাবিকভাবেই লাগলো। যদিও সুভাষ-অনুগামীরাই ছিলেন হাওড়ায় বরাবরের সংখ্যাগরিষ্ঠ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ যেমন বরাবরই প্রকাশ্যে এসে থাকে, এখানেও তা এসেছে। বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন

স্বাধীনতালাভের আগে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে বড় একটা চান-ই নি, তখন সংগ্রামী মানুষকে সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের সন্ধান করতেই হয়েছে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টি বেন ব্রাডলে ও ফিলিপ স্প্র্যাটকে ভারতে পাঠালেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী রূপায়নের জন্য। মৈমনসিংয়ের মণিসিং মেটিয়াবুরুজে সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন খোলেন। সেখানে ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্রাডলে ও কলকাতার কমিউনিস্ট নেতারা আসতেন, পার্টি ক্লাস নিতেন। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলের বহু শ্রমিক মেটিয়াবুরুজে কাজ করতে যেতেন, ঐ সব ক্লাসেও যোগ দিতেন, তাঁদের চেতনার বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো।

নবদ্বীপের সুকুমার মুখার্জী তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর মামার বাড়ি কোণায় জজবাড়িতে থাকতেন। আব্দুল হালিম তাঁকে ১৯৩২ সালে পার্টি সদস্যপদ দিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের জুন মাসে হরেকৃষ্ণ কোঙার বর্ধমানের স্বদেশী ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হলে তাঁর বন্ধুত্ব-সূত্রে সরোজ মুখার্জী সহ যে ন'জন কমিউনিস্ট সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন সুকুমার মুখার্জী। তাঁকে হাওড়া থেকেই ধরা হয়েছিল।

১৯৩৩ সালে সুকুমার মুখার্জী, ধরমবীর সিং (কলকাতার জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের বাসিন্দা) প্রমুখ ঘুষুড়িতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন।..

১৯৩৫ সালে কলকাতা ও হাওড়া জেলায় পার্টি সভ্যসংখ্যা খুব কম থাকায় দুটি জেলার জন্য একটিই কমিটি হয়। কালী মুখার্জী (যশোর থেকে আসা ছাত্র কর্মী, সৌমেন ঠাকুরের দল ছেড়ে পার্টিতে আসা কর্মী)-কে এই কমিটির সেক্রেটারি করা হয়। এই কমিটিতে হাওড়ার ডাঃ নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, বিমল মান্না প্রমুখ হাওড়ার কয়েকজন ছিলেন।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি কলকাতা ও হাওড়ার যৌথ জেলা কমিটি ভেঙে আলাদা আলাদা জেলা কমিটি হয়। হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক হন ডাঃ নিরঞ্জন চ্যাটার্জী। এই সময়েই লেবার পার্টির সমস্ত সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসেন। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাসে হাওড়া চতুর্থ জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই জেলা কমিটিতে ছিলেন মদন দাস, সুরথ পাঁচাল, সুকুমার মুখার্জী ও কালী মুখার্জী (তদানীন্তন ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা)।

আন্দুল অঞ্চলে ১৯৩৬-৩৭ সালে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজে নামেন শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জেল থেকে বেরিয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁকে জেলার কৃষক সংগঠন গড়ার দায়িত্ব দেন। বর্ধমানের হরেকৃষ্ণ কোঙার

জেল থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদ অন্তে বেরিয়ে হাওড়ার ঘুষুড়িতে চটকলে শ্রমিক সংগঠন গড়তে থাকেন।

১৯৩৭-৩৮ সালে হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করতে শুরু করেন ডাঃ নিরঞ্জন চ্যাটার্জী (শিবপুর), বিভূতি মুখার্জী (শিবপুর), কমল বড়াল (কাসুন্দিয়া), ডাঃ বিশ্বরতন মুখার্জী (কাসুন্দিয়া), অরুণ চ্যাটার্জী (শিবপুর), শৈলেন মজুমদার (শিবপুর), ডাঃ সুরথ পাঁচাল (রাজগঞ্জ), এস.এ ফারুক্কী (রাজগঞ্জ), মদন দাস (রাজগঞ্জ), বাদল দাস (প্রতাপ দাশগুপ্ত-রাজগঞ্জ), যশোহরেব কালী মুখার্জী (রাজগঞ্জ) প্রমুখ। এ ছাড়াও ছিলেন সন্তোষ গাঙ্গুলী (শালকিয়া), পতিত পাবন পাঠক (বালি)। তাদের সঙ্গে যোগ দেন নরেশ দাশগুপ্ত (শিবপুর), হরিসাধন মিত্র প্রমুখ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা। জেল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দেন বীরেন ব্যানার্জী (শালকিয়া)। অমর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দু তিনজন ছাত্রকর্মীও পার্টির কাজে অংশ নেন। বানী দত্ত (ফণী দত্ত বা পাণিনির সেজদা) শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। নুরুল ইসলাম নামে একজন শ্রমিকও এইযুগে পার্টিতে যোগ দেন। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির জীবন মাইতি, অগম দত্ত, গণেশ মিত্র প্রমুখ পরে পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৩৯ সালের আগেই আন্দুল অঞ্চলে পার্টির কাজে যোগ দেন দেবী চ্যাটার্জী, কিশোরী কাঁড়াব, কুশদেব কাঁড়ার প্রমুখ।

১৯৪০ সালের ডোমজুড়, আমতা প্রভৃতি স্থানে পার্টি গড়ে ওঠে।

১৯৪১ সালের ৭ই এপ্রিলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্টে হাওড়ায় পার্টির অবস্থা সম্বন্ধে লেখা হয় যে, জেলা কমিটির ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন কাজ করছেন, দুজন জেলে । ৪ জন মাত্র শ্রমিক পার্টি সভ্য। জেলা নেতাদের মধ্যে একজন জেলা গোপন কেন্দ্রে এবং একজন শ্রমিক গোপন কেন্দ্রে কাজ করেন।

১৯৪১ সালে সমর মুখার্জী জেল থেকে বাইরে আসেন এবং আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে তিনি সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠনের কাজে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে সরোজ মুখার্জীও আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় খুরুট রোডের পার্টি অফিসে জেলা নেতাদের বৈঠকে উপস্থিত হন। সেই বৈঠকেই সমর মুখার্জী সর্বসম্মতিক্রমে জেলা কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে আন্দুলের ভূজেন ব্যানার্জী, শশীশেখর ব্যানার্জী পার্টি সদস্য হন। ঐ সময়েই আন্দুলের গোবিন কাঁড়ার, ডোমজুড়ের কেষ্টবাগ পার্টি সদস্য হন। ১৯৪২-এর শেষ দিক থেকে শিবপুরের অবনী মুখার্জী জেলা পার্টির তরফ থেকে ডোমজুড়ে পার্টিগঠনের কাজে নিযুক্ত হন।

১৯৪২ সালের ২৩শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। রাজ্যকমিটির অফিস খোলা হয় ২৪৯ বহুবাজাব স্ট্রীটে। এই সময়েই 'জনযুদ্ধ'

পত্রিকা প্রথমে পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক বের হতে থাকে। হাওড়া সহ কয়েকটি জেলাকে নিয়ে বসে প্রাদেশিক কমিটি ১লা আগস্ট কলকাতা টাউন হলে মিটিংয়ের আয়োজন করে। হাওড়া থেকে বিমল মান্নার নেতৃত্বে এক হাজার শ্রমিকের সংগঠিত মিছিল ঐ সভায় যোগ দেয়। ১৯৪৯ সালের ২২শে জুন সোভিয়েট-আক্রান্ত হলে যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দেয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (১৯৪২-এর ৮ই মে) চট্টগ্রামে বোমা পড়ে। একদিকে বোমাবর্ষণ অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। জনরক্ষা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলন হতে থাকে। হাওড়া থেকে নূর হোসেন ও অমর মুখার্জী গ্রেপ্তার হন।

ডোমজুড় ও আন্দুলে সম্মেলন অনুষ্ঠান করে জনরক্ষার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেওয়া হয়।

১৩৪৯ সালের ১লা বৈশাখ কিশোর বাহিনীর সৃষ্টি হয়। হাওড়ার রাজগঞ্জ, শিবপুর, ডোমজুড় প্রভৃতি এলাকায় ধীরে ধীরে এর শাখা গড়ে উঠতে থাকে।

প্রাদেশিক দপ্তর ১৯৪২-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জেলা পার্টির সম্মেলন শেষ করার নির্দেশ দেয়। হাওড়া জেলার পার্টি সম্মেলন হয় ১২ই ডিসেম্বর রাজগঞ্জে, সভাপতি হন আব্দুল মোমিন। প্রকাশ্য সমাবেশে ৬ হাজার নরনারী যোগ দেন।

৪২-এর ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর কলকাতার শহরতলীতে বোমা পড়ে।

১৯৪৩-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ায় লালফৌজের ২৫-তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৩-এর শুরু থেকেই বাংলা দেশে খাদ্যাভাব শুরু হয়। ১৯৪৩-এর মে মাসে হাওড়ায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে খাদ্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাটের জমি কমিয়ে ফসল বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। খাজনা ও রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখার দাবিতে হাওড়ায় কৃষক সম্মেলন হয়। সঙ্গে সঙ্গে চটকল শ্রমিকরাও ছাঁটাই বন্ধ, ঘুষবন্ধ, রেশনিং-এর দাবিতে হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে আন্দোলনে নামেন। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে আন্দুলে খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৩ সালে কলকাতা জেলা পার্টির সম্পাদক হন কুমুদ বিশ্বাস (পিতা-তিনকড়ি বিশ্বাস)।*

১৯৪৩ সালে হাওড়ায় পার্টির যে বৃদ্ধি ঘটে তার প্রমাণ পাওয়া যায় জেলা পার্টি তার নির্ধারিত ৭৫০ টাকার কোটা পূরণ করেছে আটশো বারো টাকা চোদ্দ আনা তুলে দিয়ে। এই সময়ে (১৫.৪.১৯৪৩) পার্টি সদস্য সংখ্যা ২২৮-এ পৌঁছায় যা যুক্তবঙ্গের অনেক জেলার থেকে বেশি। তখন পার্টিওয়েজ প্রাপ্ত সারাক্ষণের কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮।

১৯৪৩-এর ১৫ই আগস্ট দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে হাওড়ায় বিরাট সমাবেশ হয়। বক্তা থাকেন ভবানী সেন, রণেন সেন, আব্দুল মোমিন প্রভৃতি। তাতে রাজগঞ্জ ও শিবপুরের কিশোর বাহিনী অংশ নেয়।

হাওড়ায় রিলিফ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রিলিফের কাজেও জেলা পার্টির প্রথম সম্পাদক ডাঃ নিরঞ্জন চ্যাটার্জী অংশ নেন।

শ্রমিকরা এই সময় তাদেব দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামলে মালিকের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে থাকে। যেমন, ঘুষুড়ির চটকল সম্মেলনের আগেই ইউনিয়ন কর্মী সত্যগুপ্ত আক্রান্ত হন। তার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাবার পথে অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন ঘোষ আক্রান্ত হন।

হাওড়ার এলাকায় এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দারুণ বৃদ্ধি পায়। ১১০০ গ্রামের মধ্যে ৭০০ গ্রাম আক্রান্ত হয়, ১৯৪৩ সালে ১০,০০০ মানুষ মারা যায়। ১৯৪২ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ৫ গুণ বেশি। ১৯৪৩ সালে ইংরাজ সরকার আসাম রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ডিব্রুগড়ের ডাঃবিনয় চক্রবর্তীকে। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির আসাম ভ্যালী জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য। তখন দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে ডোমজুড় ও সন্নিহিত কৃষক অঞ্চলে ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়। পার্টির নির্দেশে ডাঃ চক্রবর্তী ডোমজুড়ে আসেন, পার্টি অফিসে ডিসপেনসারি খোলেন এবং দিবারাত্র পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রোগীর চিকিৎসা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বেড়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই ইংরাজ সরকার তাঁকে হাওড়া থেকেও বহিষ্কার করে। তাঁর বিদায় সম্বর্ধনা সভার সভাপতি সতীশ চন্দ্র ঘোষ সহ কয়েক শো মানুষ অশ্রুসজল চোখে তাঁকে বিদায় জানান।

১৯৪৩-এর ২৬শে মে বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বই এর) আর এম ভাট হলে পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়।. তাতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড়ের পার্টি সদস্যা শৈলজা দে।

১৯৪৩-এর মে মাস থেকে হিন্দী সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশ হতে থাকে।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে খাদ্যের দাবিতে সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলেই ১৯৪৪-এর ৩১শে জানুয়ারী থেকে কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার গার্ডেনরীচ, হাওড়া, কালি, বেলুড় প্রভৃতি অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়।. বাংলার সর্বত্র খাদ্য কমিটি গড়ে তুলে মজুত উদ্ধারের দাবি তুলতে শুরু করে কৃষক সমিতি।.. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ অকমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও রিলিফ ও গ্রাম জীবন পুনর্গঠন প্রভৃতির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেন। এই সময় হাওড়া ময়দানে রেশনিংয়ের দাবিতে হাওড়া জেলা হিন্দু মহাসভা, লীগ, কংগ্রেস

কর্মী ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত সভা হয়। ১৫ হাজার মানুষ সমবেত হন। এই সভায় লীগের কফিলুদ্দিন খাঁ, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি জোশী, বঙ্কিম মুখার্জী, ইন্দ্রজিত গুপ্ত বক্তৃতা দেন। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি সময়ে ডোমজুড়ে জেলা পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট সংগঠক অবনী মুখার্জীর নেতৃত্বে 'গ্রাম বাঁচাও সম্মেলন' হয়। সভাপতিত্ব করেন ঝাপড়দা ডিউক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সতীশচন্দ্র ঘোষ। পার্বতীপুরেরর ক্ষীরোদ মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডিউক স্কুলের মাঠের বিরাট সমাবেশ উপস্থিত থাকেন। প্রাদেশিক কমিটির পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী প্রধান বক্তা থাকেন।

১৯৪৪-এর ২৬শে মার্চ হাওড়ায় শ্রমিকদের ১১টি ইউনিয়নের৫,০০০ শ্রমিককে নিয়ে কয়লা, রেশন ও মাগগীভাতার দাবিতে হাওড়ায় সম্মেলন হয়।

১৯৪৫ সালে ১২নং লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হয়।এটা পার্টির দ্রুত বৃদ্ধির একটা লক্ষণ। এই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশের মধ্যে একটি জাতীয় পার্টিতে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে 'দেশরক্ষায় কংগ্রেসের ডাক' নামে একটি দু'আনা দামী পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। কারারুদ্ধ দেশনেতাদের মুক্তির দাবিতে, কংগ্রেসকে বৈধ করার দাবিতে কমিউনিস্টরা সোচ্চার হন।

কংগ্রেস পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের অপসারণের উদ্যোগ চলে এবং গান্ধী-জোশী পত্রালাপ চলে। কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে হাওড়ার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অগ্রণী ভূমিকা নেন। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী মহামারী প্রতিরোধে পিপলস রিলিফ কমিটির হাওড়া শাখার সম্পাদক ডাঃ নিরঞ্জন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সহ সকল দলের কর্মীদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা খাদ্য, ত্রাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মিসেস বার্টের নেতৃত্বে আমেরিকার ফ্রেণ্ডস অ্যামবুল্যান্স ইউনিট এখানে আসে। পি আর সি-র হাওড়া ইউনিট তাঁদের সঙ্গে একত্রে ত্রাণ কার্য চালান।

যুদ্ধ পরবর্তীকালে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সারা দেশে তীব্র হয়ে ওঠে। বিভিন্ন আন্দোলনে হাওড়া জেলা পার্টি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর ইন্দোনেশিয়া দিবস পালনে, ২১শে থেকে ২৫শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে উত্তাল আন্দোলনে, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে, ১৮ই থেকে ২৩শেফেব্রুয়ারী নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে আন্দোলনে, জুলাইয়ে ডাক তার ধর্মঘটের সমর্থনে ২৯শে জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘটে ও সমাবেশে, বন্দীমুক্তির দাবিতে ২৪শে জুলাই বিধান সভা অভিযানে, ১৯৪৭ সালের ২১শে জানুয়ারী 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনে কমিউনিস্ট পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক সহ অন্যান্য বামপন্থীদলের সহযোগে এ

জেলায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে হাওড়ার শ্রমিক সভায় বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রতিনিধি দলকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। [হাওড়া জেলায় কমিউনিস্টপার্টি গঠনের ইতিহাস—অমিতাভ চন্দ্র, শারদীয় পদাতিক, ১৩৯৪, (পৃঃ ৩৮-৩৯)]

১৯৪৬-এ সদ্যমুক্ত আন্দামান বন্দীদের হাওড়া টাউন হলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতি হন জেলা কংগ্রেস সভাপতি কালোবরণ ঘোষ। মূল ভূমিকায় থাকেন কমিউনিস্টরা।

১৯৪৬ সালে বাংলার আইনসভা নির্বাচনে ৭টি শ্রমিককেন্দ্র ছিল। চা বাগান ও রেলওয়েতে কমিউনিস্ট প্রার্থী রতনলাল ব্রাহ্মণ ও জ্যোতি বসু জয়লাভ করেন। হাওড়া শ্রমিককেন্দ্রে পূর্বতন বিধায়ক কংগ্রেস প্রার্থী শিবনাথ ব্যানার্জীই জয়লাভ করেন। পরাজিত হন কমিউনিস্ট প্রার্থী বঙ্কিম মুখার্জী। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের উপর ব্যাপকভাবে হামলা হয়।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লিগের ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ইংরাজ সরকার-বিরোধী আন্দোলন ছিল না, ছিল সাম্প্রদায়িক। কলকাতা শহরে দাঙ্গা শুরু হলো। হাওড়ায় তা ছড়িয়ে পড়ল। হাওড়ায় দাঙ্গা প্রতিরোধে অসমসাহসিক ভূমিকা পালন করলেন পার্টি সম্পাদক সমর মুখার্জী. গুণ্ডারা পার্টি অফিস (২নং ঈশ্বর দত্ত লেন) আক্রমণ করলে সমর মুখার্জী, মদন দাস প্রমুখ কমিউনিস্টরা নিজেরা আহত-রক্তাক্ত হয়েও আদর্শ পরিত্যাগ করেন না। গ্রামে কৃষকরা তখন জমি ও ধানের দাবির আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ, সেখানে দাঙ্গার হাওয়া কার্যকরী রূপ নিতে পারেনি, শহরের শ্রমিক-আন্দোলনে সংঘবদ্ধ মানুষকেও দাঙ্গা টলাতে পারেনি—অসংগঠিত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষরাই দাঙ্গার ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়। হাওড়ার কমিউনিস্টরা সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তদের নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন।

তথ্যসূত্র ঃ হাওড়া জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে কিছু কিছু পরস্পর বিরোধী মত ব্যক্ত আছে। এটি বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র নয় ব'লে আপাত বিতর্কের উল্লেখ এড়াতে এই অধ্যায়েব সমস্ত মূল তথ্যই সরোজ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা ১ম ও২য় খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ঘটনা স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেছি। তিনটি সূত্রের উল্লেখ অধ্যায়ের মধ্যেই আছে।

* কুমুদ বিশ্বাসদের আদিবাড়ি হাওড়ার দেউলপুরে। পিতার কর্মস্থল ছিল বরিশাল। সেখানে থাকাকালে ছাত্র অবস্থাতেই অনুশীলন পার্টিতে (শঙ্কর মঠে) কুমুদ বিশ্বাস যোগ দেন। জেলে থেকেই ম্যাট্রিক, আই.এ ও বি.এ পরীক্ষায় কৃতীত্বের সঙ্গে পাশ করে জেলেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বাইরে আসেন। তাঁর পিতা তিনকড়িবাবু তার আগেই হাওড়ার ২৫৫নং পঞ্চানন তলা রোডে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন।—কুমুদ বিশ্বাসের সহধর্মিনী শচী বিশ্বাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

ছাত্র আন্দোলনে

১৯২৪ সালে কলকাতায় 'ক্যালকাটা স্টুডেন্সস এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২৬ সালে হাওড়া জেলায় 'ছাত্র সমিতি' গড়ে ওঠে। তার প্রথম সভাপতি হন কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'সাইমন কমিশন'-এর ভারতে আসার প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়। ঐদিন ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ছাত্র বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ও স্কটিশচার্চ কলেজের দু'জন ছাত্রনেতা কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দুহোস্টেল বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে ক্যালকাটা স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতি 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন গঠন করতে হবে—সেই উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলেজ স্ট্রীটের এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউসে) অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় যে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় তার নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে থাকেন সেন্ট পলস্ কলেজের ছাত্র বালিগ্রামের রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী) ও মধ্য হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে হাওড়া থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদ)। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত প্রথম ছাত্র সম্মেলনে 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য ডঃ ডবলিউ. এস. আর্কুহার্ট। সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু এবং প্রধান অতিথি থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৯ সালে জুলাই মাসে বালির রিভার টমসন (বর্তমানে শান্তিরাম) হাই স্কুলে হাওড়া জেলার প্রথম ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির মূল সভাপতি হন কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে নিবাচিত কংগ্রেস সাংসদ), সম্পাদক হন রামকৃষ্ণপুরের রবীন্দ্র লাল সিংহ (পরবর্তীকালে পঃ বঃ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী), সংগঠন সম্পাদক হন বালির শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হন বালির রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলনে 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন' কংগ্রেস নেতৃত্বে সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের মত পার্থক্যের জেরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সেনগুপ্ত-পন্থী অলবেঙ্গল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (এ বি এস এ) এবং সুভাষ-পন্থী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন (বি পি এস এ) গঠিত হয়।[১]

"১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে দিকে দিকে নূতন করিয়া আবার আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। এই সময় বালীর তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া অকথ্য নির্যাতন সহ্য এবং শতাধিক ছাত্র কারাবরণ করেন। ছাত্রনেতা রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম পিকেটিং করিয়া গ্রেপ্তার হন।"[২] ছাত্রনেতা কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়ও কারাবরণ করেন।[৩] (দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার) 'পরের দশকে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার চক্রান্তে জনৈক বালীর ছাত্র গ্রেপ্তাব হন।'[৪]

বালি-উত্তরপাড়ার স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে দাঙ্গা প্রতিরোধে কলকাতায় নিহত) ও পতিতপাবন পাঠক (পরবর্তীকালে পঃ বঃ সরকারের মন্ত্রী) ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।[৫]

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতার এলবার্ট হলের সভায় যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য থাকেন শালকিয়ার আলোকদূত দাস (পরবর্তীকালে হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র)। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন, (AISF) নামে একটি সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রাদেশিকস্তরে ছাত্র সংগঠন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে (BPSF)।[৬]

মধ্য হাওড়ার ৩/১ কালী ব্যানার্জী লেনের বিনয়ভূষণ রায় ছিলেন সুভাষপন্থী বি পি এস এ-র ছাত্রনেতা। এ বি এস এ-র নেতা কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তাব দেন এবং তাঁরই অনুগামী সমর মুখার্জীকে সংগঠনে নিতে অনুরোধ করেন। হাওড়া টাউন হলে ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে (১৯৩৮) একটি ছাত্র সম্মেলন করা হয়। উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু (কংগ্রেস সভাপতি তখন রাষ্ট্রপতি নামে অভিহিত হতেন)। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন কবীর (বিনয় বাবু সাক্ষাৎকারে কবীর সাহেবের কথা বলেছেন, অন্যত্র আছে শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্ব করার কথা)। দু'দিন ধ'রে ঐ সম্মেলন হয়। নাম হয়, হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন। সভাপতি নির্বাচিত হন সমর মুখার্জী (তিনি তখন আমতা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা) এবং সম্পাদক হন বিনয়ভূষণ রায় (তিনি তখন ছিলেন হাওড়ার ৭ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, পরে হাওড়ার কাউন্সিলর হন)। শরৎচন্দ্র বসু দু' দিনই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।[৭]

'শারদীয় পদাতিক-১৩৯৪' সংখ্যায় (পৃঃ ৩৭) অমিতাভ চন্দ্র লিখেছেন, '১৯৩৯-

৪০ সাল নাগাদ সমর মুখার্জী হাওড়া জেলা ফেডারেশনের সূত্রপাত করেন। সেই সময় থেকে সমর মুখার্জী ছিলেন ফেডারেশনের সম্পাদক। ১৯৪২ সালে ছাত্র ফেডারেশনের দ্বিতীয় সম্পাদক হন সুধীর দত্ত। ১৯৪৪ সালে তৃতীয় সম্পাদক হন জ্ঞান চক্রবর্তী এবং সহ-সম্পাদক হন গোবিন কাঁড়ার। ১৯৪৭ সালে চতুর্থ সম্পাদক হন অনিল চ্যাটার্জী। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্য ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন তারিণী শঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং তারপরে বাণী ব্যানার্জী।...দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধে জেলা ছাত্র ফেডারেশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।'

'১৯৪৬ সালে বর্দ্ধমানের 'উইল বাড়ি'তে ছাত্র কংগ্রেসের এক সম্মেলন হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু। ভাষণ দেন বিখ্যাত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিংহলের বলশেভিক নেতা কর্ণেল ডি সিলভা, বিশ্বনাথ দুবে, জেড এইচ খান (উভয়েই বলশেভিক) ও মথুরা মিশ্র (ফরওয়ার্ড ব্লক)। হাওড়া থেকে ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্য (প্রাঃ মন্ত্রী), অনিল মুখার্জী, নারায়ণ মিত্র, সুকুমার মণ্ডল ও দিলীপ দে (উভয়েই শালিখার)।'[৮]

ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় নেতা হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এগিয়ে আসেন শিবপুরের সত্যজিৎ দাশগুপ্ত (নিমু), ডোমজুড়ের সন্তোষ ব্যানার্জী, আমতার বিজয় ঘোষ প্রমুখ ছাত্ররা।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় বি পি এস এফ-এর সম্পাদক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। (ইনিও হাওড়া জেলার বালির অধিবাসী)। রিলিফ, ত্রাণ ও চিকিৎসার কাজে ছাত্র ফেডারেশন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সারা ভারতের ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য গ্রহণ ক'রে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার কাজে অগ্রসর হয়। নিজেদের তত্ত্বাবধানে ২১টি রিলিফ কিচেন খোলে। অন্যদের পরিচালিত ৩৫টি রিলিফ কিচেনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে। নিজেদের চেষ্টায় ১৫টি মহামারী প্রতিরোধকেন্দ্র গড়ে তোলে ও ১৮টি দুধের ক্যান্টিন চালায়। হাওড়ায় গার্লস স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনও কয়েকটি দুধের ক্যান্টিন চালিয়েছে।[৯]

১৯৪৬ সালে জেলা ছাত্র ফেডারেশন আন্দামানের মুক্ত রাজবন্দীদের আন্দুলে সম্বর্ধনা দেয়।[১০]

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-আন্দোলনে হাওড়ার ছাত্ররা বরাবর সামনের সারিতে থেকেছেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে তারা সাড়া দিয়েছেন। বিপ্লবী আন্দোলনে, অহিংস আন্দোলনে, আই-এন এ-র মুক্তি আন্দোলনে—ইত্যাদি প্রতি আন্দোলনেই তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তথ্য সূত্র ঃ

১) হাওড়া জেলার ইতিহাস—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩০৮-৩০৯) ;

অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন (সূচনা পর্ব)-অমিতাভ চন্দ্র (পৃঃ ১৫০)।

২,৪) বালিগ্রামের ইতিকথা-শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৪, ১১৫)

৩,৫,৬,৮) হাওড়া জেলার ইতিহাস-হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ৩১০, ৩১১, ৩১২)

৭) বিনয়ভূষণ রায় কথিত।

৯) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (২)—সরোজ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ১৭০-১৭১)

১০) হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস-অমিতাভ চন্দ্র, শারদীয় পদাতিক ১৩৯৪, (পৃঃ ৩৯)।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনে

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছেড়ে যেতে অনুরোধ সম্বলিত মহাত্মা গান্ধীর (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে. ব্রিটিশ সরকার বিদেশী আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারবে না। জাপানের সঙ্গে শত্রুতা ভারতের নয়, ব্রিটেনের। ব্রিটিশ সরকার এদেশে থাকার জন্যই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যত। ব্রিটিশ সরকার এদেশ ছেড়ে গেলে ভারতবাসীর সঙ্গে জাপানের একটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারবে। ৭ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আলোচনা শুরু হলো। ৮ই আগস্ট এই প্রস্তাব গৃহীত হলো। ৯ই আগস্ট ভোরে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন এবং কংগ্রেসকে সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে দিল। গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আহবানে সারা দেশ জেগে উঠলো। রেলপথ উপড়ে, থানা-ডাকঘর পুড়িয়ে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের লাইন কেটে, সরকারী সম্পত্তি বিধ্বস্ত ক'রে মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়তে লাগলেন। সারা দেশের সঙ্গে হাওড়া জেলারও শহর গ্রামাঞ্চল এ আন্দোলনে সামিল হলো। থানা ডাকঘর পোড়ানোর চেষ্টা, তারের লাইন কাটা প্রভৃতি সব রকমেই সরকারকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা হলো। এখানকার আন্দোলনকারীদের সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্রের আসামী করা হোল, মুম্বই পর্যন্ত ধাওয়া করে গ্রেপ্তার চললো, সারা জেলা জুড়ে ব্যাপক গ্রেপ্তার নির্যাতন চললো।

"১৯৪২ খৃঃ ভারতছাড় (Quit India) আন্দোলনেও বালীর তরুণ কর্মীরা স্বতঃই যুক্ত হইয়া পড়েন। অনেকে কারারুদ্ধ হন।...বালীর স্বেচ্ছাসেবকেরা গোপনে স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ সংকলন ও cyclostyle করিয়া বালী, বেলুড়, লিলুয়া, শালিখা প্রভৃতি শ্রমিককেন্দ্র ও রেলস্টেশনে প্রচার করিতেন। গভীর রাত্রে অতি গোপনে সকল কার্য সমাধা হইত। কর্মীও পাঠকেরা অনেকেই সংবাদ পাইয়া কৃতার্থ হইতেন। অথচ কেহই এই গোপন সূত্রের উৎস বা পরিবেশন পদ্ধতি জানিতে পারিতেন না। এই প্রকল্পে শিক্ষাবিদ মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"[১]

'৪২-এর আন্দোলনসূত্রে গ্রেপ্তার হন বালীর উপেন্দ্রনাথ দাস।[২]

আগস্ট আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন বালীর তারাদাস ভট্টাচার্য। বোমা তৈরি করে অত্যন্ত গোপনে তিনি বিভিন্ন কর্মীদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। কিন্তু আত্মগোপন করে তিনি কাজ চালিয়ে যান। বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের

সেবার কাজে যখন তিনি লিপ্ত তখন গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান।[২ক]

'৪২-এর আন্দোলন হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ শ্যামপুর অঞ্চলে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৪২-এর ১১ই বা ১২ই আগস্ট আন্দোলনকারীরা থানা জ্বালিয়ে দেন, একজন কনস্টেবল নিহত হয়। শ্যামপুরে আগস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অমর বৈতালিক ও সমর বৈতালিক—দু ভাই। হাওড়া শহরে সাধারণ লোকে আন্দোলন করে। পোস্টাপিস, রেলস্টেশন ভাঙচুর হয় এবং ২/৩ দিনের মধ্যে সে আন্দোলন থেমে যায়।

১৯৪২-এর জুন মাসে ফরোয়ার্ড ব্লক বে-আইনী ঘোষিত হয়। বাংলার বহু নেতা গ্রেপ্তার হন। হরেন ঘোষ গ্রেপ্তার হন না, কিন্তু পুলিশের কড়া নজর তাঁর উপরে থাকে। পরে ঐ বছর অক্টোবর মাসে তিনি গ্রেপ্তার হন। অন্যতম নেতা হাওড়ার কানাই ভট্টাচার্য বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাইয়ে যান—কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মিলিতভাবে তখন আন্দোলন করার কথা ভাবছিল। কানাইবাবু সেখানে গ্রেপ্তার হন। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন মুকুন্দলাল সরকার, শীলভদ্র যাজী, গিরধর ঠাকরে, পি. কে. তারে (পরবর্তীকালে ইনি জজ হন) প্রভৃতি।

কানাইবাবুকে ডেটিনিউ হিসাবে বোম্বাইয়ের ওরলি, আর্থার রোড, নাসিক রোড জেলখানায় আড়াই বছর রাখা হয়। মুক্ত হয়ে এসে কানাইবাবু রিসার্চ করতে চান, কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয় না। উনি বৃত্তি পেতেন। স্বাধীনতার পর গবেষণার সুযোগ পান।[৩]

পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামের হীরালাল ঢ্যাং-এর পুত্র মদনমোহন ঢ্যাং আগস্ট-আন্দোলনে যোগদানের জন্য কুশডাঙ্গা গ্রামে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে হাওড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে দমদম জেলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে রাখা হয়। প্রায় ছ মাস পর তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতার কার্জন পার্কে বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করার অভিযোগে পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও মাসাধিক কাল কারারুদ্ধ থাকেন। আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে ঐ থানার গঙ্গাধরপুরের 'অমূল্য বিদ্যামন্দির' পুলিশ বন্ধ করে দেয়। যে রাত্রে অমূল্য বিদ্যামন্দিরে পুলিশ যায় সেখানে তখন কিছু সংখ্যক কর্মী ছিলেন। পুলিশ তাদেরও গ্রেপ্তার করে। এই কর্মীদের অন্যতম ছিলেন শুলুটি গ্রামের পরেশনাথ ঘোষের পুত্র রাজীবলোচন ঘোষ, জুজারসাহা গ্রামের গোষ্ঠবিহারী মাজীর পুত্র সুধীরচন্দ্র মাজী প্রভৃতি।

আমতার অমরাগড়ী অঞ্চলের কাঁকরোল গ্রামের সুরথচন্দ্র রায়ের পুত্র সুধীরকুমার

রায় আরামবাগে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসালয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত কর্মীরা আসতেন ও আলোচনা করতেন। আগস্ট আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার হন ও তিনবছর জেল খাটেন। জেলখানায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন।

আগস্ট আন্দোলনে শিবপুর থানা দখল অভিযানে গ্রেপ্তার হন বেলিলিয়াস রোডের চিন্তামণি হাজরার পুত্র সুকেশপ্রসাদ হাজরা। তাঁর ৯ মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩২ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েও তাঁর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। শিবপুরের যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পুত্র শান্তিকুমার দাশগুপ্তকে সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্রের আসামী করা হয়। ঐ মামলায় ১৬ জন আসামীর মধ্যে ছিলেন প্রবোধ চন্দ্র—যিনি পরে পাঞ্জাব বিধান সভার স্পীকার ও পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন, ছিলেন আনসার হারবানি—ইনি পরবর্তীকালে এম. পি হন, ছিলেন চীন মিশনের ডাঃ দেবেশ মুখার্জী প্রভৃতি। ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষ সুবিধা করতে না পেরে শান্তি দাশগুপ্তকে তিনবৎসরের সিকিউরিটি বন্দী করে দেয়। তিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন।

হাওড়ার প্রাণকৃষ্ণ রায় (পিতা-প্রসন্নকুমার রায়) রামকৃষ্ণপুরের সন্ধ্যাবাজারের কাছে গ্রেপ্তার হন ও ৯ মাস জেল খাটেন। এর আগে '৩২ সালেও তিনি কারাবরণ ক'রে ৯ মাস জেলে ছিলেন।

বাগনান থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বনমালী ঘোষের (পিতা-ধরণীধর ঘোষ) আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় দু বছরের সাজা হয়।

রাতের অন্ধকারে থানা আক্রমণ করতে গিয়ে দিলদা গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্র অবধূত মান্না (পিতা-পূর্ণচন্দ্র মান্না) গ্রেপ্তার হন ও ন মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

পরবর্তীকালে বেলুড়ে বসবাসকারী (পূর্ব নিবাস নোয়াখালি)হরিপদ মজুমদার (পিতা-বসন্তকুমার মজুমদার) কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি ছিলেন গেস্টকীন উইলিয়ামসের কর্মচারী। আগস্ট সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কলকাতায় অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরা পড়েন। দীর্ঘদিন বিনাবিচারে বন্দী থাকেন। ১৯৪৫ সালে ছাড়া পান। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যে সব কর্মীরা তখন হাওড়ায় কাজ করতেন তাঁরা 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে সকলেই অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে ৫০/৩ বেলিলিয়াস লেনের শচীন্দ্রনাথ দে (পিতা-খগেন্দ্রনাথ দে) ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঐ সময়ে হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিতা-অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়), হরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গও গ্রেপ্তার হন ও

ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ থাকেন।

হাওড়ার ৪৩ নং বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনের অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আগস্ট বিপ্লবে অংশ নেবার অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে কারাবাস ভোগ করেন। তিনি যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পূর্বেও জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি বহরমপুর জেলে ছিলেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি হিজলী জেলে স্থানান্তরিত হন। জেলে অব্যবস্থার প্রতিবাদে অনশন সত্যাগ্রহ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪]

দল হিসাবে আর. সি. পি. আই-এর এ জেলার ইউনিট সর্বশক্তি নিয়ে আগস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দাশনগরের অনাদি দাস, হাওড়ার সনৎ দত্ত, কদমতলার মাখন সানি প্রমুখ কর্মীরা প্রায় ১০/১২ জন মিলে সারা শহরে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। ভারত জুট মিল, ইণ্ডিয়া মেসিনারী ছাড়াও অনেক ছোটবড় কারখানায় এই দলের ইউনিয়ন ছিল। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন, ১৪ই আগস্ট হাওড়া ময়দানে ৫০০ লোকের সমাবেশ হলো। ১৮ই আগস্ট বেলিলিয়াস রোডের সমস্ত শ্রমিক মিলে থানার সামনে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ হলো। সংবাদপত্রে ফলাও ক'রে এই সংবাদ পরিবেশিত হওয়ায় আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। বাটার দোকানের সামনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। মানুষের ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। শুরু হয়ে যায় বিজলীবাতি ভাঙা, তার কাটা, ট্রানস্‌ফরমার ভাঙা, পুলিশ মারা। নেতারা আত্মগোপন করে থাকেন। নবরূপম সিনেমার পাশে আর সি পি আই অফিসের সামনে সর্বদা পুলিশ পাহারা ছিল। মানকুড়ে চালকল লুটের পরিকল্পনা, বাক্‌সীর কাছে মদের দোকানে আগুন লাগানো, খালনার খালে ধান বোঝাই নৌকালুট প্রভৃতিতে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়ে যান। অনাদি দাস প্রমুখ নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।[৫]

এই সময় কলকাতায এ আই. টি. ইউ. সি-র বার্ষিক অধিবেশন হবার কথা ছিল। শিবনাথ ব্যানার্জী, শান্তা ভ্যালে রাও, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃমণ্ডলী এসেও গিয়েছিলেন, হঠাৎ ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে কলকাতায় অধিবেশন করা যায় না। তখন সকলে মিলে বসে শিবনাথ বাবুকে হাওড়ায় মিটিং করতে বলেন। হাওড়া ময়দানে ড্রামবাজিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই সভা হয়। এন. এম. জোশী, ডাঃ চারু ব্যানার্জী, শান্তা ভ্যালে রাও প্রমুখ বক্তা ছিলেন।

হাওড়ায় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির তখন নেতা ছিলেন বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী (ঢাকা), শকরুল্লা খান (ইউ পি) প্রভৃতি। অফিস ছিল ৪নং তেলকল ঘাট রোডে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং

অন্যান্য কিছু দল ও ব্যক্তি একত্রে শ্রমিক আন্দোলন করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় কমিউনিস্টরা ফ্যাসীবাদকেই তখন প্রধান শত্রু বলে গণ্য করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্র বদল হয়ে 'জনযুদ্ধে' পরিণত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নেন। অন্য দলগুলি এইভাবে যুদ্ধের চরিত্র বিচার না করায় তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কর্মধারার পার্থক্য দেখা দেয়। সি. এস. পি প্রভাবিত অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেনস' ইউনিয়ন আগস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং সেইমত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে. সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করে এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাওড়া থেকে শিবনাথ ব্যানার্জী গ্রেপ্তার হন। জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করেন। হাওড়ার রেল কোয়ার্টার তখন নানাস্থানের আত্মগোপনকারী আগস্ট বিপ্লবীদের আশ্রয় স্থান হয়ে ওঠে। বিহারের বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ চৌবে, মজঃফরপুরের রামচন্দ্র সিং (এঁর নামে ১৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল) প্রমুখ নেতারা হাওড়ায় এসে লুকিয়ে থাকেন।[৬]

আগস্ট আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার মরীয়া হয়ে উঠেছিল :

"১৯৪২ সালে গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'-র শেষ মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের প্রেস (শক্তিপ্রেস-কলকাতা) থেকে গান্ধীজীর 'হরিজন পত্রিকা'ব বাংলা সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল। মনোরঞ্জন গুহ ছিলেন সম্পাদক এবং আমি ছিলুম ম্যানেজার। এই সময়ে প্রেসে বে-আইনী কাগজ-পত্র ছাপা হয়েছে সন্দেহ করে আমাদের শক্তিপ্রেসের সকলকে প্রায় প্রতিটি কম্পোজিটরকে অবধি গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সরকার প্রেস বন্ধ করে দিল, সেখানে পুলিশ পাহারা বসে গেল। প্রেসের পাশে আর একটা ভাড়া নেওয়া বাড়ীতে রতনদা (রতনমণি চট্টোপাধ্যায়-বালি), ভবভূতি সোম, অজিত বসু ও আমি (শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-বালি) ছিলুম। সঙ্গে বে-আইনী কাগজপত্রও ছিল। আমাদের চারজনকেও একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সী জেলে ও পরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।"—ভবভূতি সোম ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা, অজিত বসু হলেন পার-শ্যামপুরের বাসিন্দা।[৭]

'৪২-এর আন্দোলনে লক্ষ্মণচন্দ্র ধাড়ার নেতৃত্বে বাগনানে এক বিশাল সমাবেশ ও মিছিল হয়। বাগনান থানা অবরোধ হয়, রেল চলাচল বন্ধ হয়, তার কেটে টেলিগ্রাফ অচল করা হয়। ক্ষুব্ধ ছাত্র-যুব জনতার উপর পুলিশকে গুলি পর্যন্ত ছুঁড়তে হয়। আত্মগোপন ক'রে থাকাকালে লক্ষ্মণচন্দ্র ধাড়া গ্রেপ্তার হন ও ৯ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন।[৮]

উদয়নারায়ণপুর থানার গজা গ্রামের ললিতমোহন সিন্‌হা, পাঁচারোল গ্রামের জগন্নাথতলার পচুরাম মাইতি ও জগন্নাথ সামন্ত ভারতছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে

গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।[৯]

সূত্র ঃ

(১) শতাব্দীর পরিক্রমায় বালীগ্রামের ইতিকথা—শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পৃঃ ১১৬)।

(২) স্মৃতিকথা—শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ৪)।

(২ক) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়াজেলার সেনানীবৃন্দ—প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) (পৃঃ ১১৪)।

(৩) শ্রদ্ধেয় ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (পঃ বঃ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী) কথিত।

(৪) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—(সম্পাদনা) প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (পৃঃ ৯৫, ৯৪, ৬৭, ৩৩, ৫১, ৭৪, ৫৫, ৫৪, ৬৭, ৮৫, ৯৩, ২০)।

(৫) আর সি পি আই নেতা বিপ্লবী অনাদি দাশ কথিত।

(৬) সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা পরিতোষ ব্যানার্জী কথিত।

(৭) স্মৃতিকথা—শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(৮) মুক্তিপথের সন্ধানে—অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য, শম্ভু বোস, সুধীন মৈত্র সম্পাদিত (পৃঃ ২৯৯)।

(৯) উদয়নারায়ণপুরের গজাগ্রামের তিমিরবরণ গাঙ্গুলী প্রদত্ত তথ্য।

কৃষক আন্দোলনে

এক রাজা গিয়ে আর এক রাজা এলে কৃষকদের যে কি দুর্ভোগ ভুগতে হয় আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শাসনকালের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন কবিকঙ্কন তাঁর কাব্যে। ইংরাজের শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ গ্রামীণ চিত্র এঁকেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুই বিঘা জমি'-তে, 'শাস্তি' গল্পে জমিদারের নির্মমতার চিত্র তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পে দরিদ্র গফুরের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনচিত্রের মধ্যদিয়েই কৃষকজীবনের করুণ-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—"গ্রাম ছোট, জমীদার আরও ছোট, কিন্তু অত্যাচারে প্রজারা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারতো না।" পল্লীবাংলার প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচার কাহিনী অক্ষয় কুমার দত্তের লেখায় এবং অন্যান্য সহৃদয় লেখকদের লেখায় জীবন্ত হয়ে রয়ে গেছে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নিগড় বরাবরই কৃষক সাধারণকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তবু হিন্দুযুগে, পাঠান বা মোগল যুগে জমি ছিল কৃষকের, কিন্তু ইংরাজসৃষ্ট 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র ফলে কৃষক হলেন জমিহারা, জমিদারী সত্ব কায়েম হয়ে বসলো। জমিদারের সঙ্গে মহাজনী ব্যবস্থাও কায়েম হলো।—কৃষক শোষণের যতগুলো পথ ও পন্থা আছে দিনে দিনে সবগুলো জেঁকে বসতে লাগলো, কোনসময়েই ইংরেজ প্রভুরা তার বিরোধিতা তো করলেনই না উপরন্তু কৃষকের উপরের সবরকম শোষণ-অত্যাচার-পীড়নকেই আইন ও প্রশাসনের মারফৎ সমর্থন জানাতে লাগলেন। কৃষকের আপাত শত্রু জমিদার মহাজন ছিল ইংরাজশাসকদের প্রত্যক্ষ মিত্র।—এই চালচিত্র আঠার-উনিশ শতকের নানারকম খণ্ড-বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিশ শতকে গ্রামীণ মানুষের কাছে অনেক-অনেক বেশি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে হাওড়া ক্ষুদ্রতম জেলা। এর জমিদাররাও ক্ষুদ্র। তবু কোন সময়েই এই জেলার জমিদাররা যত ক্ষুদ্রই হোন না কেন, কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের ফলে অসুবিধায় পড়লে ইংরাজ সরকারের দাক্ষিণ্য পেতে তাদের কোন সময়েই অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কোন সময়েই ইংরাজ সরকারের আইন-কানুন-প্রশাসন জমিদারী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজার স্বপক্ষে কোন সময়ে দাঁড়িয়েছে এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। কৃষকরা আইন-কানুন না বুঝলেও ধীরে ধীরে নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝে নিলেন জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের স্বার্থ একসূত্রেই বাঁধা, ইংরেজ শাসনের খুঁটিই হলো জমিদার বাবুরা। জমিদার বাবুদের সৃষ্ট কৃষক-শোষণ প্রথাগুলির বিরুদ্ধে আঘাত দিতে গেলেই ইংরাজ সরকারের রুদ্ররোষ কৃষকদের উপর নেমে আসে।

তাই ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে বারে বারে জাতীয় আন্দোলনে এ জেলার কৃষকরা সামিল হয়েছেন।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার কৃষকরা বেশ ভালভাবেই যোগ দিয়েছিল। হাওড়া জেলার কৃষক ও তাঁতীরা এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সামিল হয়েছিল।....১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে মাজু, আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, ডোমজুড় প্রভৃতি স্থানেও বেশ কিছু কৃষকসন্তান স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ...কংগ্রেস নেতারা তাঁদের চরকা কাটতে ও খদ্দর পরতে বলতেন, কিছু সংস্কারমূলক কাজেও তাদের লাগাতেন—যেমন মাজুতে প্রয়াত সতীসাধন গায়েন কৃষকদের সংগঠিত করে খাল কাটতে (কান্দুয়াখাল) লেগেছিলেন।তেমনি হাওড়ার গান্ধী সাধন মিত্র, শ্যামপুরের বনমালী জানা চরকা কাটতে শেখাতেন ও কিছু রিলিফ বিলি করতেন। শ্যামপুরে 'নিখিল বিশ্ব সেবা সঙঘ' নাম দিয়ে সভাপতি বিপিন মাজী ও সম্পাদক রোস্তম আমি কিছু রিলিফ সংগ্রহ করে বিলি করতেন। এইভাবে কোন কোন স্থানে কৃষকদের সেবা করা হতো তাদের সংগঠিত করা হতো না।"[১]

প্রধানতঃ এই যুগের কৃষক-হিতৈষণার সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিল ব্যাক্তিগতভাবে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে। যেমন, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে বসবাসকালে স্থানীয় জমিদার মোহিনী ঘোষালের কয়েক বিঘে দেবোত্তর জলা জমিতে নরু সর্দার প্রমুখ গরীব প্রজারা মাছ ধরতো। জল সেচে নিয়ে চাষ আবাদও করতো। জমিদার অন্য এক প্রজা কেষ্ট বাগকে পত্তনী দিয়ে সারা জমিটায় বেড়া এঁটে দিলে। চাষীরা বেড়া খুলতে যেতেই, উভয় পক্ষে মারামারি, রক্তারক্তি। জমিদার উলুবেড়িয়া কোর্টে মামলা করলো প্রজাদের নামে। বসলো জমিদারের পুলিশ পাহারা। শরৎচন্দ্র প্রজাদের পক্ষে বরাবরই ছিলেন। ছুটলেন জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ও বোঝালেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। পুলিশ সব শুনে জমিদারের বিরুদ্ধে গেল। মামলা উঠে গেল।[২]

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন বলেই এ কাজ করেছেন এমন নয়, স্বভাব-দরদী মানুষ হিসাবেই তিনি দরিদ্র মানুষের বিপদের সাথী। কেননা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে কৃষককে মুক্ত করার জন্য সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের কোন কার্যক্রম কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব কখনো গ্রহণ করেন নি। গান্ধীজীও যেখানেই কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার জন্য ইংরাজ সরকারকে বা জমিদারদের দায়ী করেছেন, পরক্ষণেই তিনি কৃষকদেরও দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, গ্রামের মানুষরা আলস্য ত্যাগ করতে পারলেই সুখে থাকতে পারবে—তারা আত্মনির্ভরশীল হোক। অর্থাৎ, শ্রেণী-সহযোগিতার পথই ছিল গান্ধীজীর আদর্শ পথ।[৩] তিনি ধনবৈষম্য ঠেকাতে চেয়েছিলেন প্রেমের গুণাবলীর চর্চা করে।*

সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় হাওড়ায় যে বামপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল তাঁরা 'কুৎখামার' প্রথা ও জমিদারের অত্যাচার পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করে স্থানেস্থানে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁদের নেতৃত্বে উলুবেড়িয়া মহকুমায় কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু কৃষক শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করা যে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের অভিপ্রেত ছিল না তা সুভাষচন্দ্রকে সাসপেণ্ড করার সময়ই তাঁরা উল্লেখ করেন। এই সব আন্দোলন থেকে তাঁকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং আন্দোলন যদি করতেই হয়, তাহলে অংশগ্রহণের পূর্বে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুমতি নিয়ে করতে হবে, এ বিষয় আগেই উল্লেখ করেছি। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রতি নেতৃত্বের এই অনীহা স্বাভাবিকভাবেই জেলার বামপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বকে হতোদ্যম করেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস থেকে সরে আসার বছর দুয়েকের মধ্যেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সুভাষচন্দ্রকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হওয়ায়, তাঁর এ জেলার অনুগামীদের নানাবিধ আন্দোলনে বিজড়িত হয়ে পড়ায়, বিশেষতঃ তাঁদের শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় তাঁদের অনুসৃত আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে, সে সংগঠনের প্রসার ঘটেনি, আন্দোলন স্থায়ী হয়নি।

১৯৩৬ সালে কৃষকদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক সভা' গঠিত হয় এবং প্রায় সমকালীন সময়েই হাওড়াতেও একটি কৃষক কমিটি গড়ে ওঠে যা পরে সংগঠিত আকারে রূপ পায়। প্রধানতই সন্নিহিত শ্রমিক অঞ্চলগুলির চটকল ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার সংগ্রামী শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন সংগ্রামে সহায়তা পাবার প্রয়োজনে, তাদের পাশে দাঁড়াবার দরকারে গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সংগঠন গড়া সহজ হয়ে ওঠে, কারণ শহর বা শহরতলীর শিল্প কারখানায় গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেরাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসেন। তাঁরাও গ্রামে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ার জন্য তাঁদের বাইরের লোকের মত নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার পড়ত না। ফলে, সহজেই তাঁরা সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন।

হাওড়া জেলার চাষীদের মোটামুটি অসুবিধাগুলি ছিল ঃ

এ জেলার উৎপাদিত পাট এ জেলার চটকলেই লেগে যেত। পাটের দাম মাঝেমাঝে অবিশ্বাস্য রকমের কমে গেলে, কৃষক না পারতো সংসার চালাতে, না

---

*'Maldistribution of wealth can never be effectively checked without the cultivation of the virtues that follow from the law of love...'—['The Philosophy of Mahatma Gandhi—Dhirendra Mohan Datta, University of Calcutta, Page-123]

পারতো খাজনা দিতে। হাট-বাজারগুলি যেহেতু জমিদাররাই স্থাপন করতেন, সেখানে নানারকম দেবদেবীর নাম থেকে ঝাড়ুদারের নামে পর্যন্ত 'তোলা' আদায় করা হতো। বহুরকম 'তোলা' দিতে চাষীদের খুবই আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হতো। খাল-বিল-নদীগুলি ক্রমশ মজে আসছিল, সংস্কার হচ্ছিল না। আবার অতিরিক্ত জল চাপে কোথাও কোথাও ফসল নষ্ট হচ্ছিল। জেলার ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার বিঘা ধান জমির মধ্যে একমাত্র কেদুয়ার মাঠেই প্রায় আড়াই লক্ষ বিঘা ধান জমি আছে। অতিরিক্ত জল চাপে প্রতিবছর ধান নষ্ট হচ্ছিল। এ ছাড়াও ছিল জমিদার-জোতদারদের আরোপিত নানাবিধ শোষণ-জুলুম মূলক প্রথা—কুৎ, বাবুদি, কয়ালী ইত্যাদি-যা কৃষকদের দৈন্য দুর্দশাকে শুধুমাত্র বাড়িয়েই দিত। এই সকল অব্যবস্থার নিরসনে কৃষকরা সমিতির মধ্যে সঙঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগলেন। জমিদার-জোতদার-মহাজনকে আঘাত দিলে শেষ পর্যন্ত তা শাসক ইংরাজকেই আঘাত দিত।[৪]

জয়কেশ মুখার্জী তাঁর 'হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা গড়ে ওঠার সাথে সাথে হাওড়া জেলা কৃষক সমিতি ও গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তার সাংগঠনিক রূপ দিতে দু'তিন বছর সময় লাগে। প্রথমে একটা সাংগঠনিক কমিটি তৈরী হয়। কমিটির সভাপতি হন ডোমজুড় থানার রাঘবপুর গ্রামের লাঙ্গলপাড়ার নফর লাঙ্গল এবং সম্পাদক হন পাশের গ্রাম জোতগিরির কেষ্ট গাঙ্গুলী। একসরা স্টেশনের কাছে একটা রেল দুর্ঘটনায় কেষ্ট গাঙ্গুলীর মৃত্যু হলে মন্মথ অধিকারী কিছুদিন সম্পাদকের কাজ চালান। তিনি অসুস্থ হলে সম্পাদকের দায়িত্ব পান কমরেড মদন দাস। উল্লেখ করা দরকার প্রথমে কমিউনিস্ট ছাড়াও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একটি জঙ্গী অংশও কৃষক সমিতিতে ছিল।"

জয়কেশবাবু তাঁর ওই গ্রন্থে ১৯৪০ সালের আগে ও কিছু পর পর্যন্ত যে সব শ্রমিক ও কৃষক বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সমিতি গড়ে তোলার কাজ করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সবার নাম মনে না থাকায় উল্লেখ করতে পারেন নি সে কথাও জানিয়েছেন। তার দেওয়া নামগুলি আমরা উল্লেখ করলাম ঃ-

"রাঘবপুর—নফর লাঙ্গল। জ্যোতগিরি—কেষ্ট গাঙ্গুলী, আশু পাড়ুই, সুরেন নস্কর। লক্ষ্মণপুর—পূর্ণ নস্কর। মাসিলা—ললিত নস্কর, সুরেন নস্কর, সবন বাগ, ফটিক গলুই, পঞ্চু আদক। আলমপুর—কুঞ্জ কোলে, বরদা মালিক, হারু আদক, পারুল কাঁড়ার কাঙালী মাজী, পবন কাঁড়ার, বিজয় মাজী, কেষ্ট হাজরা। বেলকুলাই—পরাণ নস্কর, মিহির মণ্ডল, শিবু দাস, শচীন দাস, হারান পাড়ুই। ইসলামপুর—হারু বেরা, কানাই বেরা, ডাঃ পূর্ণ ভুএঞা, পুলিন বেলেল। আমতা—কানাই ভক্ত, ধর্মদাস মান্না। থলে—

অনন্ত মাজী। ঝিখিরা—দীনবন্ধু মাজী। রামচন্দ্রপুর—কার্তিক সেনাপতি। বড় মোহরা-মদন হাজরা। ছোট মোহরা—ঠাণ্ডা বেরা, শিবরাম চক্রবর্তী। খোষালপুর—নিতাই ভাণ্ডারী। বড় বহরিয়া—বৃন্দাবন প্রামাণিক (উলুবেড়িয়া)। খড়ে ময়নাপুর—সুধীর দাস। মৌ বেশে—গাউস মহম্মদ (ছাত্র)। মৌড়ী—পঞ্চু দাস, শরৎ নস্কর, কাঙালী নস্কর। বিপ্রনওপাড়া—সুধন্য মণ্ডল, মাণিক নস্কর, হীরু প্রামাণিক, কালীপদ প্রামাণিক। কেশবপুর রং পাড়া—জীতেন মাখাল। খাঁটোরা—অনাদি সর্দার। রুদ্রপুর—মহিম মাখাল, সুরেন মাখাল, পাঁচকড়ি মাখাল, সাবিত্রী সিং। রণমহল—জীবন রায়, গৌর মান্না। শিয়ালডাঙ্গা—মুকুন্দ পাড়ুই, নরেন পাড়ুই, বেচু কাঁড়ার। রাজাপুব—রতন বদ্দি, সাধু হাজরা। মহিষগোট—গিরিশ পণ্ডিত, মাখম হাজরা, নির্ধন পণ্ডিত, জহর হাজরা। বাঁইগাছি—তুলসী কোলে, হরিমোহন দাস, কার্তিক দাস, মধু দাস। শিবপুর—অনিল সরকার (উকিল)। ইছাপুর-পার্বতীপুর—বসন্ত ঢেঁকি, কেষ্ট দাস। উত্তর ঝাপড়দহ—কালীপদ দে, কিশোরী সাধুখাঁ। দক্ষিণ ঝাপড়দহ—জীতেন ভট্টাচার্য, বঙ্কু মণ্ডল।"

হাওড়া জেলায় 'কুৎখামার' প্রথা নামে একটা নিদারুণ শোষণ মূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে 'কুৎ' প্রথা বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত ক'রে তাজপুরে এবং আমতা থানার অন্যান্য অংশে এবং ওই থানার বাইরেও কয়েকটি গ্রামে এই প্রথার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।[৫] ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ কালপর্বে স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলির নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন তাজপুরের রায়েদের, জুজারসাহার মান্নাদের, বেলকুলাইয়ের দাসেদের এবং ইসলামপুর, পানপুর, আমতা, বাঁইগাছি, সোনামুই, শিয়ালডাঙ্গা, রণমহল, ত্রিপুরাপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের চাষীদের দাবিগুলি স্থানীয় ছোট-বড় জমিদার-জোতদারদের মেনে নিতে বাধ্য করেছিল।[৬]

১৯৩৭ সালে আমতার পানচাষীরা পানের ন্যায্য দাম বাঁধার আন্দোলন ক'রে সফল হন। ওই সালে আর একটি আন্দোলন করে তাঁরা সফল হন—চাষীরা যাতে ফসল কেটে গোলাজাত করতে না পারে তার জন্য জমিদারের লোকেরা চাষীদের কাস্তে কেড়ে নিত। এই প্রথার বিরুদ্ধে জুজারসাহার মান্নাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, তারা নতিস্বীকার করে, চাষীদের জয় হয়।[৭]

১৯৪০-৪১ সালে কৃষকরা আন্দুল, মৌড়ী গ্রাম, আমতা, ধুলাগোড়ি প্রভৃতি গ্রামে পূর্বে উল্লিখিত বে-আইনী তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার ফলে 'ইজারাদার', 'ঝাড়ুদার' ও 'ঈশ্বরবৃত্তি' ছাড়া বাকি সব তোলা আদায় বন্ধ হয়ে যায় এবং বিক্রেতা কৃষকদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত তোলা আদায় চালু হয়।[৮]

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন হয় পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামে। প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ওই থানার কংগ্রেস কর্মী দুর্গা

চ্যাটার্জী ও হাতেম পুরকাইত। সেই সম্মেলনেই প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির শিবনাথ ব্যানার্জী ও সম্পাদক হন মদন দাস।

স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত যে সকল জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলন হয়েছে তার বিবরণঃ-

সম্মেলনের ক্রমিক সংখ্যা	সাল	স্থান	সভাপতি	সম্পাদক
১ম	১৯৩৯	জুজারসাহা	শিবনাথ ব্যানার্জী	মদন দাস
২য়	১৯৪০	আমতা	ঐ	ঐ
৩য়	১৯৪২	আলমপুর	বঙ্কিম মুখার্জী	ঐ
৪র্থ	১৯৪৩	ডোমজুড়	শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	ঐ
৫ম	১৯৪৪	বেতাই	ঐ	ঐ
৬ষ্ঠ	১৯৪৫	ধামিসা	ঐ	ঐ
৭ম	১৯৪৬	বাইন্যান	ঐ	ঐ
৮ম	১৯৪৭	রাজাপুর	ঐ	ঐ

১৯৪৭ সালের ২২-২৩ ফেব্রুয়ারী ডোমজুড় থানার রাজাপুর গ্রামে হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির ৮-ম সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন তে-ভাগার দাবিতে কৃষকরা জেলা ব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলছেন। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার সম্মেলনের প্রাক্কালে হাওড়া জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে। পার্শ্ববর্তী লাগোয়া গ্রাম হারানন্দবাটি-র অবস্থান হুগলী জেলায়। সরকারকে হুগলী জেলায় ১৪৪ ধারা জারির অবকাশ না দিয়ে হারানন্দবাটির কৃষকদের সহযোগিতায় ওই গ্রামের জমিতে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলখ্যাত অনন্ত সিং এবং ডোমজুড়ের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। পাটের দাম পড়ে যেতে থাকে। তার উপর যুক্ত হলো অতিবৃষ্টি জনিত ফসলহানি। আমতার পাটের দর বাঁধার দাবিতে একটি বে-আইনী সভানুষ্ঠানের জন্য গ্রেপ্তার হন সমর মুখার্জী, ডাঃ কেশব সরকার ও কালী মুখার্জী (ছোট)। তাঁদের একবছর করে কারাদণ্ড হয়।[১০] দ্বিতীয় সম্মেলনের কয়েকমাস পরে কান্দুয়াখাল সম্মেলন হয়।[১১] ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে আমতায় কৃষকেরা খাজনা প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন।[১২]

যুদ্ধের মধ্যেই জিনিসপত্রের মুল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। খাদ্যের দাবীতে আমতা ইসলামপুর শিয়ালডঙ্গা থেকে জেলা শাসকের কাছে গণ ডেপুটেশনের জন্য ১৫০ জন

কৃষকের মিছিল পরিচালনার অভিযোগে জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক মদন দাস ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন।[১৩]

কৃষক সমিতির উদ্যোগে মাসিলাতে একটি সমবায় সমিতি খুলে সরকার থেকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল এনে সরকারী দামে বিক্রি করা হয়। শুরু হয় অনাহার-জনিত মৃত্যুর মিছিল। পিপলস রিলিফ কমিটি, ফ্রেণ্ডস অ্যাম্বুল্যান্স ইউনিটের সহযোগিতায় কৃষক সমিতি প্রায় ৬০ টি জায়গায় রিলিফ কেন্দ্র খোলে।

কৃষক সমিতি খাল কাটার আন্দোলন করে মাসিলায় সরকারকে খাল কাটতে বাধ্য করেছে। [১৪] ১৯৪৫ সালের খরায় ডোমজুড়ে কৃষক সমিতির উদ্যোগে সরকারের কাছ থেকে পাম্প আনিয়ে খাল থেকে জল সেচ দিয়ে দক্ষিশবাড়ি সংলগ্ন শত শত বিঘা জমিতে চাষাবাদ করিয়েছে। এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারাপদ দে, হারান দাস, গিরীশ দাস, কার্তিক সাঁতরা, গিরীশ পণ্ডিত, মুকুন্দ সাঁতরা, সতীশ মালিক। এ ছাড়াও সতীশচন্দ্র ঘোষ, ধনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ও জীতেন ভট্টাচার্যের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [১৫]

শ্যামপুর থানায় 'বাবুদি' নামে সে প্রথা ছিল তাতে ভাগচাষী জমিদারকে অর্ধেক ভাগ দেবার পরও বিঘাপ্রতি একমন ধান সেলামী বাবদ্ দিতে বাধ্য হতো। জামিরা গ্রামের ভাগচাষী প্রাণকৃষ্ণ মান্না বাবুদি দিতে অস্বীকার করায় জোতদারের গুলিতে প্রাণহারান। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী। হাওড়া জেলা কৃষক আন্দোলনের তিনি প্রথম শহীদ। এই আন্দোলনে স্থানীয় নেতা ছিলেন শ্যামপুর অঞ্চলের গোবিন্দ ভক্ত, নিতাই ভক্ত প্রভৃতি। মদন দাস, সমর মুখার্জী, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। [১৬]

'বাবুদি' প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়াও 'তহুরী' (এক প্রকার ঘুষ), 'পার্বনী' (পর্ব উপলক্ষে দেয় কর), 'সাঁজা' প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন হাওড়া জেলা কৃষক সমিতি আন্দোলন করে এই প্রথাগুলির অবসান ঘটিয়েছে। [১৭] 'গুলো' প্রথার বিরুদ্ধেও কৃষকরা আন্দোলন করেন। ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা শুধু নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ইংরাজরাজকে পরোক্ষে বিব্রত করে তুলেছেন—এটাই সব নয়। তাঁদের আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা তো আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

ইংরাজ মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামে কৃষকরা সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আন্দামান বন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে, আজাদ হিন্দ-ফৌজের মুক্তির দাবিতে, রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে, বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে যে-সব

আন্দোলন বিক্ষোভ হয়েছে তাতে হাওড়া জেলার কৃষকরা সংগঠিতভাবে জমায়েত হয়েছেন।

সারাভারত কৃষকসভার পতাকাতলে এজেলায় কৃষক আন্দোলনকে সম্পসারিত করার জন্য যাঁদের অবদান সর্বাধিক তাঁরা হলেন—বঙ্কিম মুখার্জী, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মদন দাস, জয়কেশ মুখার্জী, তারাপদ দে, সন্তোষ ব্যানার্জী, সমর মুখার্জী, অনন্ত মাজী, ডাঃ কেশব সরকার, গিরিশ পণ্ডিত, বদন পণ্ডিত প্রমুখ।

তথ্য সূত্র ঃ

১) স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার কৃষক—জয়কেশ মুখার্জী, (লোকমুখ-১ম বর্ষ, ২য় সংকলন)।
২) আমাদের শরৎচন্দ্র-রবিদাস সাহারায় (পৃঃ ১২২-১২৪)।
৩) লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ-সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (পৃঃ ১৭-২২)।
৪) কান্দুয়া খাল আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-কার্তিক সেনাপতি; হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর-জয়কেশ মুখার্জী।
৫) হাওড়া জেলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সংগঠন ঃ ১৯৩৬-১৯৪৭, (২য় পর্ব)-অমিতাভ চন্দ্র, মূল্যায়ন, শারদীয় ১৪০১(পৃঃ ১৩৩)।
৬) ঐ (১ম পর্ব), মূল্যায়ন, নববর্ষ-১৪০১,(পৃঃ৭৯)।
৭) ঐ ঐ(পৃঃ ৮১)।
৮) ঐ (২য়-পর্ব) (পৃঃ ১৩৪-১৩৬)।
৯) হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর-জয়কেশ মুখার্জী(পৃঃ১১)।
১০) ঐ (পৃঃ ১৪)
১১) ঐ (পৃঃ ১৬)
১২) হাওড়া জেলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সংগঠন (১৯৩৬-১৯৪৭), (২য় পর্ব)—অমিতাভ চন্দ্র, মূল্যায়ন শারদীয় ১৪০১ (পৃঃ ১৩২)।
১৩) হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর-জয়কেশ মুখার্জী (পৃঃ১৭)
১৪) ঐ (পৃঃ ১৮)
১৫) ঐ (পৃঃ ২১)
১৬) হাওড়া জেলায় সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সংগঠন (১৯৩৬-১৯৪৭,) ২য় পর্ব-অমিতাভ চন্দ্র, মূল্যায়ন, শারদীয় ১৪০১, (পৃঃ ১৪৯)।
১৭) ঐ (পৃ ১৪৯)।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাবে একমত হতে না পারায় ১৭ই মে আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা প্রমুখ বামপন্থী নেতারা কংগ্রেসের ভিতরেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি এস পি) গঠন করেন। হাওড়ায় সি এস পি-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শিবনাথ ব্যানার্জী। তাঁর সহযোগী হন মনসাদাস দে, রামচন্দ্র শর্মা প্রমুখ সংগঠকবৃন্দ।[১]

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (RSP)

১৯৪০-এর মার্চমাসে রামগড়ের আপোস বিরোধী সম্মেলনেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের জন্ম হয়। হাওড়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ভোলানাথ দাস ও রামপ্রসাদ মুখার্জী।[২]

তথ্যসূত্র :

১) পশ্চিমবঙ্গ নেতাজী সংখ্যা, ১৪০৩ পৃঃ ২৭০; বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—অমিয় ঘোষ ; ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা—কৃষ্ণধর (পৃঃ ৮৪)।

২) পূর্বোক্ত অমিয় ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ।

আন্দোলনে মহিলারা

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে এ জেলার মহিলারা অংশগ্রহণ করেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে পুলিশী নির্যাতন সয়েছেন, কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, দেশকে ভালবাসার দায়ে সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন, অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ঝুঁকি নিয়েছেন, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের লুকিয়ে রাখার সাহস দেখিয়েছেন, আইন-অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন, জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশ নিয়েছেন।

জাতীয় আন্দোলনের ১৯২৭-৩০ পর্যায়ে দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধু-ভগিনী উর্মিলা দেবী প্রায়শই হাওড়ায় এসেছেন এবং মহিলাদের নিয়ে সভা করেছেন। ডঃ কানাই ভট্টাচার্য (ফরওয়ার্ডব্লক নেতা ও পঃ বঃ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমানে প্রয়াত) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তাঁদের পরিবার রক্ষণশীল এবং তাঁর পিতামহ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কট্টর ব্রিটিশ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ডঃ ভট্টাচার্যের মা হৈমবতী দেবী ও কাকীমা ইলা দেবী গোপনে ওইসব সভায় যেতেন। ডঃ ভট্টাচার্যের কথা 'দশ এগারো বছর বয়সে তাঁদের সঙ্গে আমিও যেতাম। সেই সময় থেকেই মনে anti-British feeling innoculated হয়।'

মহিলারা শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের কৃষক আন্দোলনের মিটিং মিছিলে বরাবরই যোগ দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ও সেবাকার্যে মহিলাদের ও ছাত্রীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। এ গ্রন্থের বিভিন্ন পর্বের আলোচনায় মহিলাদের অবদানের বিষয় কিছু কিছু উল্লেখিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে এ জেলায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-র শাখা গড়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় (১৯৪৩) প্রীতি লাহিড়ীর নেতৃত্বে তাঁরা কাজ করেছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্বকালে কমিউনিস্ট আন্দোলনেও এ জেলার মহিলারা যোগ দেন।

"১৯৪০-৪২ সালে গ্রামের অনেক মহিলা পার্টির গোপন কাজে সাহায্য করেছেন। প্রথম সভ্যপদ পান মাসিলার আশালতা সামন্ত ও জঙ্গলপুরের অঞ্জনা দলুই। উত্তর ঝাপড়দহের শৈলজা দে (সকলের মা—তারাপদ ও কালীপদ দে'র মা)। শৈলজা দে বোম্বাই-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেসে (১৯৪৩) দর্শক হিসাবেও গিয়েছিলেন।....শিবপুরের মায়া দত্ত (চট্টোপাধ্যায়), বেলকুলাই-এর মীরা দাস প্রমুখ কাজে যোগ দেন এই যুগেই। নিরুপমা চ্যাটার্জী তখন খুবই ছোট, পরে তিনি পার্টিতে যোগ দেন।"

তথ্যসূত্র ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১)-সরোজ মুখোপাধ্যায় (পৃঃ ২৭৭) ও ঐ (২) পৃঃ- ১৬৩।

নৌ-বিদ্রোহে

বাঁকড়ার জুম্মা মসজিদে গেলে দেখা মিলবে সেখ আফাজুদ্দিনের, পিতা-(প্রয়াত) সেখ মতলিব। মসজিদ দেখাশুনার ভার তাঁর উপর।এইটাই এখন তাঁর পেশা। আই আর বেলিলিয়স ইনস্টিটিশনে পড়তে পড়তেই কলকাতায় যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলেন। তারপর হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে লখনৌ-এর রেস্ট ক্যাম্পে, সেখান থেকে মুম্বই-এর ক্যাসেল ব্যারাকে, ভারসোভায় ট্রেনিং নিলেন কোয়ার্টার মাস্টার-এর, গান ট্রেনিং হলো করাচীতে। 'এইচ এম আই এস লাহোর' সরকারী জাহাজে হ্যাণ্ডেল শিফটিং-এর কাজ নিয়ে বিশাখাপত্তম, তারপর রেঙ্গুন, কলম্বো, কোচিন, ট্রিঙ্কোমালি, আকিয়াব, করাচী প্রভৃতি নানা দেশের নানা বন্দরে ঘুরলেন। যুদ্ধের সময় রেঙ্গুনে ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলো। ঐ জাহাজেই বোম্বাই এলেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় শুরু হলো পচা মাছ, অখাদ্য খাদ্য পরিবেশন। প্রথম প্রথম নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ। কিন্তু প্রতিকার হলো না। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুরু হলো ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো মুম্বই থেকে করাচী পর্যন্ত নৌ-সেনা মহলে। সমর্থন জানালেন আগস্ট বিপ্লবের নেত্রী অরুণা আসফ আলি, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই। যুব ছাত্র শ্রমিকরাও সমর্থন করলেন। 'এইচ এম আই এস লাহোর' জাহাজে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে পতাকা তুলেছিলেন নিজে সেখ আফাজুদ্দিন।

বিদ্রোহ শুরু হতেই জাহাজ ঘিরে ধরলো মিলিটারি। তাদের বোঝাতে তারাও বিদ্রোহ করলো। বায়ুসেনা মহলেও বিদ্রোহ ছড়ালো।

জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিকারের আশ্বাস দিলেন, আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন। বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হলেন। সেখ আফাজুদ্দিনও বন্দী হলেন। ভারসৌভায় বিচার হলো। তারপর থেকে শুধুই চলছে প্রতিশ্রুতি। তাঁর নিজের পেনশন পাবার প্রত্যাশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, আশায় আছেন তাঁর অনার্স গ্রাজুয়েট ছেলের চাকরীর। কে জানে, কবে তাঁর সে আশা পূরণ হবে!

সেখ আফাজুদ্দিনের কাছেই সংবাদ পাওয়া গেল সাতাশী গ্রামের বিমল কুমার (পিতা-সতীশ কুমার)-ও ছিলেন অন্যতম নৌ-বিদ্রোহী। জাহাজে তিনি নার্সিং-এর কাজ করতেন। তিনি একটি চাকরী পেয়েছেন।

জেলে যারা পাগল হলেন

আজাদ পাকিস্তান ঘোষিত হবার পর পূর্ব-পাকিস্তানের রাজসাহী জেলে বন্দিনী কৃষকনেত্রী ইলা মিত্রের উপর পুলিশের পাশব অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত ক'রে কবি

গোলাম কুদ্দুস 'ইলা মিত্র' শিরোনামাঙ্কিত কবিতায় লিখেছিলেন,

'এ বেদনা কবিচিত্তে যদি মাঝেমাঝে
তোলে ব্যাকুলতা,
তবে জেনো প্রকাশের মতো
ভাষা নেই বিদ্যুৎ সঞ্চারী।'

সত্যিই তো ভাষা থাকেনা। হাওড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লিখতে গিয়ে সেই দু'জন বীর-স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা বারবার মনে এসেছে যাঁরা পুলিশ লক-আপে, জেলখানায় অমানুষিক অত্যাচারের ফলে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন হলেন শিবপুরের ননী গুপ্ত, আর একজন হলেন কানুপাটের নিতাই মণ্ডল। একজন এই শতকের দশের দশকের বিপ্লবী আর একজন তিরিশের দশকের আইন অমান্যকারী স্বাধীনতা-সংগ্রামী।

শিবপুরের ননী গুপ্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় উষালগ্নে ১৯১০ সালে সামরিক যোগাযোগ সমেত সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াস চালিয়ে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়' (যার অপর নাম ছিল 'দি হাওড়া গ্যাং কেস') গ্রেপ্তার হন। ঐ মোকদ্দমায় তাঁকে কেন্দ্র করেই ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র নির্ধারণ করে পুলিশ হাওড়ার শিবপুরকেই। সেই মামলায় খালাস পেলেও সরকার তাঁকে রেহাই দেন না, কারারুদ্ধ করে রাখেন। তাঁর উপর কতকখানি অত্যাচার করা হয়েছিল আজ তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর 'বিপ্লবের পদাচিহ্ন' গ্রন্থের (৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায়) ননীগুপ্ত সম্বন্ধে যা লিখেছেন। আমরা তার কিছুটা তুলে দিচ্ছিঃ

'ননী গুপ্ত ঃ ঢাকা জেলে একবার, আলিপুরে একবার সিগারেট খাবার ম্যাচ দিয়ে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কোন গতিকে বাঁচানো হয়েছে। প্রায়শঃ চার পাঁচ দিন ধরে কিছু খান না। তারপর একদিন হয়তো ৪/৫ মগ চা একখানা দুখানা বড় পাঁউরুটি খেয়ে ফেললেন। এইভাবেই বছরখানেক ঘরে কাটাচ্ছেন। বন্ধুবান্ধবরা সাধাসাধি করেন। আমি আলিপুর জেলে যাবার কিছুদিন পরে ননীবাবু ভারত সরকারকে ৬/৭ পাতা জুড়ে এক দরখাস্ত লিখলেন। তাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় আছে; কিন্তু তার অর্থ সব বুঝলাম না। এক জায়গায় লিখেছেন মুসলমান ধর্মের উদ্ভব অথর্ব বেদ থেকে- অথর্ব বেদের আললাহ স্তোত্র থেকে আল্লা শব্দের উৎপত্তি। এইসব বাদ দিয়ে দরখাস্তের মর্মকথা এই, তাঁর বন্ধু বান্ধব তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন যেন ইংরাজ সরকার যুদ্ধে হেরে যায়। তিনি যদি নিয়মিত খেতে আরম্ভ করেন, তা হলেই ইংরাজ হেরে যাবে। তিনি তা চাননা, তাই ইংরাজ যদি জিততে চায়, তাহলে ভারত গভর্নমেন্ট যেন

দেখে যে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন।

ইতিপূর্বেই মুলভেনি (জেল সুপার) সাহেব গভর্মমেন্টকে জানিয়েছেন, ননীবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—খালাস দিয়ে দিলে ভালও হয়ে যেতে পারেন। তাঁকে যেন খালাস দেওয়া হয়।

সরকার ননীবাবুকে ছাড়তে চায় না, তাই বুকানন সাহেব ছিল ইনসপেকটর জেনারেল অফ প্রিজনস-তাকে পাঠালো ননীবাবুকে দেখতে। মুলভেনি সাহেব সঙ্গে এলেন। ননীবাবু সাধারণ যা আলাপ করতেন তাতে তাঁকে পাগল বলে মনে হত না। বুকাননও দেখেশুনে বললো—এতো বেশ ভাল আছে।

ভালো আছে তো তুমি এসে চার্জ নাও, আমি পারব না—মুলভেনি সাহেব বলে বসলেন আমাদের (রাজবন্দীদের) সামনেই।

কয়দিন পর ননীবাবুর খালাসের হুকুম এলো।"—জেল থেকে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ননীবাবু বেরিয়ে এলেন।

পুলিশের অত্যাচার কেমন ছিল? তারও বিবরণ আছে ঐ গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় :

"কিল, ঘুষি, চড়, লাথি, কেশাকর্ষণ, আঙ্গুল মোচড়ানো, পেছন দিকে হাতকড়ি লাগিয়ে পিঠের উপর রুলের ঘা—এসব তো ছিল অতি সাধারণ ব্যবস্থা। নানারকম অসম্ভব কসরৎ করানো, পাঁচ-সাত দিনের ক্ষুৎ পিপাসা-অনিদ্রা কাতর, অথবা তিন চার ডিগ্রি জ্বরে আক্রান্ত বন্দীকে নিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঠেলে পনের মিনিট আধ ঘন্টা ধরে টেনিস খেলা, পুরুষাঙ্গ রশি বেঁধে টানা বা রুল দিয়ে খ্যাৎলানো, মলদ্বারে রুল ঢোকবার চেষ্টা কমোড প্যান থেকে মলমূত্র খাবার, মুখে সর্বাঙ্গে ঢেলে দেওয়া এবং তারপর, দিনের পর দিন জলের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে রাখা—ইত্যাদি যত রকমের ধর্ষকাম (sadist) জুলুমবাজির কল্পনা করা চলে বা কল্পনা করাও চলে না, তেমনি সব অভিনয় হ'ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারারাত ধরে, অথবা বন্দী জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত।"

৭৩ পৃষ্ঠায় রাজসাহী জেলে, প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দীদের উপর অপমান নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে কয়েকজনের পাগল হয়ে যাবার কথা লিখেছেন। আরও লিখেছেন,

'শুনেছিলাম দাদাদা হাউজের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করাবার জন্য।...কতজনকে কীড্ স্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে, দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত রুল দিয়ে পিটিয়েছে....।'

এইসব অত্যাচারেরই ফল ননীগুপ্ত এবং নিতাই মণ্ডলের পাগল হওয়া।

অমিয় ঘোষ 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়' প্রবন্ধে লিখছেন,—

'পুলিশের অত্যাচারে কি না জানিনা নিতাই মণ্ডল জেল থেকে পাগল অবস্থায় ছাড়া পেয়েছেন। এই ক্যাম্পেই (বৈষ্ণব পাড়ার গোপন ক্যাম্পে-লেখক) তাঁকে রাখা হয়েছে, তাঁকে দেখাশুনা করছেন মনোমোহন রায়। পাগল অবস্থায় তাঁর চেঁচামেচিতে আশেপাশের লোকের নজর পড়েছে এ বাড়ীর দিকে। একদিন সকালে ঘিরে ফেলে প্রায় ৬০ জনকে ধরে নিয়ে গেল।....পাগল অবস্থায় নিতাই মণ্ডলকেও নিয়ে গেল। প্রথমে শিবপুর থানা, পরে কোর্ট থেকে আলিপুর Central Jail-এ। সাজা হয়েছিল দুটো charge দিয়ে ১ বছর ৯ মাস করে।'

পাগল অবস্থাতেও পুলিশের গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিতাই মণ্ডল রেহাই পেলেন না। বিচারে আবার সাজাও হয়ে গেল।—এ থেকেই বোঝা যায়, পাগল হলেও এঁদের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার কতখানি ত্রস্ত ছিল।

স্বদেশকে ভালবেসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার অপরাধে চরম পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়ে যাদের বাকি জীবনটাই তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে শুধু উষ্ণ হয়েই রয়ে গেল, তাঁদের অবদানকে আমরা এই স্বাধীন দেশে কি মনে রেখেছি? আজকের তরুণদের চোখের সামনে তাঁদের ছবি তুলে ধরার মধ্য দিয়েই যে আগামী দিনের দেশের সুস্থিতি নির্ভর করে সে কথাটা মনে রাখার বোধ হয় আজকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

এ গ্রন্থ কি তার কিছুমাত্র পূরণ করবে? যদি সে প্রত্যাশা কণামাত্রও পূরণ হয় তবে লেখক নিজেকে ধন্য মনে করবে।